হরর কাহিনি

ওয়্যারউলফ

অনীশ দাস অপু



হরর কাহিনি

ওয়্যারউলফ

অনীশ দাস অপু

ক্যালিফোর্নিয়ার ড্রাগো গ্রাম থেকে পালিয়ে আসার পর তিন বছর কেটে গেছে। সুহিতা সুলতানা ও সাগর চৌধুরী ভেবেছিল আগুনে পুড়ে ড্রাগো'র সব ক'টা নরকের পিশাচ মারা গেছে। কিন্তু ওরা জানে না বেঁচে আছে দু'জন—বুকে প্রতিহিংসার জ্বালা আর প্রতিশোধের আগুন নিয়ে। সুহিতা তিন বছর আগের ভয়ঙ্কর স্মৃতি যখন ভুলতে বসেছে এমন সময় দুঃস্বপ্নের মত সেই পৈশাচিক ইঙ্গিতগুলো আবার শুরু হলো। মেক্সিকোর পাহাড়ে শেষ লড়াইয়ে সুহিতা ও সাগর আবার মুখোমুখি হলো ভয়ঙ্কর দুই ওয়্যারউলফের!



সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

পটভূমি

লস এঞ্জেলেস (ইউপিআই): লস এঞ্জেলেসের উত্তরে, টেহাপাচি পর্বতমালার একটি ক্ষুদ্র গ্রাম ড্রাগো ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে। লস এঞ্জেলেস ও ভেঞ্চুরা হইতে আসা দমকল কর্মীরা আজ প্রত্যুষে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনিতে পারিলে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলো অগ্নিকাণ্ডের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছে। ড্রাগো গ্রামের কোনও বাসিন্দার সহিত কোনরকম যোগাযোগ করা সম্ভব হয় নাই। কর্তৃপক্ষ এই আকস্মিক ঘটনা সম্পর্কে কোনও মন্তব্য করিতে অস্বীকৃতি জানাইয়াছেন। কর্মীরা ধ্বংসস্তূপ হইতে এখনও হতভাগ্যদের লাশ সরাইয়া লইয়া যাইতেছে।

জানা গিয়াছে, ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের কবল হইতে শুধু রক্ষা পাইয়াছেন মিসেস সুহিতা সুলতানা ও সাগর চৌধুরী নামে দুই বাংলাদেশী। দু'জনেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক ও লস এঞ্জেলেসের স্থায়ী বাসিন্দা।

আমেরিকান ফরেস্ট রেঞ্জার গ্যারী ফিলহ্যামের মতে এই অগ্নিকাণ্ডে কতজনের মৃত্যু হইয়াছে তাহার সঠিক হিসাব হয়তো কোনদিনই জানা যাইবে না। ড্রাগো পৌরসভার অন্তর্ভুক্ত শহর নয় বলিয়া ইহার প্রকৃত জনসংখ্যাও রেকর্ডভুক্ত করিয়া রাখা হয় নাই। তবে অনুমান করা হয়, ১০০ হইতে ২০০ মানুষের বাস ছিল গ্রামটিতে। আগুন এমনই ভয়াবহভাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল যে ড্রাগো গ্রাম ও তাহার পার্শ্ববর্তী ২০০ একর জঙ্গল পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে। কাজেই ধ্বংসস্তূপ হইতে মানুষ কিংবা প্রাণীর লাশ খুঁজিয়া পাইবার আশা দুরাশা মাত্র।

এক

সুহিতা সুলতানা ভেজা ঘাসের ওপরে হাঁটু মুড়ে বসেছে, গোলাপ ঝাড়ের গোড়ায় লেপছে মাটি। ঝাড়টাতে কোনও ফুল নেই, যদিও থাকা উচিত ছিল। সুহিতা এ জন্য নিজেকে দায়ী মনে করে। ব্রায়ান অবশ্য এ নিয়ে কখনও কিছু বলেনি, তবে সুহিতার ধারণা ওর প্রথম স্ত্রী ভাল গার্ডেনার ছিল। বিপত্নীক পুরুষ বিয়ে করার এই একটা সমস্যা–প্রথম স্ত্রীর সব কিছুই ভাল।

সুহিতা ঘরের বারান্দার টবে কিছু গাছপালা জন্মিয়েছে। ওগুলোর সে যত্ন নেয়, তবে বাগান করার প্রতি তার আগ্রহ কম। বাগানের গাছপালা, সুহিতার মতে, নিজেদের যত্ন নিজেরাই নিতে পারে। তবে ব্রায়ান এবং ড. গারফিল্ড দু'জনেরই ধারণা বাগানে কাজ করাটা সুহিতার জন্য মঙ্গলজনক। সে ওদেরকে হতাশ করতে চায়নি।

অন্যমনস্কভাবে স্যাঁতসেঁতে মাটি খোঁচাচ্ছে সুহিতা, মনটা চলে গেল অন্য কোথাও। হাউজকীপার মিসেস ডেভিডসনকে কয়েক দিনের ছুটি দিতে হবে, হ্যারির স্কুলের প্যারেণ্টস ডে'রও বেশি দেরি নেই। মুচকি হাসল সুহিতা। আজকাল নানা ভাবনায় নিজেকে ব্যস্ত রাখতে পারে সে। এটা ভাল লক্ষণ, ভাবল ও। নরম পায়ের শব্দটা শুনতে পায়নি সুহিতা। তবে ঘাড়ের পেছনে কার যেন গরম নিঃশ্বাস পড়তেই বুঝতে পারল এখানে ও একা নয়। সিধে হতে শুরু করল সুহিতা, হারিয়ে ফেলল ভারসাম্য, দড়াম করে পড়ে গেল মাটিতে। তাকাল সুহিতা। একটা মুখ

নেমে আসছে ওর মুখের উপর। ওটার কালো ঠোঁট জোড়া বিকট ভঙ্গিতে ফাঁক হয়ে আছে, বেরিয়ে পড়েছে হলুদ দাঁত। শরীর মুচড়ে সরে যেতে চাইল সুহিতা, কিন্তু একজোড়া ভারী থাবা ওকে যেন মাটির সাথে গেঁথে রেখেছে, জানোয়ারটা পুরো ওজন চাপিয়ে দিয়েছে ওর গায়ে।

মুহূর্তে ড্রাগোর সমস্ত ভয়ঙ্কর স্মৃতি বন্যার বেগে ঝাঁপিয়ে পড়ল সুহিতার মনের বন্ধ অংশে। লম্বা, নিষ্ঠুর দাঁত নিয়ে নেকড়েসদৃশ মুখটা আরও নেমে আসছে। গলা ফাটিয়ে চিৎকার দিল সুহিতা। এক মুহূর্তের জন্যে বুকের ওপরের বোঝাটা আলগা হলো, গড়ান দিল সুহিতা, শরীর গুটিয়ে বলের আকার পেল। প্রাণীটার নখের খোঁচা খেল সে, ওটা তাকে চিৎ করার চেষ্টা করছে। আবার গগনবিদারী চিৎকার বেরিয়ে এল সুহিতার গলা চিরে।

বাড়িটার খিড়কির দরজা খুলে গেল সশব্দে, সোনালি-সাদা চুলের শক্তপোক্ত গড়নের এক প্রৌঢ়া বেরিয়ে এল এক ছুটে। সুহিতাকে লক্ষ্য করে দৌড়াল সে, মেয়েটা গোলাপ ঝাড়ের পাশে এখনও শুয়ে আছে।

'ফ্রিসবল, থাম!' চেঁচাল মহিলা। 'এদিকে আয়, হতচ্ছাড়া!'

সাবধানে চোখ মেলল সুহিতা। কয়েক হাত দূরে নিতম্বে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে মিসেস ডেভিডসন। 'আমাকে মেরো না' এমন চেহারা নিয়ে তার দিকে চোরের মত এগোল তরুণ জার্মান শেফার্ড।

'লজ্জা করে না তোর,' বকা দিল মিসেস ডেভিডসন। 'এভাবে লোকজনকে ডর দেখাস।' কুকুরটার কলার চেপে ধরে নাকে হালকা চড় বসাল সে। 'আমি দুঃখিত, ম্যাডাম। কুকুরটার বয়স কম তো। তাই বড্ড চঞ্চল। ও আপনার সঙ্গে স্রেফ খেলা করতে চেয়েছিল।'

খিড়কির দরজা খুলে গেল আবার। ব্রায়ান অ্যাডামস বেরিয়ে

এল। তার বয়স পঞ্চাশ ছুঁইছুঁই, চেহারায় কাঠিন্যের ছাপ। পরনে সুয়েটার ও স্ল্যাকস। সে এক ছুটে চলে এল স্ত্রীর কাছে। সুহিতা ইতিমধ্যে উঠে বসেছে।

তাকে হাত ধরে সিধে হতে সাহায্য করল ব্রায়ান।

'লাগেনি তো?' জিজ্ঞেস করল ব্রায়ান।

'না, লাগেনি।' জবাব দিল সুহিতা, হাঁপাচ্ছে।

ব্রায়ান তাকাল মিসেস ডেভিডসনের দিকে। কুকুরটার কলার ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে এখনও। কুকুরটা লাফিয়ে উঠছে বারবার, মহিলার মুখ চেটে দিতে চাইছে জিভ দিয়ে।

'কুকুরটা কার?' রাগ রাগ গলা ব্রায়ানের।

'আমার বোনের, সার,' জবাব দিল মিসেস ডেভিডসন। 'ও কারও ক্ষতি করে না।'

'তুমি জানো এখানে কোনও জানোয়ারের ঢোকা নিষেধ,' বলল ব্রায়ান।

'আমার বোন ডাক্তারের কাছে গেছে এটাকে ঘণ্টাখানেকের জন্য আমার কাছে দিয়ে।'

'ওটাকে সরাও,' হুকুম দিল ব্রায়ান। 'এ বাড়িতে আর যেন কোনদিন কুকুর না দেখি।'

'ব্রায়ান, এত সিরিয়াস হবার কিছু নেই,' বলল সুহিতা। 'কুকুরটাকে হঠাৎ দেখে একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।'

'ও কারও ক্ষতি করে না,' আবার বলল মিসেস ডেভিডসন।

'ঠিক আছে।' ব্রায়ান নরম করল গলার স্বর। 'কিন্তু ওটাকে আমি আর এখানে দেখতে চাই না।'

'আচ্ছা, সার,' বলল হাউজকীপার। ফিরল কুকুরটার দিকে, 'চল, হতচ্ছাড়া।'

মিসেস ডেভিডসন কুকুরটাকে নিয়ে বাড়ির কোণে অদৃশ্য হয়ে গেল, এমন সময় বছর ছয়ের একটি ছেলে দরজা খুলে লাফাতে লাফাতে লনের দিকে এগোল সুহিতা আর ব্রায়ানকে লক্ষ্য করে।

'কী হয়েছে?' সুহিতার দিকে তাকাল সে।

সুহিতা বাচ্চাটার চুল নেড়ে দিল। 'কিছু হয়নি, হ্যারি। একটা কুকুর দেখে আঁতকে উঠেছিলাম।'

'কুকুর?' আগ্রহ নিয়ে চারপাশে চোখ বুলাল হ্যারি। 'কোথায়?'

'মিসেস ডেভিডসন ওকে নিয়ে গেছে।' জবাব দিল ব্রায়ান। 'তুমি ঘরে যাও। মুখ হাত ধুয়ে নাও। ডিনার খাবে।'

'আমি একটু কুকুরটাকে দেখে আসি?' অনুনয় হ্যারির কণ্ঠে। 'এক মিনিটের জন্য।'

'ঘরে যাও, হ্যারি,' বলল ব্রায়ান। অনিচ্ছাসত্ত্বেও লনের ঘাস মাড়িয়ে বাড়ির পথ ধরল হ্যারি।

'ওর কোনও পোষা প্রাণী নেই।' বলল সুহিতা। 'মাঝে মাঝে এ কারণে খুব খারাপ লাগে।'

'পোষা প্রাণী ছাড়াই ও চলতে পারবে। ঘরে চলো। তুমি এখনও কাঁপছ।'

'না, ব্রায়ান। আমি ঠিক আছি,' বলল বটে সুহিতা, তবে হাঁটার সময় স্বামীর কোমর জড়িয়ে থাকল।

'বড় চেয়ারটাতে পা মেলে আরাম করে বসো,' লিভিং-রুমে ঢুকে বলল ব্রায়ান। 'আমি তোমার নার্ভ ঠাণ্ডা করার ব্যবস্থা করছি।'

স্বামীর নির্দেশ পালন করল সুহিতা। ব্রায়ান ঢুকল রান্নাঘরে। এক মিনিট পরে লম্বা গ্লাস হাতে ফিরে এল।

'নাও, দুধটা এক চুমুকে খেয়ে ফেলো।' বলল সে।

মৃদু হেসে স্বামীর হাত থেকে দুধের গ্লাসটা নিল সুহিতা, ব্রায়ান বুকে হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে রইল গম্ভীর মুখে। স্ত্রীকে দুধ পান করতে দেখছে।

'তুমি আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছ।' এক মিনিট পরে নীরবতা ভাঙল ব্রায়ান।

'আমি দুঃখিত।'

'তুমি সুস্থ হয়ে উঠছ আর সেই সময় এরকম একটা ঘটনা ঘটল!'

সুহিতা দুধের গ্লাসটা চেয়ারের পাশের টেবিলের কোণায় নামিয়ে রাখল। 'আমি সুস্থ হয়ে উঠছি কথাটা শুনলেই মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। তোমদের কথা শুনলে মনে হয় আমি যেন মানসিক রোগী।'

'আমি তা মিন করিনি। আমি বলতে চাইছি ড. গারফিল্ড এক বছর চিকিৎসা করেও তো তেমন কোনও লাভ হলো না। অন্য কাউকে দেখাবে?'

'ড. গারফিল্ড ডাক্তার খারাপ নন,' বলল সুহিতা। 'সত্যি ব্রায়ান, তুমি ব্যাপারটা নিয়ে বড্ড মাথা ঘামাচ্ছ। কুকুরটাকে আমি দেখতে পাইনি। তা ছাড়া আমি বোধ হয় একটু বেশিই রিয়্যাক্ট করে ফেলেছি। ব্যস। অন্য কিছু নয়।'

'কুকুরটা,' তীক্ষ্ম চোখে স্ত্রীকে দেখছে ব্রায়ান, 'তোমাকে ড্রাগোর কথা মনে করিয়ে দেয়নি?'

হ্যাঁ, ড্রাগোর কথা। পাহাড়ের সেই ভয়ঙ্কর ঘটনা। কতগুলো ওয়্যারউলফের সঙ্গে লড়াই, চোখের সামনে স্বামীকে বদলে যেতে দেখা...

শিউরে উঠল সুহিতা।

চট করে স্ত্রীর পাশে চলে এল ব্রায়ান। 'আমি দুঃখিত, ডিয়ার। তোমাকে কথাটা মনে করিয়ে দেয়া মোটেই উচিত হয়নি।'

সুহিতা স্বামীর হাত মুঠো করে ধরল, 'না, ডার্লিং, এ ব্যাপারটাকে এড়িয়ে যাওয়া যাবে না। তা হলে আমারই বরং ক্ষতি। আর কুকুরটা সম্পর্কে ঠিক কথাই বলেছ তুমি। ওর মুখটা আমার মুখের এত কাছে ছিল, পলকে মনে পড়ে গিয়েছিল ড্রাগোর কথা। মাত্র তিন বছর আগের ঘটনা। এত তাড়াতাড়ি ভুলি কী করে সে কথা?'

'তুমি এখনও স্বপ্ন দেখছ, না?'

'হ্যাঁ,' স্বীকার করল সুহিতা। 'তবে ঘনঘন নয়।'

ব্রায়ানের কপালে ভাঁজ পড়ল, 'ড. গারফিল্ডের সাথে আবার কবে দেখা করবে?'

'কাল।'

'ওঁর পরামর্শ তোমার সত্যি কাজে লাগছে তো?'

'উনি যথাসাধ্য করছেন।'

ব্রায়ান স্ত্রীর হাতে আলতো চাপড় দিল। 'ঠিক আছে। তা হলে ওঁর কাছেই যাব আমরা। আশা করি উনি তোমার স্মৃতি থেকে ড্রাগোর ঘটনা মুছে ফেলতে পারবেন।'

রাতের বেলা ঘুমন্ত স্বামীর পাশে শুয়ে ওর কথাই ভাবছিল সুহিতা। স্মৃতি থেকে ড্রাগোর ঘটনা সত্যি মুছে ফেলা গেলে সুহিতার চেয়ে খুশি কেউ হত না। কিন্তু তা হবার নয়। শোবার ঘরের এ জানালা দিয়ে দেখা যাওয়া ওই চাঁদের মতই বাস্তব ড্রাগো। বাস্তব সেই ওয়্যারউলফগুলোও। আর সুহিতা জানে ওদের কেউ না কেউ বেঁচে আছে কোথাও।

নয়শো মাইল দূরে, ক্যালিফোর্নিয়ার একটি গ্রামে আরেক রমণী জেগে আছে তার পুরুষের পাশে। চাঁদের আলোয় তার লম্বা, কমনীয় শরীর হাতির দাঁতের মত জ্বলজ্বল করছে। বালিশে ছড়িয়ে আছে কালো চুলের বন্যা, মাথার এক পাশে, কপাল ঘেঁষা শুকনো কাটা দাগটা যেন রূপোলি একটা ঝিলিক।

পুরুষটি ঘুমের মধ্যে ছটফট করে উঠল। রমণী তার নগ্ন, প্রশস্ত বুকে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ফিসফিস করে বলল, 'ঘুমাও, প্রিয় আমার। আমাদের হাতে অনেক কাজ। শীঘ্রি বেরুতে হবে কাজে।'

দুই

ড. আব্রাহাম গারফিল্ডের অফিস নতুন ফ্যারেল বিল্ডিং-এ। অফিসের জানালা দিয়ে লেক ওয়াশিংটনের জলে ভেসে বেড়ানো সেইলবোটগুলো দেখছে সুহিতা। উজ্জ্বল গ্রীষ্মের দিন। বিশ্রী বৃষ্টির কাল শেষ। সিয়াটলের মানুষ দল বেঁধে বাইরে যাচ্ছে সূর্য স্নানে।

জানালার পাশে দাঁড়িয়ে নীরস ও নিরুত্তাপ গলায় কথা বলছে সুহিতা। শেষে যোগ করল, 'তো এই হলো ব্যাপার। কুকুর নিয়ে হাস্যকর একটা দুর্ঘটনা।'

ড. গারফিল্ড ঝাড়া পনেরো সেকেণ্ড নিশ্চুপ রইলেন। সুহিতা জানে এটা তাঁর এক ধরনের কৌশল। চুপ থেকে তিনি রোগীকে আরও বিস্তারিত কথা বলার সুযোগ দেন। কিন্তু সুহিতার আর কোনও বক্তব্য নেই বুঝতে পেরে কথা বললেন ডাক্তার।

'তা হলে তোমার মতে ওটা শুধুমাত্র একটা কুকুরই ছিল?'

সুহিতা ঘুরল ডাক্তারের দিকে, 'অবশ্যই ওটা শুধুমাত্র একটা কুকুর ছিল।' গারফিল্ডের ডেস্কের সামনের চেয়ারে হেঁটে এল সে, বসল। 'আমি হঠাৎ ভয় পেয়ে যাই পুরানো স্মৃতি মনে পড়ে যাবার কারণে। দ্যাটস অল।'

বিজ্ঞের মত মাথা দোলালেন ডাক্তার। 'ইয়েস, আই সী। স্বপ্নের কথা বলো। বললে এখনও নাকি স্বপ্ন দেখছ?'

ঠোঁট কামড়ে ধরল সুহিতা, কুঁচকে গেছে ভুরু।

'জ্বী। কুকুরের ঘটনাটার চেয়ে স্বপ্নগুলোই আমাকে অস্বস্তিতে ফেলে দিচ্ছে বেশি। রাতের বেলা ওই ডাক শোনার কবল থেকে কি কোনদিনই রক্ষা পাব না, ডাক্তার?'

'তুমি বুঝতে পারছ যে শুধু স্বপ্নেই ওটা শুনছ... নেকড়ের ডাক?'

চেয়ারে হেলান দিল সুহিতা। জানালা গলে আসা সূর্যের আলো ওর ঝলমলে কালো চুলে খেলা করছে। ওর আটাশ চলছে। চোখের কোণের সামান্য ভাঁজ বরং ওর সৌন্দর্য ও ব্যক্তিত্বকে প্রখর করে তুলেছে।

'জ্বী, ডক্টর,' ...ক্লান্ত গলা সুহিতার। 'শুধু স্বপ্নেই নেকড়ের ডাক শুনতে পাই আমি। তবে বছর তিনেক আগে ড্রাগোর নেকড়ের ডাক ছিল বাস্তব। মৃত্যুর মত বাস্তব।'

ডাক্তার সবজান্তার হাসি ফোটালেন ঠোঁটে। বললেন, 'হুম্। বুঝতে পারছি।'

'আপনি কিছুই বুঝতে পারছেন না,' বলল সুহিতা। 'আমার স্বামীর মত আপনিও ড্রাগোর ঘটনা বিশ্বাস করেন না। অন্যেরাও তাই।'

যথারীতি পনেরো সেকেণ্ড বিরতি দিয়ে ডাক্তার বললেন, 'সুহিতা, আমি কী বিশ্বাস করি বা না করি সেটা জরুরী বিষয় নয়। অতীতে কী ঘটেছিল বা ঘটেনি তা নিয়েও আমাদের মাথা ব্যথা নেই। আমাদের কাছে জরুরী বিষয় হলো বর্তমান মুহূর্ত। তুমি এ মুহূর্তে কেমন বোধ করছ সেটাই আসল ব্যাপার।'

সুহিতা ডাক্তারের চোখের দিকে তাকাল।

'এ মুহূর্তে আমার ভেতরে যে বোধ কাজ করছে তা হলো ভয়,' বলল সে।

'কেন?'

'কারণ আমি জানি ওরা কেউ কেউ বেঁচে আছে।'

'ওরা মানে...?'

'ওরা মানে নেকড়ের দল।' বলল সুহিতা। 'মায়া নেকড়ে বা ওয়্যারউলফ।'

তীক্ষ্ণ চোখে ডাক্তারকে দেখছে সুহিতা প্রতিক্রিয়ার আশায়–চোখ সরু হয়ে যাওয়া কিংবা মুখের কোণে সামান্য সংকোচন যা মাঝে মাঝেই সে লক্ষ করেছে। তবে ড. গারফিল্ডের চেহারায় বন্ধুসুলভ ভাব ফুটল।

'তুমি কি বলবে আমাকে ঘটনাটা?' জানতে চাইলেন তিনি।

'ডাক্তার, আপনাকে আগেই বলেছি ঘটনাটি।'

'তবু আরেকবার বলো। হয়তো এতে তোমার উপকারই হবে।'

বলতে অসুবিধে কী, ভাবল সুহিতা। বরং বারবার ঘটনাটা কাউকে বললে হয়তো এটা ওর নিজের কাছেই এক সময় অর্থহীন বলে মনে হতে থাকবে।

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল সুহিতা, ফিরে গেল জানালার ধারে। শান্ত, সমাহিত লেক দেখতে দেখতে ড্রাগোর ভূতুড়ে গ্রামের গল্প বলল সে। জানাল রায়হান মর্তুজার সঙ্গে ওখানে ছুটি কাটাতে যাবার কাহিনি। রাতের বেলা ডেকে উঠত নেকড়েরা। একদিন তার ছোট কুকুরটা মর্মান্তিক শিকার হয় নেকড়ের। বলল গ্রামের অদ্ভুত বাসিন্দা এবং বিশালদেহী নেকড়ের কথা। জানোয়ারটা রাতের বেলা ঘুরে বেড়াত জঙ্গলে। শান্ত, সংযত কণ্ঠে সে কৃষ্ণকেশী মার্সিয়া লুরা'র বর্ণনা দিল যে মেয়েটি জাদু করেছিল তার স্বামীকে এবং এক পর্যায়ে লুরা'র বিষাক্ত কামড়ে ওয়্যারউলফে পরিণত হয় রায়হান। লুরা তার স্বামীকে নিয়ে চলে যায়। সে আর সাগর চৌধুরী জ্বলন্ত গ্রামটি থেকে কীভাবে পালিয়ে এসেছিল সবশেষে তার বর্ণনা দিল সুহিতা।

চুপচাপ গল্প শুনলেন ড. গারফিল্ড। তারপর মন্তব্য করলেন, 'তুমি বললে ওরা সবাই মরেনি। মায়া নেকড়েগুলো।'

'আমরা যখন উপত্যকা থেকে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে আসি, ওই

সময় পেছনে সবকিছু দাউ দাউ করে জ্বলছিল। জঙ্গল থেকে ওটার ডাক আবার শুনতে পাই আমি। নেকড়ের ডাক।'

চুপ হয়ে গেল সুহিতা, ফিরে এল নিজের চেয়ারে। 'গল্প বলে আমার কোনও লাভ বা ক্ষতি নেই। স্মৃতিটা মনের মাঝে পরিষ্কার হয়ে আছে। আমি ড্রাগোর কথা ভুলে যেতে চাই। চিরদিনের জন্যে।'

'বুঝতে পারছি,' সহানুভূতির স্বর ডাক্তারের কণ্ঠে। 'আর সে উদ্দেশ্যেই আমরা কাজ করে চলেছি, তাই না? তবে সুহিতা, এ স্মৃতি তোমার মন থেকে দূর করার আগে আমাদের দেখতে হবে এটা কীভাবে তোমার মনের মধ্যে ঢুকে গেল।'

কটমট করে ডাক্তারের দিকে তাকাল সুহিতা। তারপর শব্দগুলো নির্বাচন করল সতর্কতার সাথে।

'আমার মনের মধ্যে যা ঢুকে আছে, খোদার কসম, তা ঘটেছে।'

'তা তো অবশ্যই,' বলে চললেন ডাক্তার। 'শৈশবে হয়তো এরকম কোনও অভিজ্ঞতা তোমার হয়েছে, কুৎসিত কোনও প্রাণী, নেকড়ে কিংবা বড় আকারের কুকুরকে নিয়ে।'

সুহিতা মাথা নাড়ল ক্লান্ত ভঙ্গিতে। 'না, ডাক্তার। ছোটবেলায় এরকম কোনও অভিজ্ঞতা আমার হয়নি। ছেলেবেলা আমার কেটেছে বাংলাদেশে। সেখানে নেকড়ে নেই। আর আমাদের বাড়িতে কেউ কুকুর পুষত না। বড় হবার পরে আমি জীবনে প্রথম নেকড়ে দেখেছি তিন বছর আগে, ড্রাগোতে। নেকড়ে নিয়ে ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা আমার তখনই হয়েছে। আপনি সেই একই কথা বারবার বলছেন...ডিল্যুশন।'

'ডিল্যুশন শব্দটি আমরা খুব কমই ব্যবহার করি। মনের মাঝে যা ঘটে তা স্বচ্ছ এবং পরিষ্কার এবং কখনও কখনও আমরা যাকে বলি বাস্তবতা, তার চেয়েও ক্ষতিকর। তোমার ড্রাগোর অভিজ্ঞতা এই যে আমরা বসে আছি এ ঘরে, এরকমই কোনও বাস্তব ঘটনা,

মানছি। তবে আসল ব্যাপার হলো, আমি যা বলছিলাম...'

সুহিতা অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে শুনছে ডাক্তারের কথা। এক কান দিয়ে কথাগুলো ঢুকছে, অন্য কান দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। সেই পুরানো বুলি। ড্রাগোর ঘটনা পুরোটাই নাকি সুহিতার কল্পনা। হয়তো এক সময় তিনি সুহিতাকে ব্যাপারটি বিশ্বাস করিয়েও ছাড়বেন। তা হলে ব্রায়ানের পয়সাটা উসুল হবে।

ডাক্তারের গলার স্বরে সূক্ষ্ম পরিবর্তন টের পেয়ে ডেস্কের ছোট্ট ঘড়িটির দিকে তাকাল সুহিতা। তার জন্য-নির্ধারিত সময় শেষ হয়ে গেছে।

তিন

সুহিতা উত্তরে অরোরা ব্রিজ দিয়ে ধীরে সুস্থে গাড়ি চালিয়ে মাউন্টলেক টেরেসে নিজেদের বাড়িতে ফিরছে। ড. গারফিল্ডের কাছ থেকে বিদায় নেয়ার পরে সব সময়ই ড্রাগো আর তার পরের ঘটনাগুলো মনে পড়ে যায় ওর। কালো মাদি নেকড়েটার মাথায় গুলি করেছিল সুহিতা। তখন খুব আনন্দ হয়েছিল। কিন্তু সে আনন্দের রঙ ক্রমে ফিকে হয়ে যায় ওর আর সাগর চৌধুরীর কাছে।

পরের ছ'টা মাস ঝড়ের গতিতে কেটেছে ওদের। দু'জনেই ভান করেছে যেন কিছুই ঘটেনি। ড্রাগোর ওই ঘটনার পরে একত্রেই ছিল ওরা। সেটাই স্বাভাবিক ভেবেছিল। কিন্তু ধারণাটা ছিল ভুল। একটা সময় উদ্দেশ্যহীনভাবে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়িয়েছে দু'জনে। কিন্তু বুকের ভেতর লুকিয়ে রাখা আবেগ-

অনুভূতিগুলো পরস্পরের শত্রু হয়ে ওঠে শীঘ্রি। ছয় মাস বাদে, ওদের সম্পর্ক পৌঁছে যায় তিক্ততার চরমে। সামান্য কথা কাটাকাটিও কুৎসিত বাকযুদ্ধে মোড় নেয়ার সম্ভাবনা ছিল যথেষ্টই। ওরা তখন লাস ভেগাসের এক হোটেলে থাকছে, তবে আলাদা ঘরে। এমন সময় ঘটল বিস্ফোরণ।

সুহিতা সারা সকাল নিজের ঘরেই ছিল। এয়ারকুলার ফুল স্পীডে চালিয়ে, গলা পর্যন্ত সুয়েটারের বোতাম এঁটে বসে ছিল চুপচাপ। সাগর গিয়েছিল সুইমিংপুলে, সাঁতার কাটতে। সুহিতাকেও যেতে বলেছিল। যায়নি সুহিতা। দুপুর বেলা সুহিতার ঘরে ঢুকল সাগর। ওর দিকে একবার নজর বুলিয়ে গেল নিজের ঘরে। ঢুকল বাথরুমে। গোসল সেরে, শেভ করে, পোশাক বদলে বেরিয়ে এল। তারপর আবার গেল সুহিতার কাছে। সুহিতা আগের মতই নিশ্চল বসে আছে।

'নীচে গিয়ে লাঞ্চ খাবে?'

'ওপরে আনিয়ে নেয়া যায় না?'

'কেন?'

'আমার ঘর থেকে বেরুতে ইচ্ছে করছে না।'

'ফর গডস সেক, সুহিতা, এভাবে ভীতু একটা শিশুর মত বসে থেকে পৃথিবীর কাছ থেকে তুমি লুকিয়ে থাকতে পার না।'

ভোঁতা ছুরির মত খোঁচা লাগল সাগরের কথাগুলো। জ্বলে উঠল সুহিতাও, 'আমার যা ইচ্ছে তাই করতে পারি। আমি কী করব না করব তা নিয়ে কথা বলার তুমি কে? আমার ওপরে খবরদারী করার অধিকার তোমাকে কেউ দেয়নি।'

অন্ধকার ঘনাল সাগরের চেহারায়, এক মুহূর্তের জন্যে বিপজ্জনক দেখাল। তারপর ঝট করে ঘুরল সে, ঝড় তুলে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। ওর গায়ে কিছু একটা ছুঁড়ে মারার অদম্য ইচ্ছেটা বহু কষ্টে দমন করল সুহিতা। প্রচণ্ড রাগে কানের ভেতরে রক্তের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ যেন শুনতে পাচ্ছিল সে।

জানালার সামনে হেঁটে গেল সুহিতা, একটানে ফাঁক করে ধরল পর্দা, লাস ভেগাসের উজ্জ্বল সূর্যালোকে তাকাল চোখ পিটপিট করে। বারোতলা থেকে সে নীচের সুইমিংপুলের চারদিকে ছড়ানো ছিটানো লোকজন দেখতে পেল। সবাই যেন হাসছে, মনের খুশিতে আছে। উপভোগ করছে সময়। সারা পৃথিবীতে কি একমাত্র আমিই দুঃখে আছি? ভাবল সুহিতা।

জানালার পর্দা আবার টেনে দিল সুহিতা, ফিরে এল চেয়ারে, যেখানে সারাটা সকাল কাটিয়েছে। চেয়ারে বসে ঠাণ্ডায় কাঁপতে লাগল। একঘণ্টা পর ফিরল সাগর।

পেছনে দড়াম করে দরজা বন্ধ করল সে। তাকাল সুহিতার দিকে। 'তুমি এসি বন্ধ করনি কেন?'

'আমার এভাবেই ভাল লাগে।'

রেগে উঠতে গিয়েও সামলে নিল সাগর।

'সুহিতা, আমাদের কথা বলা উচিত।'

'কেন?'

'কারণ আমরা একে অপরকে ধ্বংস করে ফেলছি। আমি আর সহ্য করতে পারছি না।'

'সেটা তোমার সমস্যা।'

'তুমি সব সময় আমাকে খোঁচা মেরে কথা বলো। এভাবে আর চলা যায় না। এতে তোমার কি খুব একটা সুবিধে হচ্ছে? আয়নায় আজকাল দেখেছ নিজেকে?'

'বেশ, অনেক ধন্যবাদ।'

'দয়া করে এসব ছেলেমানুষী বন্ধ করবে? আমি জানি ড্রাগোতে কীসের মাঝ দিয়ে তোমাকে যেতে হয়েছিল। কিন্তু—'

স্প্রিং-এর মত চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল সুহিতা। ফর্সা মুখটা মুহূর্তে লাল। 'আমি কীসের মাঝ দিয়ে গিয়েছি সে সম্পর্কে তোমার কোনও ধারণাই নেই। তুমি তো শেষের দিকে হাজির হয়েছ ওখানে। আমি ওই জায়গায় ছয় মাস ছিলাম। নরকে ছ'টা

মাস।'

নিয়ন্ত্রিত এবং সতর্ক গলায় সাগর বলল, 'আমি সে কথা জানি, সুহিতা। জানি অনেক ভুগেছ তুমি। আমি এখন তোমাকে সাহায্য করতে চাই।'

'আচ্ছা? কী ভাবে সাহায্য করবে শুনি?'

'পুরো ব্যাপারটা সবাইকে জানিয়ে দিতে চাই। এ নিয়ে কথা বলতে চাই।'

'আমি চাই না।' ফোঁস করে উঠল সুহিতা। 'তোমার সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলতে চাই না, অন্য কারও সাথে তো নয়ই।'

'ড্রাগো নিয়ে তুমি একমাত্র আমার সঙ্গেই কথা বলতে পার,' বলল সাগর। 'আমিই একমাত্র ঘটনাটা বিশ্বাস করব। কারণ আমি ওখানে ছিলাম। আমি নেকড়েগুলোকে দেখেছি এবং জানি ওরা কী ছিল।'

সুহিতা দু'হাতে কান চেপে ধরল। 'আমি আর শুনতে চাই না। আমি এ নিয়ে আর ভাবতেও চাই না। তুমি ড্রাগোর কথা আমাকে ভুলতে দিচ্ছ না কেন?'

'ড্রাগোর কথা ভুলতে পারবে না তুমি,' বলল সাগর। 'সব সময় তোমার মাথার মধ্যে গেঁথে থাকবে ওটা। শুধু যদি ব্যাপারটা নিয়ে খোলাখুলি কথা...'

'খোলাখুলি কথা নিয়ে তুমি জাহান্নামে যাও। তুমি ওই হারমাজাদা মনোবিজ্ঞানীগুলোর মত কথা বলছ। তোমার মেডিকেল ডিগ্রীখানা কোত্থেকে জোগাড় করেছ, ডক্টর?'

'চুপ করো। সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছ।'

'সহ্য করতে কে বলেছে? যার ভার সইতে পারবে না তা নিতে যাও কেন? কেউ তোমাকে ধরে রাখেনি।'

'ঠিক বলেছ,' হঠাৎ ঠাণ্ডা শোনাল সাগরের কণ্ঠ। 'কেউ ধরে রাখেনি।'

ত্রিশ মিনিট বাদে সাগর চৌধুরী তার সুটকেস গুছিয়ে চলে

গেল হোটেল ছেড়ে। এরপরে আড়াই বছর কেটে গেছে। আজতক সাগরের সঙ্গে দেখা হয়নি সুহিতার।

সাগর চৌধুরীর সাথে লাস ভেগাসে ছাড়াছাড়ি হবার পরের স্মৃতি টুকরো টাকরা মনে আছে সুহিতার। ওই সময় প্রচণ্ড মানসিক চাপে নার্ভাস ব্রেক ডাউনের শিকার হয় সে। তবে, যেভাবেই হোক লস এঞ্জেলেসের ব্রেণ্টউডে বাবা-মা'র কাছে ফিরে গিয়েছিল সুহিতা। পরের দু'মাস সারাদিন ওর সেবায় একজন নার্স নিয়োগ করা হয়। দোতলার বেডরুম, যেখানে কাটিয়েছে বয়ঃসন্ধিকাল, সেই ঘর থেকে একবারের জন্যেও বেয়োয়নি ও। দিনগুলো ছিল নিষ্প্রাণ আর রাতগুলো ছায়ায় ভরা যেখানে ওঁৎ পেতে থাকত সীমাহীন আতঙ্ক।

আস্তে আস্তে সুস্থ হতে থাকে সুহিতা। ড্রাগোর ঘটনা নানাজনকে বলেছে ও। কেউ ওর কথা বিশ্বাস করেনি, যদিও সহানুভূতির সাথে শুনেছে সবাই। সাগর ঠিকই বলেছিল। বিষয়টি নিয়ে কথা বলায় মানসিক চাপ অনেকটাই কমে গিয়েছিল।

বাবা-মা'র সাথে ছয় মাস কাটিয়েছে সুহিতা। তারপর পুরোপুরি শারীরিক শক্তি ফিরে পায়। সাগর চৌধুরীর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেছিল। শুনেছে সাগর তার ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মের কাজে দীর্ঘদিনের জন্যে শহরের বাইরে গেছে। এই-ই হয়তো ভাল হলো, ভেবেছে সুহিতা। সাগরের কাছে খারাপ ব্যবহারের জন্যে ক্ষমা চাইত সে। তবে ওর সঙ্গে দেখা হলে হয়তো পুরানো ঘায়ে আবার নতুন করে খোঁচা লাগত।

সুহিতাকে তার এক কলেজ ক্লাসমেট সিয়াটলে ক'টা দিন কাটিয়ে যাবার জন্য লিখেছিল। বান্ধবীর কাছে উড়ে যায় সুহিতা আর তার দেয়া এক পার্টিতে ব্রায়ান অ্যাডামসের সঙ্গে পরিচয় হয়।

ব্রায়ান সুহিতার চেয়ে কুড়ি বছরের বড়, পেশীবহুল শরীর। তার মধ্যে রায়হান মর্তুজার স্বপ্নময় রোমান্টিসিজম কিংবা সাগর

চৌধুরীর উচ্ছ্বাস নেই, তবে সুহিতা যা চেয়েছিল, পেয়েছে। ব্রায়ানের আগের পক্ষের ছেলের কথা জেনে সে প্রথম একটু দ্বিধায় পড়ে গেলেও হ্যারি প্রথম দর্শনেই সুহিতাকে 'মা' বলে ডেকে দু'জনের মাঝে অনাবিল সম্পর্ক গড়ে তুলেছে।

তবে সুহিতার কাছে সবচেয়ে বড় পরীক্ষা ছিল যখন ব্রায়ানকে ড্রাগোর ঘটনা বলে। ধৈর্য ধরে, সিরিয়াস চেহারা নিয়ে গল্প শুনেছে ব্রায়ান। হাসেনি, কিংবা উৎসাহও দেয়নি। বলাবাহুল্য ঘটনাটাকে সে-ও বাস্তব বলে মনে করেনি, ধরে নিয়েছে সুহিতার কল্পনা।

পরিচয় হবার দু'মাস পরে ব্রায়ান সুহিতাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। সুহিতাকে সে নিরাপত্তা, স্থায়ীত্ব এবং নীরব প্রেমের নিশ্চয়তা দিয়েছিল যে বিষয়গুলো সুহিতার কাছে এর আগে ছিল অজানা। সুহিতা 'হ্যাঁ' বলে দেয়। অবশ্য তার আগে বাবা-মা'র মতামত নিয়েছে সে। উদারপন্থী বাবা-মা মেয়ের সুখের জন্যে ভিন্নধর্মী বয়সী পাত্রকে জামাই হিসেবে মেনে নিতে আপত্তি করেননি।

সুহিতা মিসেস সুহিতা অ্যাডামসের জীবন নিয়ে সুখেই আছে। কিন্তু গোলাপের কাঁটার মত মনের মাঝে খচখচ করে মায়া নেকড়েদের দুঃস্বপ্ন, যারা একদিন, কোথাও সুযোগ পেলেই হত্যা করবে ওকে। সুহিতা জানে না এই আতঙ্কের কবল থেকে সে রক্ষা পাবে কি না।

চার

ক্যালিফোর্নিয়ার স্যান জোয়াকিন ভ্যালিতে, জঙ্গলের কিনারে,

ফাঁকা একটি জায়গায় ক্যাম্প করল একদল জিপসি। নাটক কিংবা সিনেমায় দেখা রোমান্টিক ক্যাম্পের মত নয় এদের ক্যাম্প। ঘোড়ায় টানা বর্ণিল ওয়াগনের বদলে জিপসিদের বাহন হলো ভ্যান, পিক-আপ ট্রাক, ট্রাভেল ট্রেলার এবং ক্যাম্পার। তাঁবু থেকে ভেসে আসছে ট্রানজিসটর রেডিও এবং টেপ ডেকের মিউজিক, বেহালা এবং তাম্বুরিনের রক্তে বান ডাকা সঙ্গীত নয়।

তবে কিছু কিছু জিনিস অপরিবর্তিত রয়ে গেছে শতাব্দী ধরে। জিপসিদের অনেকেই দৈনিক পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে পড়শীদের মাঠে কাজ করলেও ওরা প্রকৃতিগতভাবেই ভবঘুরে। গোটা একটি ক্যাম্প এক রাতের মধ্যেই অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে। পরদিন হয়তো তাদের দেখা যাবে কয়েক মাইল দূরের অন্য কোনও জায়গায়। জিপসিরা এখনও দূরবর্তী ক্যাম্পের মধ্যে নিজস্ব পদ্ধতির যোগাযোগ ব্যবস্থা ধরে রেখেছে যা চিঠিপত্র আদান-প্রদানের চেয়ে অনেক বেশি দ্রুত গতিসম্পন্ন।

আরেক দিকেও আধুনিক জিপসিদের সঙ্গে তাদের পূর্ব-পুরুষদের মিল রয়েছে। প্রাচীন কুসংস্কারে তাদের গভীর বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা। তারা বিশ্বাস করে হাতের রেখায় লেখা থাকে মানুষের ভাগ্য। জিপসিদের বদ্ধমূল ধারণা, প্রকৃতির আইনের বাইরে যাদের বিচরণ তাদেরকে সব সময় ভয় করে চলতে হয়, এদের সঙ্গে কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করতে নেই।

এ কারণে জিপসিরা তাদের ক্যাম্পের চৌহদ্দিতে থাকা পুরানো, লজ্‌ঝড়ে একটি ট্রেলারকে সভয়ে এড়িয়ে চলে। ঐতিহ্য অনুযায়ী তারা ওই ট্রেলারে বসবাসকারীদের রক্ষণাবেক্ষণ এবং নিরাপত্তা দিতে বাধ্য। কিন্তু পূর্বপুরুষের ভয় তাদের মধ্যে কাজ করে বলে তারা ওই ট্রেলারের ধারে কাছেও ঘেঁষে না।

ট্রেলারের ভেতরটা ছায়াময়, সবুজ পর্দা লাগানো দুটো ছোট জানালা শুষে নিচ্ছে সূর্যের আলো। রান্নার জন্য দেয়ালের মধ্যে

তৈরি করা হয়েছে চোর-কুঠরি, আছে একটি গ্যাসের উনান এবং রিফ্রিজারেটর। টেবিল এবং বেঞ্চিও আছে। যখন ব্যবহার করা হয় না ওইসময় ওইগুলো ভাঁজ করে রাখা হয়। ট্রেলারের দূর প্রান্তে, প্রায় পুরোটা জায়গা জুড়ে একটি খাট। বিছানায় অনেকগুলো বালিশ, সিল্কের স্কার্ফ, নরম কম্বল এবং কোঁচকানো একটি ম্যাট্রেস।

বিছানার বালিশ এবং স্কার্ফের মাঝে শুয়ে আছে একজন নারী এবং একজন পুরুষ। নগ্ন। ঘামে ভেজা শরীর। পুরুষটির চুল কালো, বুক এবং কাঁধ বেশ চওড়া। মেয়েটির গায়ের রঙ দুধের মত সাদা, সুগঠিত, লম্বা একটা শরীর, আবেদনময় সবুজ চোখ। তার চুল মধ্যরাতের মত কালো। মেয়েটির নাম মার্সিয়া। পুরুষটি রায়হান।

তিন বছর আগে ড্রাগো গ্রামে মার্সিয়ার সঙ্গে পরিচয় ওর। তখন থেকে এই নারীর কেনা গোলাম হয়ে আছে রায়হান মর্তুজা। কারণ বিছানায় মার্সিয়ার তুলনা হয় না।

'তোমাকে তৃপ্তি দিতে পেরেছি তো, রায়হান?' রায়হানের প্রশস্ত বুকের কালো লোমে আঙুল দিয়ে বিলি কাটতে কাটতে জানতে চাইল মার্সিয়া।

বুক ভরে দম নিল রায়হান, ধীরে সুস্থে ছাড়ল নিঃশ্বাস।

'এত সুখ জীবনে পাইনি।'

'তুমি আমাকে কোনদিন ছেড়ে যাবে না তো?'

ঘাড় ঘুরিয়ে মার্সিয়ার দিকে তাকাল রায়হান। 'তোমাকে ছেড়ে যাব, মার্সিয়া? অসম্ভব!'

'শুনে খুশি হলাম,' ঘাড় আর কাঁধের সংযোগস্থলের পেশী ম্যাসেজ করছে মার্সিয়া। 'আমরা শীঘ্রি এ জায়গাটা ছেড়ে চলে যাব।'

মার্সিয়ার আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করে বিছানায় উঠে

বসল রায়হান। মার্সিয়ার পেলব শরীরে হাত বুলাল। 'লম্বা ভ্রমণ করার শক্তি আছে গায়ে?'

'আমি এখন যথেষ্ট সুস্থ। আমার অনেক সেবা করেছ তুমি, রায়হান। আর সেবা করতে হবে না।'

'তোমাকে আমি সবসময় আমার কাছে পেতে চাই।'

'আমি সবসময় তোমার কাছেই থাকব,' বলল মার্সিয়া। 'তোমার প্রেমিকা এবং সঙ্গিনী হয়ে। কিন্তু তুমি তো জানোই আমাদের কী করতে হবে।'

মুখ ঘুরিয়ে অন্য দিকে তাকাল রায়হান। বিছানার পাশে পড়ে থাকা জামা-কাপড়ে হাত বাড়াল। 'মানে...সুহিতা।'

'হ্যাঁ!' সবুজ আগুন জ্বলল মার্সিয়ার চোখে। 'ওই মহিলা।'

রায়হান ঘুরল মার্সিয়ার দিকে। সুহিতাকে কী প্রচণ্ড ঘৃণাই না করে এই নারী! 'আবার ওসব শুরু করব আমরা?' জিজ্ঞেস করল ও। 'অনেকদিন তো হয়ে গেল।'

রায়হানের ওপর ধীরস্থির দৃষ্টি বুলাল মার্সিয়া। কথা বলার সময় হিমশীতল শোনাল কণ্ঠ। 'ওর জন্য নিশ্চয় তোমার এখনও প্রেম উথলে উঠছে না। নাকি উঠছে?'

'ও আমার বিবাহিতা স্ত্রী ছিল,' জবাব দিল রায়হান।

'তোমার স্ত্রী!' হিসহিস করে উঠল মার্সিয়া। 'ওই মহিলা স্ত্রী হবার যোগ্যতা রাখে? ও যদি তোমাকে তৃপ্তি দিতে পারত তা হলে তুমি আমার কাছে আসতে না।'

'কিন্তু এসব বহু আগের কথা।'

'তাই নাকি? তাই নাকি, রায়হান? কিন্তু আমার তো মনে হচ্ছে যেন গতকালই ঘটেছে ঘটনা।' বাম ভুরুর ওপরে কপালের কাছটায় কাটা দাগে হাত বুলাল মার্সিয়া। কালো চুলের অরণ্যের মাঝে রূপোর মত চকচক করছে দাগটা। 'আয়নায় তাকালেই ওই মহিলার ছবি ভেসে ওঠে চোখে। মনে পড়ে যায় কীভাবে ও আমার মাথা লক্ষ্য করে সিলভার বুলেট ছুঁড়েছিল।'

'ও আত্মরক্ষার চেষ্টা করছিল।'

'তুমি এখন ওর পক্ষ নিচ্ছ।'

'না, মার্সিয়া। আমি সবসময় তোমার সঙ্গে আছি। তুমি জান সে কথা।'

'অথচ যে মহিলা আমাকে খুন করতে চেয়েছিল তার পক্ষে কথা বলছ।'

'সে জানত না ওটা তুমি। সে শুধু একটা নেকড়ে দেখেছে।'

'তুমি ওকে আণ্ডারএস্টিমেট করছ, রায়হান। ও জানত। অবশ্যই জানত। হ্যাঁ, সে একটা নেকড়ের শরীর দেখেছিল। তবে সে এক মহিলার শক্তিকে হত্যা করতে চাইছিল যে মহিলা তার কাছ থেকে তার স্বামীকে কেড়ে নিয়েছে।'

হাত বাড়িয়ে মার্সিয়ার মখমলের মত চুলে আদর করল রায়হান। 'বেচারী, মার্সিয়া। তুমি আরেকটু হলেই মরতে বসেছিলে।'

মুখ শক্ত হয়ে গেল মার্সিয়ার। 'কিন্তু এখন আমি সুস্থ আছি। গায়ে জোরও আছে। অন্তত নারীত্বের অংশটুকু এখনও আমার মাঝে অবশিষ্ট রয়েছে। তবে বাকি অংশটুকু....সিলভার বুলেটটা যদি কপালের আরেকটু সামান্য নীচে লাগত তা হলেই বরং ভাল হত।'

অন্য দিকে তাকাল রায়হান।

'তুমি তো জানোই ওই মহিলার সিলভার বুলেট আমার কী মস্ত ক্ষতি করেছে। সে নেকড়ের শক্তি কেড়ে নিয়েছে, কেড়ে নিয়েছে রাতের স্বাধীনতা। তোমার মনে পড়ে রায়হান সেইসব উদ্দাম, মুক্ত রাতগুলোর কথা? আমরা ইচ্ছেমত জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতাম, মিলিত হতাম। মনে আছে কী দারুণ আনন্দ দিতাম আমরা একে অন্যকে?'

'মনে আছে আমার,' বলল রায়হান। তবে মার্সিয়ার দিকে এখনও তাকাতে পারছে না।

'ওই বুনো আনন্দের স্বাদ আমি আর কোনদিন উপভোগ করতে পারব না।' বলল মার্সিয়া। 'এখন থেকে রাতের বেলা তোমাকে একাই বেরুতে হবে।'

মুখ ফেরাল রায়হান। সবুজ চোখ জোড়ায় তাকাল গভীর দৃষ্টিতে। 'কোনও উপায় কি নেই...?'

'না। আমার জীবনে যা ঘটেছে, আমৃত্যু এ অভিশাপ আমাকে বয়ে বেড়াতে হবে। ওই রাতগুলো আমাকে একা থাকতে হবে।'

'তোমার সঙ্গে আমাকে থাকতে দিয়ো,' অনুনয় করল রায়হান, 'সম্ভব না। যখন আমার শারীরিক পরিবর্তন ঘটবে... না, ওই দৃশ্য তুমি দেখার আগে যেন আমার মরণ হয়। তবে আমি গায়ে এখন শক্তি ফিরে পেয়েছি। বেশিরভাগ রাতেই নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি আমি। তবে মাঝে মাঝে, যখন পূর্ণিমার চাঁদ ওঠে, যেমন আজ রাতে উঠবে...' বাক্যটি অসমাপ্ত রেখে চুপ হয়ে গেল মার্সিয়া।

'তোমাকে আমি ভালবাসি, মার্সিয়া। তোমার সঙ্গে সব কিছুতেই আমি সামিল হতে চাই।'

'কিন্তু এ ব্যাপারটিতে নয়,' খেঁকিয়ে উঠল মার্সিয়া। পরক্ষণে নরম করল সুর। 'যে মহিলা আমার অর্ধেক সত্তা ধ্বংস করেছে তার ওপর প্রতিশোধ নেব আমি। যদি সত্যি ভালবাস আমাকে প্রতিহিংসা হাসিলে সামিল হতে পার।'

ধীরে মাথা দোলাল রায়হান। এই সবুজ নয়না সুন্দরীকে নিজের করে পেতে যা খুশি করতে রাজি ও।

জানালার পর্দায় তাকাল মার্সিয়া। গাঢ় ছায়া ঘনিয়েছে ওখানে। বাইরে দ্রুত নিভে আসছে আলো। 'সম্ভব হলে আজ রাতেই এখান থেকে চলে যেতাম,' বলল সে। 'কিন্তু পারব না। কারণ আজ যে ভরা পূর্ণিমা।'

'তুমি....সুহিতা কি সত্যি এখনও সিয়াটলে?'

'ও এখনও ওখানে আছে,' বলল মার্সিয়া। 'জিপসিরা

আমাদের হয়ে ওর ওপর লক্ষ রাখছে। জিপসিদের চোখ এড়িয়ে ও কোথাও যেতে পারবে না কিংবা কিছু করতে পারবে না।'

'জিপসিরা আমাদের জন্য এসব করছে কেন?'

'কারণ ওরা আমাদেরকে ভয় পায়। আমাদের অসীম শক্তির কথা ওরা জানে, জানে আমরা চাইলেই ওদের এবং ওদের সন্তানদের কী দশা করতে পারি। ওরা আমাদেরকে সাহায্য করবে, ওদের কাছ থেকে আমরা প্রটেকশন পাব। কারণ একটাই–জিপসিরা ওয়্যারউলফকে যমের মত ডরায়।'

'আমার এসব নিয়ে কথা বলতে ভাল্লাগছে না,' বলল রায়হান।

ঝিলিক দিল মার্সিয়ার চোখ, বিদ্রূপের চাউনি তাতে। 'আচ্ছা, তাই নাকি? আমাকে আবার বলে বোসো না যেন রাতের বেলা তোমার শারীরিক পরিবর্তনটাকে সহ্য করতে পারছ না। বলো না যেন কাঁচা মাংস এবং তাজা নরম রক্তের স্বাদ তোমার অপছন্দ।'

জবাব দিল না মর্তুজা। মহিলার কথা ওর মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি করে, প্রায় যৌন উত্তেজনার মত।

'অবশ্যই তুমি ব্যাপারগুলো উপভোগ কর,' বলে চলল মার্সিয়া। 'চাঁদের আলোয় ওয়্যারউলফের শক্তিতে তুমি উদ্ভাসিত হও। তুমি হয়ে ওঠো অদম্য, অজেয়। জীবিত কোনও প্রাণী তোমার ক্ষতি করতে পারে না, কেউ তোমাকে হত্যা করতে পারবে না...কেউ না। শুধু আগুন এড়িয়ে চলবে...' আবছা আলোয় মার্সিয়ার ঝকঝকে সাদা দাঁত চিকচিক করছে, '...আর সিলভার।'

ট্রেলারের ভেতরে ছায়া আরও গাঢ় হলো, ঘনাল আঁধার। কুশনে শোয়া নিরাভরণ, ফর্সা নারী শরীরটি আবছা দেখতে পাচ্ছে রায়হান। বাইরের পৃথিবীতে নেমে এসেছে রাত। জানালার সবুজ পর্দায় ম্লান একটা আলোর আভা ঘোষণা করল, আকাশে চাঁদ উঠেছে। চঞ্চল হয়ে উঠল রায়হান, শরীরের গিঠগুলোতে কেমন

অস্বস্তিকর একটা অনুভূতি। চোখ চলে গেল পর্দা ফেলা জানালায়।

বিছানায় শোয়া মার্সিয়ার দেহ হঠাৎ একটি ঝাঁকি খেল। মুখ বিকৃত হয়ে গেল ব্যথায়।

'এখন চলে যাও,' বলল ও।

'মার্সিয়া, আমি–'

'চলে যাও বলছি!' যন্ত্রণা এবং রাগে জ্বলে উঠল সবুজ চোখ জোড়া।

টলমল পায়ে সিধে হলো রায়হান। টলতে টলতে কদম বাড়াল ট্রেলারের পেছন দিকে। ধাক্কা মেরে খুলে ফেলল দরজা। নেমে এল মাটিতে, শীতল রাতের মাঝে। দরজা বন্ধ করতেই শুনতে পেল ভেতর থেকে সশব্দে লাগিয়ে দেয়া হলো হুড়কো।

জঙ্গলের পরে, ফাঁকা জায়গাটার দিকে এগুল রায়হান মর্তুজা। ওখানে, গাছের ওপরে দেখা যাচ্ছে চাঁদ। ওর তীক্ষ্ণ অনুভূতি শক্তির কাছে রাতের কোনও গোপনীয়তাই গোপন থাকে না। ঝোপের মধ্যে ক্ষুদ্র প্রাণীর ছুটে চলার শব্দও ওর কান এড়িয়ে যেতে পারে না। ওদের ছায়াও দেখতে পায় রায়হান। গাছপালা, ঘাস এবং রাতের ফুলের গন্ধ ধাক্কা মারে নাকে।

রায়হান এ ব্যাপারে পূর্ণ সচেতন, যে কোনও রাতেই সে মানুষ থেকে নেকড়ে হয়ে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে। ইচ্ছে হলো নেকড়ে হলো, আবার কখনও নিজেকে নিয়ন্ত্রণও করে ও। তবে এরকম পূর্ণ যৌবনা পূর্ণিমা রাতে নেকড়েতে রূপান্তরিত হওয়ার তীব্র বাসনা দমন করা খুব কঠিন।

রায়হান শার্টের কলার তুলে দিল। রাতের ঠাণ্ডা বাতাস শীতল পরশ ছোঁয়াল গলায়। ফাঁকা জায়গার পরে জঙ্গল। সেদিকে হাঁটছে রায়হান। টান মেরে ছিঁড়ে ফেলল শার্ট, বোতামগুলো কোথায় উড়ে গেল হদিশও থাকল না। ত্বকের নীচে লাফালাফি শুরু করে দিয়েছে পেশী, প্রতিটি গিঁঠে ব্যথা করছে। ব্যথাটা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে গোটা শরীরে। ছেঁড়া শার্টটা ঘাসের ওপর ছুঁড়ে

ফেলে দিল রায়হান। ও ছোট ছোট শ্বাস ফেলছে, নাক দিয়ে বেরিয়ে আসছে গরম বাতাস। এবারে দৌড়াতে শুরু করল রায়হান মর্তুজা।

পাঁচ

পূর্ণিমার চাঁদের ওপরের অংশটা ঝুলে আছে মাউন্টলেক টেরেসে, সুহিতা সুলতানা'র বাড়ির পুব দিকের পাহাড়ে, ডগলাস ফার গাছের ওপরে। ফ্রেঞ্চ উইণ্ডোর সামনে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা দেখছিল সুহিতা, মন চলে গেছে সুদূরে।

'আজ ডাক্তার কী বললেন?'

চমকে উঠে ঘুরে তাকাল সুহিতা। ওর পেছনে দাঁড়িয়ে আছে ব্রায়ান অ্যাডামস।

'তুমি কখন এলে?'

ব্রায়ানের শক্তপোক্ত মুখের দাড়িগোঁফ পরিষ্কার করে কামানো, ধূসর চুলগুলো ছোট করে ছাঁটা, আঁচড়ানো, তার শরীর-স্বাস্থ্য ভালোই, যদিও উদর সামান্য স্ফীত। বয়স আটচল্লিশ হলেও দেখায় অনেক কম।

'ওখানে দাঁড়িয়ে কিছু দেখছিলে?' জানালার দিকে ইঙ্গিত করল ব্রায়ান।

'না। দিবাস্বপ্ন দেখছিলাম।' মুখে চেষ্টাকৃত হাসি ফোটাল সুহিতা।

'সন্ধ্যার পরে তুমি দিবাস্বপ্ন দেখতে পার?'

ব্রায়ান মৃদু হাসল তবে চোখ স্পর্শ করল না হাসি।

কাঁধ ঝাঁকাল সুহিতা। 'ড. গারফিল্ড আবার আগামী হপ্তায় যেতে বলেছেন। কোনও নির্দেশ কিংবা পরামর্শ দেননি। শুধু বললেন, 'আবার আগামী হপ্তায় এসো।'

'বেশ, তোমাকে সজীব লাগছে। ডাক্তারের ট্রিটমেণ্ট কাজে লাগছে মনে হচ্ছে।'

সুহিতা তার স্বামীর দিকে তাকিয়ে হাসল। ব্রায়ানের ধারণা, সুহিতার ভয়গুলো ডিল্যুশন ছাড়া কিছু নয়। তবে এ কথা অন্য কেউ বলতে গেলে সে তীব্র আপত্তি জানাবে। ব্রায়ান তো বটেই, নিজের জন্যেও ড্রাগোর বিভীষিকাময় স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেলতে হবে সুহিতাকে, ওর স্বামী যদি চায়, ডা. গারফিল্ড কিংবা অন্য যে কোনও ডাক্তারকে দেখাতে রাজি সুহিতা। যদি কিনা এতে খানিকটা উন্নতির আশা থাকে।

পাশের ঘরে হুড়মুড় শব্দে দু'জনেই ঘুরে তাকাল। ছয় বছরের হ্যারি ঢুকল ঝড়ের বেগে, ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল ওদের সামনে।

'আমি কি টিভি দেখতে পারি?' সুহিতা এবং ব্রায়ানের দিকে প্রত্যাশা নিয়ে তাকাল হ্যারি। 'ক্লিণ্ট ইস্টউডের সিনেমা দেখাচ্ছে।' যোগ করল সে। যেন হিরোর নাম শুনলে ছবিটি দেখার অনুমতি দেবে ওরা।

'মিসেস ডেভিডসন কী বলেছেন?' প্রশ্ন করল সুহিতা। হ্যারি টেনিস জুতো পরা পায়ের দিকে নামিয়ে আনল দৃষ্টি। 'উনি মানা করেছেন।'

'তা হলে দেখার দরকার নেই,' বলল সুহিতা। 'এখন ঘুমাবার সময়। তা ছাড়া তুমি ক্লিণ্ট ইস্টউডের ছবি আগেও দেখেছ।'

'ডার্টি হ্যারি দেখেছি,' ধৈর্য নিয়ে বলল হ্যারি। 'আজ দেখাচ্ছে ম্যাগনাম ফোর্স।'

'ঘুমাতে যাও,' দৃঢ় গলায় বলল সুহিতা।

'আচ্ছা, ঠিক আছে,' বলল হ্যারি। তারপর পরাজয়ের গ্লানি

ভুলে গিয়ে সে প্রথমে তার বাবাকে চুমু খেল তারপর সৎমাকে শুভরাত্রি জানাল।

'তুমি আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দেবে?' সুহিতার ঘাড় শক্ত করে জড়িয়ে ধরল হ্যারি।

'মিসেস ডেভিডসন হাজির হলো দোরগোড়ায়। লম্বা-চওড়া মহিলা, এক সময়ের সোনালি চুল এখন পেকে প্রায় সাদা। সুহিতা এবং ব্রায়ানকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'ও নিশ্চয় সিনেমা দেখার আবদার করতে এসেছে আপনাদের কাছে।'

'ক্লিন্ট ইস্টউডের সিনেমা দেখতে চাইছে,' বলল সুহিতা।

জিভ টাকরায় বাধিয়ে তোলা ভঙ্গিতে চুকচুক শব্দ করল মিসেস ডেভিডসন। 'ও মারামারির ছবি দেখার নামে সব সময় পাগল। এসব কোনও ছবি হলো? আপনারা পিটিয়েও ওকে ওয়াল্ট ডিজনির ছবির সামনে বসাতে পারবেন না।'

'ওগুলো বিশ্রী আর ভোঁতা,' বলল হ্যারি। 'একটুও ফাইটিং নেই।'

'যথেষ্ট হয়েছে, হ্যারি,' বলল ব্রায়ান। 'মিসেস ডেভিডসনের সঙ্গে শুতে যাও।'

পাঁই করে ঘুরল হ্যারি, ঝড়ের গতিতে পাশ কাটাল হাউজকীপারকে, বেরিয়ে গেল। ওরা শুনতে পেল সিঁড়িতে দুপদাপ পা ফেলে নিজের শোবার ঘরে যাচ্ছে হ্যারি। দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল মিসেস ডেভিডসন, কোটরের মধ্যে চোখ ঘোরাল দীর্ঘ যন্ত্রণা সয়ে চলার অভিব্যক্তি ফোটানোর ভঙ্গিতে। যদিও তার ভঙ্গি দেখে বোঝা যায় ছেলেটিকে সে খুবই ভালবাসে। সে-ও বেরিয়ে গেল হ্যারির পেছন পেছন।

শরীরের দু'পাশে হাত ছড়িয়ে দিয়ে হাই তুলল ব্রায়ান। 'আজ একটু তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ব ভাবছি। তুমি?'

শরীর কেমন আড়ষ্ট হয়ে এল সুহিতার। সেক্সের কথা ভাবলেই এরকম হয় ওর। বছর জুড়ে থেরাপি ওর অনেক উপকার

করেছে বটে তবে এখনও কিছু সমস্যা রয়ে গেছে। রায়হানের সঙ্গে কাটানো শেষের দিনগুলোর কথা ও কিছুতেই বিস্মৃত হতে পারে না। ওই দিনগুলোতে কী ভয়ানকভাবে বদলে যাচ্ছিল রায়হান। প্রথমে ও তো বুঝতেই পারেনি কী হচ্ছে রায়হানের। কিন্তু ওর স্পর্শে গা ঘিনঘিন করে উঠত সুহিতার। সাগর চৌধুরীর সঙ্গে ও একই হোটেলে দিনের পর দিন থাকলেও ওকে ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মতই দেখেছে সুহিতা। সেক্সের চিন্তা কখনও মনে আসেনি।

তবে ব্রায়ান অ্যাডামস প্রেমিক হিসেবে মন্দ নয়। ওর সঙ্গে মিলনে বেশিরভাগ সময় তৃপ্তি পেয়েছে সুহিতা। কিন্তু সেই ভয়টা তো আজও দূর করতে পারল না। ড্রাগোর স্মৃতি কুৎসিতভাবে গেঁথে রয়েছে মনে। বিষয়টি নিয়ে সে ব্রায়ান এবং ড. গারফিল্ডের সঙ্গে কথাও বলেছে। ওরা দু'জনেই ওর প্রতি সহানুভূতিশীল তবে কেউই সুহিতার গল্পটা বিশ্বাস করেনি।

স্বামীর হাত ধরে চাপ দিল সুহিতা। 'আমার একটুও ঘুম আসছে না। আমি কিছুক্ষণ বই পড়ব। দেখি যদি আমার ওপর নিদ্রাদেবীর দয়া হয়।'

'ঘুমের বড়ি খাবে?'

ব্রায়ান জানালার দিকে তাকাল। এমনিতে সে সুহিতাকে ঘুমের বড়ি খেতে দেয় না। তবে জানে পূর্ণিমার রাত অস্থির করে তোলে তার স্ত্রীকে।

'না, দরকার নেই,' জবাব দিল সুহিতা। 'আমি বহুদিন ধরে ঘুমের বড়ি খাই না। ওগুলো থেকে যত দূরে থাকতে পারব ততই মঙ্গল।'

'তা হলে চলো একটু ব্যাক গেমন খেলি? প্রতিবারই তো তোমার কাছে হেরে যাই। আজ দেখি হারার শোধ নিতে পারি কি না?'

স্বামীর দিকে তাকিয়ে হাসল সুহিতা। বুঝতে পারছে ওকে একা নীচে রেখে যেতে ভরসা পাচ্ছে না ব্রায়ান। এ ব্যাপারটি

বেশ উপভোগ করে সুহিতা। কিন্তু ও যে ডরপুক না তা প্রমাণ করার এখনই সময়।

'তুমি ঘুমাতে যাও, ডার্লিং,' বলল সুহিতা। 'তোমাকে তো আবার খুব ভোরে উঠতে হবে। আমি একটু পরেই আসছি।' মিসেস ডেভিডসন আবার হাজির হলো দোড়গোড়ায়। 'হ্যারি আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছে।'

সুহিতা এবং ব্রায়ান এক সঙ্গে হ্যারির ঘরে গেল। ওর কামরাটা সিঁড়ির মাথায়। গোটা ঘরের দেয়াল জুড়ে শুধু স্পাইডারমানের ছবি। হ্যারি নিজেই লাগিয়েছে।

সুহিতা বাচ্চাটির দিকে তাকিয়ে হাসল। সৎমা হিসেবে কীভাবে কতটুকু ভূমিকা পালন করতে পারবে ভেবে শুরুতে বেশ দুশ্চিন্তায় ছিল ও। রায়হানকে বিয়ে করার আগে সন্তান নেয়ার ব্যাপারে প্রায়ই কথা হতো দু'জনে। বাবা-মা হলে আগে কী কী করবে সেরকম একটা তালিকাও করেছিল ওরা।

ব্রায়ান অপ্রত্যাশিতভাবেই বিয়াল্লিশ বছর বয়সে বাবা হয়েছে। সে তার সন্তানকে যথেষ্ট ভালবাসে তবে অতিরিক্ত আহ্লাদও দেখায় না। তার ধারণা বেশি বেশি আদরে মাথায় চড়ে বসবে হ্যারি। হ্যারির মা ছেলেকে তিন বছরের রেখে মারা যায় ক্যান্সারে। বাবা এবং মা দু'জনের ভূমিকা একসঙ্গে পালন করতে গিয়ে নাভিশ্বাস উঠে গিয়েছিল ব্রায়ানের। তারপর মিসেস ডেভিডসনকে ছেলের গভর্নেস হিসেবে নিয়োগ দেয় সে। স্ত্রীর মৃত্যুর পরে একমাত্র সুহিতার সঙ্গেই গভীরভাবে জড়িয়ে পড়ে ব্রায়ান। হ্যারিকে সুহিতা খুব সহজে মায়ের আদরে ভরিয়ে দিতে পারছে দেখে খুব খুশি ব্রায়ান। হ্যারিও তার মায়ের ন্যাওটা হয়ে গেছে।

বাবা-মাকে দেখে বিছানায় উঠে বসল হ্যারি। প্রথমে বাপকে আলিঙ্গন করল সে, তারপর সুহিতাকে। আবার শুয়ে পড়ল হ্যারি। সুহিতা ওর গায়ে কম্বল টেনে দিল।

‘গুডনাইট, আম্মি,’ বলল হ্যারি। ‘গুড নাইট, ড্যাড।’

বিয়ের আগেই সুহিতা এবং ব্রায়ান আলোচনা করেছে হ্যারি সুহিতাকে কী বলে সম্বোধন করবে। সমস্যার সমাধান করে দিয়েছে হ্যারি নিজেই। বলেছে কৃষ্ণকেশী, বাঙালি মেয়েটি যদি তার ড্যাডকে বিয়ে করে তা হলে সে তার নতুন মাকে ‘আম্মি’ বলে ডাকবে। সুহিতাই তাকে বলেছিল, ‘মম’কে বাঙালি অনেক ছেলেমেয়ে আদর করে ‘আম্মি’ ডাকে।

হ্যারির দরজা ইঞ্চি কয়েক ফাঁক রেখে (হ্যারিই বলেছে তার দরজা যেন সবসময় খানিকটা খোলা থাকে) সুহিতা এবং ব্রায়ান হলঘরে চলে এল। সুহিতা স্বামীকে বলল, ‘ঘুমাতে যাও। আমি একটু পরেই আসছি।’

নীচে নেমে এল সুহিতা, ঢুকল লিভিং-রুমে। কফি টেবিলে এক গাদা পত্রিকা ছড়ানো-ছিটানো। সুহিতা চলতি মাসের ‘রেডবুক’ নিয়ে চলে এল ফ্যামিলি রুমে। বাড়ির পেছনে, হাউসকীপারের ঘরে টিভি চলার আবছা শব্দ। টিভি দেখছে মিসেস ডেভিডসন। বন্দুকের গুলির আওয়াজে হাসল সুহিতা। মিসেস ডেভিডসন ‘ম্যাগনাম ফোর্স’ দেখছে।

মিনিট পনেরো পত্রিকায় মনোনিবেশের ব্যর্থ চেষ্টা করল সুহিতা। ওর আসলে দিনের বেলা শারীরিক পরিশ্রমের কোনও কাজ করা উচিত, ভাবল সুহিতা। শারীরিক পরিশ্রম করলে ক্লান্তি আসবে শরীরে, রাতে তাড়াতাড়ি ঘুম হবে। অবশ্য বাড়িতে ওর কাজ নেই বললেই চলে। মিসেস ডেভিডসন সব দিক দক্ষতার সঙ্গে একাই সামলায়। এজন্য মহিলার প্রতি কৃতজ্ঞ সুহিতা। তবে মনে মনে আশা করে প্রৌঢ়া হয়তো একদিন অসুস্থ হয়ে পড়ল কিংবা কোথাও বেড়াতে গেল, তখন ঘরের কাজ করার মওকা মিলবে সুহিতার। কিন্তু স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান মহিলাটির স্বাস্থ্য খুব ভাল, তাকে কখনও অসুস্থ হতে দেখেনি সুহিতা। আর নিঃসন্তান মিসেস ডেভিডসনের ঘনিষ্ঠ কোনও আত্মীয়-স্বজন নেই যাদের বাড়িতে

সে ছুটি নিয়ে বেড়াতে যাবে।

সুহিতার জন্ম বাংলাদেশে। শৈশবের পুরোটাই কেটেছে সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বাংলাদেশে। কৈশোরকালে তার বাবা, মাল্টি ন্যাশনাল একটি কোম্পানিতে চাকরি নিয়ে চলে আসেন আমেরিকায়। তারপর থেকে ওরা এ দেশেই আছে। রায়হান মর্তুজা তার বাবার বন্ধুর ছেলে। সাগর চৌধুরী সুহিতার ইউনিভার্সিটির ঘনিষ্ঠ বন্ধু। প্রথমজন ওয়্যারউলফ হয়ে মারা গেছে, সুহিতা অন্তত তাই জানে। আর দ্বিতীয়জনের সঙ্গে ওর দীর্ঘদিন কোনও যোগাযোগ নেই।

এখানে মাঝে মাঝে নিজেকে বড্ড একা লাগে সুহিতার। একাকীত্ব কাটাতে সে স্থানীয় ইণ্ডিয়ান স্কুলে পড়ায়। তবে কাজে ফিরতে চায় সুহিতা। বিভিন্ন কনভেনশনের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে ওর। সিয়াটলে বড় বড় হোটেলের অভাব নেই। এসব হোটেলের কোনও একটিতে কনভেনশনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত চাকরি খুঁজে পেতে খুব একটা বেগ পেতে হবে না সুহিতার। আর ও এখন চাকরি করার জন্য মানসিক এবং শারীরিক দু'দিক থেকেই ফিট। সুহিতা চাকরি করবে শুনলে ব্রায়ান উৎসাহ না-ও দিতে পারে। তবে সুহিতা গোঁ ধরলে বাধাও দেবে না।

পত্রিকাটি টেবিলে রেখে সিধে হলো সুহিতা। এখনও ঘুম আসছে না। বিছানায় গিয়ে এপাশ-ওপাশ করার মানে হয় না। বিরক্ত হবে ব্রায়ান। কিচেনে গেল ও। প্লাস্টিকের স্প্রে বোতল আর লম্বা নাকের পানির ক্যান বের করল। গাছে পানি দিতে সে এ জিনিস দুটো ব্যবহার করে। সুহিতা মিসেস ডেভিডসনকে বুঝিয়েছে সে একাই গাছে পানি দিতে পারবে, সাহায্যের দরকার হবে না। গাছের যত্ন নিতে খুব পছন্দ করে সুহিতা। ছোট ছোট কতগুলো জিনিস, প্রাণের স্পন্দনে স্পন্দিত। এগুলো ওর একান্ত নিজের ভাবতে ভাল লাগে সুহিতার। এদের টিকে থাকাও নির্ভর করছে ওর ওপর। ড্রাগো গ্রামে ওর প্রিয় কুকুরটা ওয়্যারউলফের

হাতে নৃশংসভাবে খুন হয়ে যাবার পরে আর কুকুর পোষেনি সুহিতা। কুকুরের বিকল্প হিসেবে গাছের পরিচর্যা করছে।

বাড়ির পাশে, একটি কামরায় পটে গাছগুলো জন্মায় সুহিতা। এ ঘরে আলো-বাতাসের অভাব নেই। সুহিতা ঘরটির নাম দিয়েছে 'সূর্যঘর'। তবে এ নামটির কথা ব্রায়ানকে বলেনি সে।

সুহিতা প্রথমে গেল স্পাইডার প্ল্যান্ট ক্লোরোফিটামের কাছে। গাছটির পাতা ঘন সবুজ, গায়ে সাদা স্ট্রাইপ, ধনুকের মত বাঁকা কাণ্ড পটের ওপর এমনভাবে ঝুলে আছে যেন একটা ঝর্ণা। সুহিতা আঙুল বুলাল মাটিতে। ভেজা।

আজ আর তোমাকে পানি খাওয়াচ্ছি না, মনে মনে বলল ও। শুধু একটু স্প্রে করব। প্লাস্টিক বোতলের প্লাঞ্জার ঠেলে দিল সামনে। পানির মিহি একটা ধারা ভিজিয়ে দিল পাতা। পানি দেয়ার সময় গাছের সঙ্গে কথা বলে সুহিতা। জানে ছেলেমানুষী। তবে এ ছেলেমানুষী করতে ভালই লাগে ওর।

এরপর বোস্টন ফার্নের দিকে পা বাড়াল সুহিতা। চমৎকার পাতাগুলোকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে দেখল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাতেই দেখতে পেল নড়ে উঠল ছোট একটি মাকড়সা। গাছে জাল বুনছিল। চিমটা দিয়ে ধরে ওটাকে ফেলে দিতে যাচ্ছিল সুহিতা, শূন্যে থেমে গেল হাত। ওরও তো বেঁচে থাকার অধিকার আছে, ভাবছে ও। নামিয়ে নিল হাত। যন্ত্রটা ঢোকাল পকেটে।

সুহিতা সবার শেষে ফিলোডেনড্রনের পরিচর্যা করে। কারণ এ গাছটি ওর সবচেয়ে প্রিয়। পুরুষ গাছ। মজবুত, চকচকে শরীর, শ্যাওলা ধরা খুঁটি বেয়ে উঠে যাচ্ছে অ্যাথলেটের মত। তোমার জন্য শীঘ্রি বড় একটি পটের ব্যবস্থা করব, বন্ধু, মনে মনে বলল সুহিতা। স্বাস্থ্যবান পত্রপল্লবে হালকা স্প্রে করল, গাছের শিকড়ে পানি দিল।

কাজ শেষ করে নিজের ছোট্ট বাগানের দিকে তাকিয়ে হাসল সুহিতা। স্প্রে বোতল এবং পানির ক্যান নিয়ে ফিরে এল

কিচেনে। গোটা বাড়িতে একবার চক্কর দিল। দরজা-জানালা ঠিকঠাক বন্ধ আছে কিনা চেক করল। যদিও মিসেস ডেভিডসন প্রতি রাতে ঘুমাতে যাবার আগে এ কাজটা নিষ্ঠার সঙ্গেই করে। তবে সুহিতা নিজে চেক করে দেখে মানসিক শান্তির জন্যে। সবশেষে ও ফ্রেঞ্চ উইণ্ডোর পর্দা নামিয়ে দিল, শীতল, চাঁদনী রাত বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল ওর সামনে থেকে।

ছয়

চাঁদের আলো গায়ে মেখে জঙ্গলের দিকে লম্বা লম্বা পায়ে ছুটে চলেছে রায়হান মর্তুজা। জঙ্গলের কিনারে এসে মনে হলো যেন বাড়ি ফিরে এসেছে। মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল ও। নখ বসে গেল নরম মাটিতে। উপুড় হয়ে টানটান শরীর নিয়ে শুয়ে পড়ল। শ্যাওলা এবং ঘাসে চেপে ধরল মুখ। মিষ্টি একটা গন্ধ আসছে শ্যাওলা আর ঘাসের কার্পেট থেকে। বুক ভরে দম নিল রায়হান। চিৎ হলো। ওর ওপরে, ডালপালার ফাঁকে ভরা পূর্ণিমার চাঁদকে দেখছে রায়হান। অনেক উঁচুতে শীতল চাঁদ। শিরায় রক্তের বান গর্জন তুলে আছড়ে পড়ছে রায়হানের কানে।

কপালে তীক্ষ্ণ একটা ব্যথা অনুভব করল ও, যন্ত্রণায় কাতরে উঠল। যেন তারে বাঁধা শরীর ওর, এক টানে ওকে পাশ ফেরাল। কুঁকড়ে গিয়ে মাতৃগর্ভের ভ্রূণের মত গোল হয়ে গেল দেহ। চেহারায় শুরু হয়ে গেল প্রবল ভাংচুর। ওর মুখটা যেন কাদা দিয়ে তৈরি। ইচ্ছে মত ঠেসে, চেপে বিকৃত করে ফেলা হচ্ছে চেহারা। শেষে মুখটার সমস্ত সৌন্দর্য হারাল রায়হান, নিজের চেহারার

সঙ্গে একটুও মিল রইল না। ওর নাক এবং চোয়াল ঠেলে বেরিয়ে এল সামনে। মাজলের আকৃতি পেল। লম্বা হয়ে উঠল কানজোড়া, এবং সুচাল। একের পর এক খিঁচুনি চলছে শরীরে। কাঁপুনি বন্ধ হওয়ার পরে আবার টানটান হয়ে গেল শরীর। চামড়ার নীচে কিলবিল করে উঠল নতুন, শক্তিশালী পেশী। নগ্ন মাংসে গজিয়ে গেছে ঘন লোম, সোনালি চামড়া চকচক করছে চাঁদের আলোয়, ঢেকে ফেলেছে রায়হানের গা।

কয়েক মিনিটের মধ্যে রূপান্তরের সমাপ্তি ঘটল। কিছুক্ষণ আগেও যে ছিল মানুষ, সে এখন চার হাত পায়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। সিধে হওয়ার সময় একটু টলে গেল, তারপর ঋজু করল শরীর যেন আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে সংগ্রহ করেছে শক্তি। মজবুত চার পায়ে মাটিতে ভর করে জানোয়ারটা নাক উঁচু করে তাকাল রাতের আকাশে।

মুখ হাঁ করল নেকড়ে, গলার গভীর থেকে বেরিয়ে এল ভয়ঙ্কর ডাক—আউউউ! সেই ভীষণ ডাক শুনে কাছের ট্রেলারের জিপসিদের বুকের রক্ত জল হয়ে গেল। শরীরে নতুন শক্তি পেয়ে উল্লসিত নেকড়ে। জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ল সে। ছুটতে লাগল। প্রতি পদক্ষেপে বাড়ছে গতি। অবশেষে পূর্ণ গতি ফিরে পেল সে—প্রচণ্ড জোরে ছুটছে। এত জোরে কোনও মানুষ ছুটতে পারে না, এত তীব্র গতি কোন সাধারণ নেকড়ের নেই। কোন কিছু পরোয়া না করে ছুটছে নেকড়ে। ঘন লোমের কারণে কাঁটা কিংবা গাছের ভাঙা ডালের খোঁচাতেও তার ক্ষতি হচ্ছে না। এ এখন রায়হান মর্তুজা নয়, এক মায়া নেকড়ে। এর কোন বিবেক বা বিচারবুদ্ধি নেই, শুধু আছে ওয়্যারউলফের তীব্র খিদে।

অমানুষিক নেকড়ের ডাক পৌঁছে গেল মার্সিয়া লুবার ট্রেলারে। ট্রেলারের মেঝেতে যে জিনিসটি বসেছিল, ডাক শুনে সে এগিয়ে গেল দরজায়। শীতল ধাতবে ঠেসে ধরল মুখ। তার খোলা মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল একটি শব্দ—নারীর গোঙানি আর নেকড়ের

গর্জনের মিশ্রিত অদ্ভুত এক আওয়াজ!

অরণ্যের ভেতর দিয়ে খরগোশের মত লাফিয়ে ছুটছে প্রকাণ্ডদেহী ধূসর নেকড়েটি। জানোয়ারের মস্তিষ্কে আবছা মনে পড়ছে তার সঙ্গে একসময় কোনও কোনও রাতে পাশাপাশি দৌড়ে বেড়াত কালো রঙের একটি মাদী নেকড়ে। মাদী নেকড়ের চাউনি, ক্ষিপ্র চলাফেরা, গা থেকে ভেসে আসা রমণীয় তীব্র গন্ধ প্রচণ্ড কামনায় আকুল করে তুলত ধূসর নেকড়েকে। তিন বছর আগে, ড্রাগো নামের একটি গাঁয়ে, ভয়ঙ্কর এক রাতে সে মাদী নেকড়েটিকে হারিয়েছে চিরদিনের জন্যে।

সে রাতে, দাউ দাউ আগুন গ্রাস করেছিল গোটা গ্রাম, অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা পড়েছিল বাকি সবাই, বিশালদেহী ধূসর নেকড়েটি আগুনের বেড়া টপকে ছুটে গিয়েছিল মাদী নেকড়ের কাছে। মাটিতে শুয়ে থাকা মাদী নেকড়েটিকে সে টানতে টানতে নিয়ে গিয়েছিল আগুনের কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্বে। এক চুলের জন্য সিলভার বুলেটের মরণ আঘাত থেকে বেঁচে গিয়েছিল কালো নেকড়েটি ওরফে মার্সিয়া লুরা। দীর্ঘ যন্ত্রণাকাতর কয়েকটি মাস রায়হান মর্তুজা অক্লান্ত সেবা করে প্রায় মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনে মার্সিয়াকে। যখন মানুষের চেহারায় থাকে মার্সিয়া, সিলভার বুলেটের ক্ষতচিহ্ন পরিষ্কার বোঝা যায়। মধ্য রাতের কালো চুলের মাঝখানে জ্বলজ্বল করে রূপোর মত সাদা কাটা একটা দাগ। রায়হান মর্তুজা শুধু অনুমান করতে পারে মার্সিয়া বিশেষ কয়েকটি রাতে স্বেচ্ছায় ঘরবন্দী থেকে কী করে। ও কেবল জানে সেই সুন্দরী মাদী-নেকড়ে আর ফিরে আসবে না। সেই খিদেও আর মিটবে না।

তবে আরেকটি খিদে আছে ওয়্যারউলফের। যে খিদের জ্বালায় রাতের পর রাত সে ঘুরে বেড়ায় জঙ্গলে। এ খিদে খুনের নেশা। এ নেশা তাজা মাংস ছিঁড়ে খাওয়ার উদগ্র বাসনা,

শক্তিশালী চোয়ালে কড়মড় শব্দে হাড় চিবানোর তীব্র ইচ্ছে, মিষ্টি-নোনা স্বাদের উষ্ণ রক্তের স্বাদ গ্রহণের প্রবল আকাঙ্ক্ষা।

জঙ্গলের দূর প্রান্তে চলে এল ওয়্যারউলফ, মন্থর হলো গতি, সতর্কতার সঙ্গে চলতে লাগল বনের শেষ প্রান্তের গাছগুলোর সারির ফাঁকে। গত তিন বছরে ওয়্যারউলফ হিসেবে অনেক কিছুই শিখেছে রায়হান মর্তুজা। শিখেছে কীভাবে নিঃশব্দে চলাফেরা করতে হয়, সাড়া শব্দ প্রায় না করে কীভাবে হত্যা করতে হয় সে শিক্ষাও পেয়েছে।

রাতের বাতাসে একটা পরিবর্তন ধরা পড়ল নেকড়ের তীক্ষ্ণ নাসারন্ধ্রে। জ্যান্ত শিকার! হামাগুড়ি দিয়ে চলতে লাগল সে, ছায়ায় আড়াল নিয়ে ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগোচ্ছে ঘাসে ছাওয়া একটা মাটির ঢিবির দিকে। নেকড়ের বড়বড় হলুদ চোখ জোড়া শিকারের সন্ধানে জ্বলছে।

তৃণভূমির বুক চিরে চলে যাওয়া সরু একটা আল বেয়ে হেঁটে আসছে বছর দশেকের একটি ছেলে। মাইলখানেক দূরে, আলোকিত একটি খামার বাড়ির দিকে চলেছে সে। ওখানে হাইওয়ে দু'ভাগ করে রেখেছে মাঠ।

রাস্তা ধরে হেঁটে আসছে ছেলেটি, ওয়্যারউলফের কালো ঠোঁটজোড়া কুঁচকে গেল। ছেলেটির হাতে লম্বা একটি লাঠি। লাঠি দিয়ে অলস ভঙ্গিতে ঝোপঝাড়ে বাড়ি মারছে। ছেলেটির মাথায় খাটো, লাল চুল, মুখে বুটি ভরা। পরনে ফ্যাকাসে জিনস এবং হালকা জ্যাকেট। উজ্জ্বল চাঁদের আলোয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে ছেলেটিকে।

নেকড়ের পিঠের পেশীগুলো শক্ত হয়ে উঠল, হামলার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। কয়েক সেকেণ্ডের মামলা মাত্র। ছেলেটি চিৎকার দেয়ার আগেই নেকড়ে এক ঝটকায় ওর গলাটা মটকে দেবে।

একদম শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল নেকড়ে। বাতাসে নতুন একটা গন্ধ তাকে নিশ্চল করে দিয়েছে। ছেলেটির দিকে

স্থির দৃষ্টি তার, খামার বাড়ির দিক থেকে ছুটতে ছুটতে এল ঝাঁকড়া লোমের সাদা একটি কুকুর। ঝোপের মত লেজটা আনন্দে নাড়ছে।

নেকড়ে আবার হামাগুড়ির ভঙ্গিতে নুইয়ে ফেলল শরীর, তার পেট ঘষা খেল মাটিতে। বাতাস যদিও তার অনুকূলে বইছে, দেখল কুকুরটার চেহারা থেকে স্ফূর্তির ভাব উধাও, আড়ষ্ট হয়ে গেছে সে, বাতাসে নাক উঁচু করে গন্ধ শুঁকছে। বিপদ টের পাওয়া মাত্র কুকুরটার ঘাড়ের লোমগুলো সরসর করে দাঁড়িয়ে গেল। অন্ধকারের উদ্দেশ্যে ঘেউ করে উঠল সে।

এটা অবশ্যই কোনও প্রতিযোগিতা হতে পারে না। একটা ওয়্যারউলফের বিরুদ্ধে একটি কুকুর দু'মিনিটও টিকতে পারবে না। তবু ছেলেটাকে বাগে পেতে তার দেরি হয়ে যাবে। চিৎকার-চেঁচামেচি শুনলে খামার বাড়ির লোকজন জেগে যেতে পারে। ছেলেটা পালিয়ে গিয়ে নিজের লোকজনকে সাবধান করে দিতে পারে সে ধূসর, প্রকাণ্ড একটি নেকড়ে দেখেছে।

হেঁটে চলল ছেলেটি। ছোটাছুটি করতে মানা করছে কুকুরটাকে। ওয়্যারউলফ টিবির ওপর থেকে দৃশ্যটি দেখছে। চাঁদের আলো পড়ে চকচক করছে তার হিংস্র দাঁতের সারি। শেষবারের মত রাতের উদ্দেশ্যে হতাশ একটা ডাক ছেড়ে ছেলেটির পিছু নিল কুকুর।

ছেলেটি এবং কুকুর মোড় ঘুরে চোখের আড়ালে চলে যেতেই পেশীতে ধীরে ধীরে ঢিল পড়ল নেকড়ের। ধীরে বৃত্তাকারে ঘুরল সে, নাক উঁচু করে গন্ধ নিল বাতাসের। যা চেয়েছিল পেয়ে গেল সে। তৃণভূমি ধরে ছুটতে লাগল, খামারবাড়ির আলো থেকে ক্রমে দূরে সরে যাচ্ছে।

সিকি মাইলটাক দৌড়ানোর পরে ছোটার গতি কমাল ওয়্যারউলফ। আজ রাতে যাকে সে খুন করবে সে সামনেই আছে। সাদা-কালো রঙের একটি হোলস্টিন গাভী আয়েশ করে

জাবর কাটছে। গাভীর ভাঁজ করা পায়ের কাছে বিশ্রাম নিচ্ছে তার বাচ্চা।

নিরস্ত্র, অসহায় এই প্রাণীটিকে হত্যা করলে উৎকট উল্লাসটা আর অনুভব করতে পারবে না ওয়্যারউলফ, যেটা পাওয়া যেত মানুষ খুন করলে। কিন্তু গাভীটিকে তার মারতে হবে পেটের জ্বালা মিটাতে। নেকড়ে সামনে বাড়ল। মাথা তুলল গাভী, শুনতে পেল তার পেছনে শুকনো ঘাসের মড়মড় শব্দ, বিপদ টের পাবার মত তীক্ষ্ণ অনুভূতি শক্তি তার নেই।

ছেলেটাকে হত্যা করতে পারেনি, এ কারণে হতাশ এবং ক্রুদ্ধ ওয়্যারউলফ। সে বাছুরকে লক্ষ্য করে লাফ মারল। ওটা হুড়মুড় করে সিধে হতে যাচ্ছিল, নেকড়ের থাবার ধাক্কায় দড়াম করে পড়ে গেল মা'র পায়ের কাছে।

ভয়ের চোটে আর্তনাদ ছাড়ল গাভী, মাথা নামাল বাচ্চাকে রক্ষা করার বৃথা চেষ্টায়। নেকড়ে গাভীর দিকে একবার তাকিয়ে দাঁত মুখ খিঁচাল, তারপর ফিরে গেল হত্যাকাণ্ডে।

গাভী অসহায়ের মত ছোটাছুটি করছে, নেকড়ে ভয়ঙ্কর চোয়াল নামিয়ে আনল বাছুরের নরম ঘাড়ে। এক ঝটকায় শুকনো ডালের মত মটকে দিল ঘাড়। পা ছুঁড়তে থাকা বাছুর নিশ্চল হয়ে গেল।

মা করুণ চোখে তাকিয়ে আছে বাচ্চার দিকে, নেকড়ে বাছুরের নরম মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে লাগল। সেই সঙ্গে পান করছে গরম রক্ত। গাভী মৃত সন্তানের কাছে আসার চেষ্টা করলেই গর্জন ছাড়ছে ভীতিকর ভঙ্গিতে।

মাংস খাওয়া শেষ হলে বুকের পাঁজরে দাঁত বসিয়ে দিল নেকড়ে। কামড়ে ভেঙে ফেলল বুকের খাঁচা। তারপর রক্তাক্ত নাকটা বুকের গর্তে ঢুকিয়ে দিয়ে একটান মেরে ছিঁড়ে আনল উষ্ণ কলিজা।

রক্তমাখা কলিজা দাঁতে চেপে ধরে সিধে হলো ওয়্যারউলফ।

তৃণভূমি ধরে ছুটতে লাগল জঙ্গলের দিকে। গাভী মাথা নামিয়ে নাক ঘষতে লাগল ছিন্নভিন্ন সন্তানের লাশের গায়ে।

দূর দিগন্ত রেখায় ঝুলছে চাঁদ, এমন সময় জিপসি ক্যাম্পে ফিরে এল নেকড়ে। ট্রেলার এবং জঙ্গলের সামনের ফাঁকা জায়গাটার মাঝখানের অংশ পার হলো সে। মুখে ধরে রেখেছে বাছুরের কলিজা। দাঁড়িয়ে পড়ল পুরানো ট্রেলারের সামনে। ঘণ্টা কয়েক আগে এখানেই মার্সিয়া লুরার কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে রায়হান মর্তুজা। দরজার বাইরে কলিজা ফেলে দিল নেকড়ে। দাঁড়িয়ে থাকল মুহূর্ত খানেক। মাথাটা ওপর দিকে তুলে রেখেছে, টান টান কান। কিছু একটা শুনছে। তারপর ঘুরল সে। ফিরে চলল জঙ্গলের কিনারে।

কয়েক মিনিট পরে, ধূসর নেকড়ে ঝোপের আড়ালে চলে গেলে ট্রেলারের দরজার হুড়কো টেনে নামানো হলো, খুলে গেল কপাট। শব্দ কানে গেল ধূসর নেকড়ের। তবে জায়গা ছেড়ে নড়ল না সে। কিছু একটা খপ্ করে বাছুরের কলিজা টেনে নিয়ে গেল ঘরের ভেতরে। আবার বন্ধ হয়ে গেল ট্রেলারের দরজা। এরপর ট্রেলারের ভেতর থেকে কচকচ করে চিবিয়ে খাওয়ার যে শব্দ এল তা শুনে জিপসিদের শরীর বরফ হয়ে গেল।

কয়েক ঘণ্টা বাদে ঊষার প্রথম আলোক রেখা ফুটল পুবাকাশে, রায়হান মর্তুজা মাটি থেকে উঠে পড়ল, গায়ে চড়াল ছেঁড়া কাপড়; তারপর পা বাড়াল ট্রেলারে।

সাত

সে হালকা নক করল দরজায়। ভেতরে হুড়কো টেনে খোলার শব্দ হলো। তারপর খুলে গেল দরজা। হাত বাড়িয়ে দিল মার্সিয়া। মর্তুজাকে টেনে নিয়ে গেল ভেতরে। রায়হান ওর গায়ে প্রায় ঝুলে রইল। মহিলার গায়ের শক্তি ওর নিস্তেজ দেহে যেন সঞ্চারিত হলো। একটু পরে মার্সিয়াকে ছেড়ে দিয়ে এক কদম পেছাল রায়হান। তাকাল ওর দিকে। যন্ত্রণাদায়ক রূপান্তরের পরে মার্সিয়াকে এখন আগের চেয়ে অনেক সুন্দর লাগছে। ঝলমলে কেশরাজি লুটাচ্ছে কাঁধে। সবুজ চোখে আগুন। ওকে দেখতে দেখতে নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে এল রায়হান মর্তুজার।

'শুয়ে পড়ো, প্রাণপ্রিয়,' বলল মার্সিয়া। 'আমি তোমার আরামের ব্যবস্থা করছি।'

রায়হানকে বিছানায় শুইয়ে দিল মার্সিয়া। লিনেনের নতুন চাদর পাতা হয়েছে, পায়ের কাছে ভাঁজ করা লেপ। রায়হান বিছানায় শুয়ে চোখ বুজল। মার্সিয়ার নরম এবং ঠাণ্ডা হাত স্পর্শ করল তার কপাল। আধা ঘুম আধা জাগরণের মধ্যে টের পেল মার্সিয়া তার কাপড় খুলে ফেলছে। পরিষ্কার চাদরে নগ্ন হয়ে শুয়ে রইল রায়হান। মার্সিয়া তার শরীরে শীতল এবং সুগন্ধ কী একটা তরল মাখিয়ে দিচ্ছে। আড়ষ্ট পেশীগুলো আস্তে আস্তে সজীব হয়ে উঠল, শরীরে শক্তি ফিরে পেতে লাগল রায়হান। চোখ মেলল সে। মার্সিয়ার দিকে তাকিয়ে হাসল।

'পুনর্জীবন দিয়েছ তুমি আমাকে,' বলল ও।

'চা দিচ্ছি। চা খাও,' বলল মার্সিয়া। 'সতেজ লাগবে শরীর।'

ঝুঁকে রায়হানের মুখে চট করে একটা চুমু খেল মার্সিয়া। তারপর হেঁটে এগিয়ে গেল গ্যাসের উনানে। চুল্লিতে পানির কেতলিতে টগবগ করে ফুটছে পানি। ভেষজের গুঁড়ো মেশানো মস্ত একটি কাপে গরম পানি ঢালল সে। তারপর কয়েক ফোঁটা ঘন, বাদামী তরল মেশাল ওতে। মিষ্টি মসলার গন্ধে ভরে গেল ঘর।

মিষ্টি, বুনো স্বাদের এই অনুপান প্রথম পান করার অভিজ্ঞতা এখনও মনে আছে রায়হানের। ড্রাগো গাঁয়ের ছোট একটি বাড়িতে বাস করত মার্সিয়া। সেখানে বসে সে এক বিকেলে এ জিনিস পান করিয়েছিল রায়হানকে। তরল পদার্থটি পেটে যাবার পরে রায়হানের কামনা প্রবল হয়ে উঠেছিল। সেদিন সুখের চরমতম সীমায় ওকে পৌঁছে দিয়েছিল মার্সিয়া।

ওই রাতে, জঙ্গলের রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে, সবুজ চোখের একটা মাদী-নেকড়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল রায়হানের ওপর। জানোয়ারটা তার কাঁধে বসিয়ে দিয়েছিল দাঁত। রায়হান ভেবেছিল তার মৃত্যু অনিবার্য। কারণ নেকড়েটাকে বাধা দেয়ার শক্তি ছিল না তার। তবে অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি মাদী-নেকড়ে তাকে ছেড়ে দেয়। ঘোরের মধ্যে টলতে টলতে বাড়ি ফিরে আসে রায়হান। কিছুদিনের মধ্যেই সে বুঝতে পারে কী সর্বনাশ ঘটে গেছে তার জীবনে, উপলব্ধি করে ওয়্যারউলফের কামড় কী জিনিস।

ধোঁয়া ওঠা কাপটি রায়হানের হাতে ধরিয়ে দিল মার্সিয়া। জোরে নাক টানল রায়হান। প্রচণ্ড ঝাঁঝে পানি চলে এল চোখে।

'খেয়ে ফেলো,' নরম গলায় বলল মার্সিয়া।

দু'হাতে কাপ ধরে চা পান করল রায়হান। গলা-বুক জ্বালিয়ে তরল আগুনটা নেমে গেল পেটে, ছড়িয়ে পড়ল শরীরের প্রতিটি কোষে। কানের মধ্যে মৃদু গুঞ্জন।

মার্সিয়া রায়হানের নগ্ন পায়ে হাত রাখল, উরুতে চলে গেল। 'তোমার জন্যে একটা সারপ্রাইজ আছে।'

'সত্যি?' হাসছে রায়হান।

ঠোঁট জোড়া বেঁকে গেল মার্সিয়ার। 'একটু পরেই সারপ্রাইজটা পাবে। তবে তার আগে তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।'

'বলো।'

'আমরা এখান থেকে চলে যাচ্ছি।'

'জানি তো! তুমি রেডি হলেই রওনা হওয়া যায়।'

'আমি এখন রেডি। আমরা আজকেই এখান থেকে যাব।'

ভুরু কোঁচকাল রায়হান। 'এত জলদি?'

'জলদি? তিন বছর অপেক্ষা করেছি আমি। আমি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ।'

'কিন্তু প্রস্তুতির একটা ব্যাপার আছে...যাতায়াত...কোথায় থাকব...'

'প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে,' বলল মার্সিয়া। 'আজ সন্ধ্যার ফ্লাইটে সিয়াটলের উদ্দেশে উড়াল দেব আমরা। রিজার্ভেশন করা আছে। সিয়াটলে হোটেল রুমও ভাড়া করা হয়ে গেছে। হোটেল থেকে সুহিতার বাড়ি বেশি দূরে নয়।'

কনুইয়ে হেলান দিয়ে মুখ তুলল রায়হান। 'আমাকে কিছু না জানিয়েই সব ব্যবস্থা করে ফেললে?'

'বিস্তারিত বর্ণনা শুনতে নিশ্চয় তোমার ভাল্লাগত না।'

'আমাকে অন্তত বলতে পারতে।'

মার্সিয়া রায়হানের ঠোঁটে তুলে ধরল কাপ। চায়ে চুমুক দিল রায়হান।

'আমরা যে কাজটা করতেই পারব সে ব্যাপারে তোমার কোনও সন্দেহ নেই?'

'না...শুধু...'

লম্বা, কোমল আঙুলগুলো রায়হানের শরীরে খেলা করে

চলেছে। 'তোমার সুহিতার জন্য মন খারাপ কোরো না, রায়হান। সে তোমার স্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেনি। উল্টো তোমার তথাকথিত বন্ধুর সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করেছে। এখন সে ব্রায়ান নামে এক লোকের ঘর করছে। সুহিতা আমাকে পঙ্গু করে দিয়েছে, তোমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। ও একটা অসতী নারী। এখন আমাদের পালা। আমরা ওর ওপর শোধ নেব।'

আরও খানিকটা চা পান করল রায়হান। চোখে ভাসল সুহিতার ছিপছিপে নগ্ন শরীর। কল্পনায় দেখল এক লোক রমণ করছে তার বউকে। তবে লোকটার চেহারা ফুটল না কল্পনায়।

'হ্যাঁ,' ফিসফিস করল রায়হান। 'এবার আমাদের পালা।'

মার্সিয়া ওর হাত থেকে খালি কাপটা নিল, রাখল মেঝের ওপর। সিধে হলো সে, মখমলের পোশাকটা খুলে ফেলল। ফেলে দিল মেঝেতে।

ঝাড়া এক ঘণ্টা রায়হানকে নিয়ে ব্যস্ত থাকল মার্সিয়া। খেলা শেষ হবার পরে, পাশাপাশি শুয়ে থাকল দু'জন। ঘুম এসে যাচ্ছিল ক্লান্ত, তৃপ্ত রায়হানের চোখে, ট্রেলারের বাইরে মানুষের গলা ভেঙে দিল ঘুমের চটকা। জোরে জোরে কথা বলছে কেউ। মার্সিয়া রায়হানের আলিঙ্গন থেকে ছাড়িয়ে নিল নিজেকে, সিধে হলো। হালকা একটা রোব চড়াল গায়ে। রায়হানও উঠে বসেছে। সঙ্গী হলো মার্সিয়ার। দু'জনে মিলে দাঁড়াল ছোট জানালাটির সামনে। মার্সিয়া সবুজ পর্দা সরিয়ে তাকাল বাইরে।

জিপসিদের সর্দার ইগনাসিও লাল মুখের লম্বা-চওড়া এক লোকের সঙ্গে কথা বলছে। তাদের পায়ের কাছে সাদা, রোমশ একটা কুকুর। ভয়ে ভয়ে বাতাসে গন্ধ শুঁকছে। এ কুকুরটাকেই গতকাল দেখেছে রায়হান।

'আমাদের কোনও লোক অমন কাজ কখনও করতে যাবে না,' বলছে ইগনাসিও। 'আমি চিনি ওদেরকে।'

'ফালতু কথা ছাড়ো,' বলল লালমুখো। 'বাছুরটা যেখানে

মরেছে সেখান থেকে রক্তের দাগ শুরু হয়ে মিশেছে তোমাদের ক্যাম্পে। লোকে আমাকে আগেই সাবধান করে দিয়েছিল যেন জিপসিদের আমার এলাকায় ঢুকতে না দিই। তাদের কথা না শুনে ভুল করেছি।'

ইগনাসিও একবার মার্সিয়াদের ট্রেলারে তাকাল। ওরা পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করল। তারপর ফের তাকাল লোকদুটোর দিকে।

'আমি আমার লোকদের জিজ্ঞেস করব'খন,' বলল জিপসি সর্দার। 'কেউ এ কাজ করলে তাকে অবশ্যই শাস্তি পেতে হবে।'

'বাছুরটা অনেক দামী ছিল,' বলল কৃষক।

'আপনি আপনার মাঠে কাজ করার বিনিময়ে যে পারিশ্রমিক দিচ্ছেন সে টাকাটা বাছুরের দাম হিসেবে না হয় হিসেব করে কেটে রাখবেন,' বলল ইগনাসিও।

'ঠিক আছে...' চাষা একবার ক্যাম্পার এবং ট্রেলারগুলোর ওপর চোখ বুলাল, যেন অপরাধীকে খুঁজে বের করতে চায়। 'এতে কিছুটা ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে আমার। তবে আবার যদি এরকম কিছু ঘটে...'

'কথা দিচ্ছি আর কখনও এরকম ঘটবে না।'

'না ঘটলেই ভাল,' বলল লাল মুখো। 'তা হলে পরেরবার শেরিফকে সঙ্গে নিয়ে আসব!'

হাঁটা দিতে যাচ্ছিল চাষা, কী মনে করে ঘুরে দাঁড়াল। যেন যথেষ্ট পরিমাণ শাসানো হয়নি। 'বাছুরটাকে হারিয়ে কষ্ট লাগছে। কিন্তু ওটাকে যেভাবে হত্যা করা হয়েছে...যীশাস! গোটা শরীর ছিন্নভিন্ন। একটা অবোধ প্রাণীকে কোন্ পাষণ্ড এমন নৃশংসভাবে মারতে পারে?'

জবাবে কিছু বলল না ইগনাসিও। কৃষক ট্রেইল ধরে জঙ্গলের দিকে এগুলো। জঙ্গলের কিনারে পৌঁছে ঘুরল সে, তীক্ষ্ণ সুরে শিস দিল। ট্রেলারের কাছে ঘুর ঘুর করছিল সাদা কুকুরটি, শিস শুনে

দৌড়ে গেল মনিবের কাছে।

ইগনাসিও নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল। মাথা ঘুরিয়ে তাকাল মার্সিয়াদের ট্রেলারে। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ।

'ও জানে,' ফিসফিস করল রায়হান।

'অবশ্যই জানে,' বলল মার্সিয়া। 'তবে আমাদের বিরুদ্ধে কিছু করার সাহস পাবে না।'

'তা না-ও হতে পারে। আমি বরং লোকটাকে গিয়ে বলি আমরা চলে যাচ্ছি।'

'সে তোমার ইচ্ছে,' অন্যমনস্ক সুরে বলল মার্সিয়া। 'আমি এই ফাঁকে জিনিসপত্র গোছগাছ করে ফেলি।'

জামাকাপড় পরে বেরিয়ে পড়ল রায়হান। ইগনাসিওকে পেল তার ক্যাম্পারে। পেছনের সিঁড়িতে বসে আছে। এখানে বউ আর ছোট বাচ্চাটাকে নিয়ে থাকে ইগনাসিও।

রায়হান ইতস্তত গলায় বলল, 'ইগনাসিও, আ-আমি বলতে এসেছি আমরা চলে যাচ্ছি।'

'চলে যাচ্ছেন?' খুশিটা চেপে রাখতে পারল না জিপসি সর্দার। 'চিরদিনের জন্য?'

'হুঁ। মার্সিয়ার...অসুস্থতার সময় তোমরা অনেকদিন আমাদেরকে তোমাদের সঙ্গে থাকতে দিয়েছ। আমি এজন্য কৃতজ্ঞ।'

'কৃতজ্ঞ হবার মত আমরা কিছু করিনি।'

'ও এখন সুস্থ। তাই আমরা চলে যাব।'

গম্ভীর মুখে মাথা ঝাঁকাল ইগনাসিও। ওরা চলে যাচ্ছে বলে কোন রকম দুঃখ প্রকাশ করল না। রায়হান জানে ওরা কেন ওদেরকে থাকতে দিয়েছিল। আর ইগনাসিও বিদায়ের সময় ফালতু কথা বলার লোক নয়।

'গেলাম,' বলল রায়হান।

জিপসি সর্দার দেখছে ওকে, বাঁকানো ভুরুর নীচে প্রায় অদৃশ্য হয়ে আছে কালো চোখ জোড়া।

'ঈশ্বর আপনার সহায় হোন,' বলল সে।

আট

সিয়াটল শেরাটন হোটেলের এলিভেটর থেকে খুশিতে নাচতে নাচতে বেরিয়ে এল সুহিতা সুলতানা। ও একটা চাকরি পেয়ে গেছে। আগামী মাস থেকে শুরু হবে কাজ। নতুন হোটেলের ব্যাংকোয়েট ফ্যাসিলিটিজ-এর সমন্বয় সাধনের দায়িত্ব। বেকার জীবনের অবসান ঘটতে যাচ্ছে বলে ওর মনটা ভরে আছে আনন্দে।

তবে ওর স্বামীর পছন্দ নয় যে কাজে ফিরে যাক সুহিতা। শেষে স্ত্রীর জেদের কাছে হার মেনেছে। অবশ্য ডাক্তার ব্রায়ানকে বুঝিয়েছেন এ সময় চাকরি করলে মন ভাল থাকবে সুহিতার। হপ্তায় মাত্র কুড়ি ঘণ্টা কাজ ওর, বিকেল ও সন্ধ্যাগুলো পরিবারের সঙ্গে কাটানোর সুযোগ রয়েছে সুহিতার।

চাকরি নিয়ে আজ সকালটা এমন উত্তেজনায় কেটেছে সুহিতার যে নাশতা খাওয়ার কথাই ভুলে গেছে। এখন খিদে লেগেছে। হোটেলের কফিশপ লবিতে। সেখানে ঢুকল সুহিতা। সকাল এগারোটা বাজে। এখন কফি ব্রেক বা লাঞ্চেও কোনটার সময়ই নয়। ফলে ঘরটা প্রায় খালি। জানালার ধারে একটি টেবিল দখল করল সুহিতা। চিংড়ির সালাদ, বয়সেনবেরী পাই এবং কফির অর্ডার দিল। খাবার নিয়ে ওয়েট্রেসের আসার অপেক্ষা

করছে সুহিতা, হঠাৎ কেমন অস্বস্তি লেগে উঠল ওর। অস্বস্তিটা কেন হচ্ছে বুঝতে পারছে না সুহিতা, চামড়ায় কেমন শিরশিরে একটা ভাব, শিরদাঁড়া বেয়ে যেন নামল বরফ জল। হঠাৎ অস্বস্তি লাগার কারণটা বুঝে ফেলল সুহিতা। কেউ ওকে লক্ষ করছে।

অস্বস্তিকর অনুভূতিটা কাঁধ ঝেড়ে ফেলে দিতে চাইল সুহিতা। চাকরি পেয়ে গেছে, সে উত্তেজনায় আসলে অকস্মাৎ অস্থির হয়ে উঠেছে নার্ভগুলো, নিজেকে বোঝাল ও। চুপচাপ, স্থির বসে থাকো, তা হলেই চলে যাবে উত্তেজনা।

কিন্তু গেল না। বরং কেউ ওকে লক্ষ করছে এই অনুভূতি ক্রমে প্রবলতর হয়ে উঠল মনে। খাবার নিয়ে এল ওয়েট্রেস, ওর দিকে কেমন অদ্ভুত একটা চাউনি দিল।

যদিও জানে বোকার মত হয়ে যাবে কাজটা, কিন্তু মাথা ঘুরিয়ে পেছন ফিরে তাকানোর প্রবল ইচ্ছেটা দমন করা যাচ্ছে না কিছুতেই। অবশেষে ক্যাজুয়াল ভঙ্গিতে চেয়ারটা ঘুরিয়ে বসল সুহিতা। এক এক করে প্রতিটি খদ্দেরের ওপর চোখ বুলাল। এক মা তার ছোট দুই বাচ্চাকে চেয়ারে বসিয়ে রাখার চেষ্টা করে নাজেহাল। আর্মি চুল ছাঁটের এক তরুণ, সম্ভবত ফোর্ট লুইস থেকে এসেছে। কালো মোহেয়ার সুট পরা এক বুড়ো হিব্রু ভাষার একটি খবরের কাগজ পড়ছে। কালো চুলের এক মহিলা, কপালে সাদা একটা দাগ, প্রকাণ্ড কালো চশমা চোখে, চোখ বুলাচ্ছে মেনুতে। এক মুটকি ডায়েটিংকে কাচকলা দেখিয়ে ডাবল ক্যারামেল আইসক্রীম খাচ্ছে, ঘরে আরও আছে এক তরুণী, পরনে বিউটিশিয়ানের ড্রেস, পকেটে হোটেলের নাম খোদাই করা।

সব মিলে এই-ই। এরা কেউই লক্ষ করছে না সুহিতাকে। অন্তত সুহিতা যখন ওদের দিকে ফিরে তাকিয়েছে, তার মনে হয়নি কেউ তাকে লক্ষ করছে।

খাওয়ায় মনোযোগ ফেরাল সুহিতা। কিন্তু খিদে নষ্ট হয়ে

গেছে। এসব হাবিজাবি কল্পনা থেকে বিরত থাকতে হবে ওকে, জানে সুহিতা। যুক্তি দিয়ে ব্যাপারটা বিচার করো, নিজেকে বলল ও। ওর ওপর কেউ নজর রাখতে যাবে কেন? কারণ কী?

হঠাৎ চেয়ারে শিরদাঁড়া টানটান করল সুহিতা। মেঘলা দিনে কেউ চোখে সানগ্লাস পরে?

আবার ঘুরে তাকাল সুহিতা, এবারে দ্রুত। সবকিছুই আগের মত—সেই কাস্টমাররাই যে যার জায়গায় এখনও বসে আছে...শুধু সানগ্লাস পরা মহিলা বাদে। সে চলে গেছে।

মহিলা দেখতে যেন কীরকম ছিল? ঠোঁট কামড়াল সুহিতা। মনে করার চেষ্টা করছে। কালো কাচের আড়ালে মহিলার চোখ চেনা যাচ্ছিল না। মুখের নীচের অংশটি অদৃশ্য ছিল মেনুর আড়ালে। ইচ্ছা করে সে নিজেকে আড়াল করে রাখছিল? মহিলার দীঘল কালো চুলের মাঝে রূপোলি দাগটা মনে পড়ছে সুহিতার। মহিলার মুখটা ও ভাল করে দেখতে পায়নি তবু কেন জানি চেনা চেনা লাগছে। মনে হচ্ছে একে কোথাও আগে দেখেছে ও।

অধৈর্য ভঙ্গিতে ডানে-বামে মাথা নাড়ল সুহিতা। এসবের কোনও মানে হয় না। ওর ওপর কেন কেউ নজর রাখতে যাবে? এসব উদ্ভট চিন্তা মাথা থেকে দূর করা দরকার। ডাক্তারকে ঘটনাটা বলতে হবে। উনি নিশ্চয় ব্যাখ্যা দিতে পারবেন সুহিতা কেন এসব উল্টোপাল্টা চিন্তা করছে।

আধখাওয়া লাঞ্চের দাম মিটিয়ে দিয়ে কপি শপ ত্যাগ করল সুহিতা। বাইরে আকাশ থমথমে। মুখ কালো করে ঝুলে আছে শহরের ওপর। বাড়িতে কোনও কাজ নেই সুহিতার। অত বড় বাড়িতে বুড়ি গভর্নেসের সঙ্গে সময় কাটানোরও কোনও মানে নেই।

হোটেলের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে সুহিতা। অন্যমনস্ক দৃষ্টি রাস্তার ওপারে।

রাস্তার ওপারে একটি সিনেমা হল। সিনেমা চলছে। এ ছবিটি

দেখার ইচ্ছে ছিল সুহিতার। ঝট করে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল ও, নেমে এল রাস্তায়। পা বাড়াল প্রেক্ষাগৃহ অভিমুখে। একটা টিকেট কেটে ঢুকে পড়ল সিনেমা হল-এ।

এ সময়ে সিনেমা হল-এ তেমন ভিড় নেই। সুহিতা নিজেই একটা আসন বেছে নিয়ে বসে পড়ল। মনোযোগ দিল সিনেমায়। কিন্তু একটু পরেই সেই অস্বস্তিবোধটা ফিরে এল ওর মাঝে। মনে হচ্ছে কেউ ওর দিকে তাকিয়ে আছে। কফি শপের চেয়ে অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে গা ছমছমে অনুভূতিটা অনেক বেশি জোরালো।

এবারে ক্যাজুয়াল ভঙ্গি করার ধার ধারল না সুহিতা। মাথা ঘুরিয়ে সরাসরি তাকাল পেছনের দর্শক সারিতে। ছায়াছবির আলোতে আলোকিত মুখগুলো। কেউ ওর দিকে তাকিয়ে নেই। কপালে কাটা দাগঅলা মহিলাকে দর্শকদের ভিড়ে দেখতে পেল না সুহিতা।

কিন্তু এরপরে ও আর ছবিতে মনোনিবেশ করতে পারল না। বেরিয়ে এল প্রেক্ষাগৃহ থেকে। বাইরে হালকা ধারায় বৃষ্টি পড়ছে। সুহিতা দ্রুত পা বাড়াল পার্কিং লটে। দু'ব্লক পরেই পার্কিং লট। ওখানে ও ওর গাড়ি পার্ক করে রেখেছে। একবার থেমে দাঁড়াল সুহিতা, ঘুরল পাঁই করে। এক মহিলাকে দেখতে পেল এক ঝলক। ওর পেছন পেছন আসছিল। সুহিতা ঘুরে তাকাতেই একটা ভবনের আড়ালে সেঁধিয়েছে স্যাৎ করে। মহিলা লম্বা, ফর্সা গায়ের রঙ। বাকি রাস্তাটুকু ধীর গতিতে পার হলো সুহিতা। বেশ কয়েকবার তাকাল পেছন ফিরে। কিন্তু মহিলাকে আর দেখতে পেল না।'

উত্তর সিয়াটলের একটি জীর্ণ মোটেল এভারগ্রীন মোটেল। ইংরেজি 'ইউ' আকারের। এভারগ্রীনে কোনও সুইমিংপুল নেই, নেই কোনও রুমে টিভি দেখার ব্যবস্থা। তবে মোটেলটি সস্তা, এখানে শুক্রবার রাতে আশপাশের অফিস থেকে রোমান্টিক

কাপ্‌লরা আসে নিরিবিলিতে রোমান্স করার জন্য। তবে ৯ নম্বর কক্ষের জুটির মনে প্রেম নয়, খেলা করছে অন্য কিছু।

'তুমি ঠিক জান ও তোমাকে চিনতে পারেনি?' জিজ্ঞেস করল রায়হান মর্তুজা।

'আমার চেহারা ভাল করে লক্ষ করার সুযোগই পায়নি, চেনা দূরে থাক,' জবাব দিল মার্সিয়া। হাসল সে, ঝিকিয়ে উঠল গভীর সবুজ চোখ। 'তবে ওর স্মৃতি শক্তিতে একটা নাড়া দিয়ে এসেছি আমি। দু'বার ওর সামনে হাজির হয়েছি। ভাল করেই জানি আমাকে দেখে ওর ভেতরে ঢুকে গেছে ভয়।'

'কাজটা কি ঠিক হচ্ছে?' প্রশ্ন করল রায়হান। 'এভাবে ওর স্মৃতি উসকে দিচ্ছ?'

'মাই লাভ, আমি ঠিক কাজটাই করছি। ওই মহিলা আমার যে দশা করেছে, তোমার যে দশা করেছে, এজন্য ওকে তো ভুগতে হবেই।'

মার্সিয়া শুয়ে পড়ল বিছানায়, শরীর টানটান করল কামনামদির ভঙ্গিমায়। রায়হান ওর দিকে তাকাল না। চিন্তিত মুখে ছেঁড়া কার্পেটে পায়চারি করছে।

'আমরা এখন কী করব?' জানতে চাইল সে।

'চিন্তা কোরো না, ডার্লিং। সব আমি প্ল্যান করে রেখেছি। আবার ওকে দেখা দেব আমি–এখানে-ওখানে। এক ঝলকের জন্য। তোমাকেও হয়তো এক পলক দেখার সুযোগ পেল। তা হলেই ওর মাথায় ঢুকে যাবে নানান দুশ্চিন্তা। ওকে ওর বাড়িতে দেখে এসেছি আমি। ওখানে একটা ঘটনা ঘটানোর ইচ্ছে আছে আমার। এখন শুধু ধৈর্য ধরে থাকতে হবে। আমি চাই তোমার সুহিতা যেন বুঝতে পারে তাকে নিয়ে কী ঘটছে এবং কেন। শুধু...' কথা অসমাপ্ত রেখে চুপ হয়ে গেল মার্সিয়া।

'শুধু কী?' জিজ্ঞেস করল রায়হান।

ঝট করে উঠে বসল মার্সিয়া, তাকাল রায়হানের দিকে।

'বোকার মত প্রশ্ন কোরো না, রায়হান। তুমি জান আমাদেরকে কী করতে হবে।'

'ওকে খুন করবে, মার্সিয়া? ওকে আমরা খুন করব? তাতে কী লাভ?'

লম্বা পা জোড়া বিছানা থেকে নামাল মার্সিয়া, রায়হানের মুখোমুখি দাঁড়াল। ওর চোখে চোখ রাখল গভীর দৃষ্টিতে। শরীর চেপে ধরল রায়হানের গায়ে। নরম, আদুরে গলায় কথা বলতে লাগল।

'তাতে আমার মনে শান্তি আসবে, ডার্লিং, দীর্ঘ যাতনার পরে শান্তির ফল্গুধারা বইবে দেহ-মনে। এ কাজটা আমি করবই। তুমি আমার সঙ্গে থাকতে না চাও, থেকো না। আমি একাই কাজটা করতে পারব।' রায়হান এক সেকেণ্ডের জন্য সবুজ নয়না নারীর কাছ থেকে দূরে হঠল, তারপর হাত জোড়া মার্সিয়ার কাঁধে রেখে জোরে টানল নিজের দিকে। আদর করে চুলে বুলিয়ে দিল হাত, রূপোলি কাটা দাগে মোলায়েম ভঙ্গিতে আঙুল ছোঁয়াল। মার্সিয়ার গা থেকে ভেসে আসা চন্দনের গন্ধ মনে করিয়ে দিল প্রথম দিকের মিলনের দিনগুলো।

'আমি তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারব না,' বলল মর্তুজা। 'যা-ই করি না কেন, দু'জনে মিলে একসঙ্গে করব।'

'আমার রায়হান,' প্রেমিকের কানে গরম নিঃশ্বাস ফেলল মার্সিয়া। 'মাই লাভার।' ওকে নিয়ে বিছানায় বাড়াল কদম।

'ড. গারফিল্ড কী বললেন?'

ব্রায়ান অ্যাডামস স্ত্রীর হাত ধরে আছে, উদ্বিগ্নচিত্তে লক্ষ করছে তাকে।

'বললেন সব নাকি আমার কল্পনা।'

কপালে ভাঁজ পড়ল ব্রায়ানের।

'ঠাট্টা করছিলাম। তিনি তেমন কিছু বলেননি। তবে যা

বলেছেন তার সারমর্ম ওটাই। তিনি বলেছেন, অনেক লোকই নাকি এরকম হালকা প্যারানইয়ার মাঝ দিয়ে যায়। আমার ব্যাপারটা নাকি অস্বাভাবিক কিছুই নয়। আমাকে দুশ্চিন্তা করতে মানা করেছেন।' ব্রায়ান সুহিতার হাতে মৃদু চাপ দিল। 'ড. গারফিল্ড যা বলেন ভেবেচিন্তেই বলেন, ডিয়ার।'

'তবে এ ব্যাপারটি ছাড়া,' বলল সুহিতা। 'আমাকে কেউ অনুসরণ করছে। এক মহিলা। সেদিন মহিলাকে একটি কফি শপে দেখেছি, তারপর আবার রাস্তায়। আর আজ সকালে দেখলাম আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছে।'

'তুমি ঠিক জান ওই মহিলা-ই?'

একশোবার। একেক সময় একেক ড্রেস পরনে ছিল তার। তবে মুখটা সবসময়ই ঢাউস একটা চশমা দিয়ে ঢাকা ছিল। অথবা অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে রাখত সে। তবে তার কপালের কাটা দাগ দেখে নিশ্চিত হয়ে গেছি সেই একই মহিলা।

চিন্তিত ভঙ্গিতে ওর কথা শুনল ব্রায়ান। সুহিতা বিরতি দিলে নিজের চোয়াল ঘষতে ঘষতে ছাদের দিকে তাকাল সে। 'সুহিতা, তুমি আবার কাজে যাচ্ছ... তোমার কি মনে হচ্ছে না সব কিছুতে একটু বেশি তাড়াহুড়ো করে ফেলছি আমরা?'

'না, আমার তেমন কিছু মনে হচ্ছে না। আমার কাজের সঙ্গে এর সম্পর্ক কী?'

'না, মানে ভাবলাম আবার নতুন করে বাইরের কাজের চাপে হয়তো তুমি...'

'কাজের চাপে হয়তো আমি উল্টোপাল্টা ভাবতে শুরু করেছি, তাই না?' স্বামীর অসমাপ্ত কথা শেষ করল সুহিতা। 'লোকে আমার পিছু নিয়েছে তাও আমার কল্পনা?'

'আমি তা বলিনি।'

'তুমি কী বলেছ তাতে আমার কিছু আসে যায় না,' ঝাঁঝিয়ে উঠল সুহিতা। ব্রায়ান ওর কথায় আহত হয়েছে বুঝতে পেরে

একটা হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করল স্বামীর গাল। 'আমি দুঃখিত, ব্রায়ান। জানি তুমি সব সময় আমার ভাল চাও। ড. গারফিল্ডও। কিন্তু আমি পরিষ্কার যা দেখতে পাচ্ছি সে ব্যাপারটা তোমরা কেউই মেনে নিতে চাইছ না।'

ব্রায়ান হাসল ওর দিকে তাকিয়ে। তবে ওকে নিয়ে সংশয়ের ছোঁয়া এখনও মুছে যায়নি চোখ থেকে। 'আমি চেষ্টা করছি, ডিয়ার। সত্যি চেষ্টা করছি।'

ওই দিন সন্ধ্যায় দু'জনের আর তেমন কথা হলো না। ওরা একটু তাড়াতাড়িই শুতে গেল। বিছানায় শরীর এলিয়ে দেয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল ব্রায়ান। আরও ঘণ্টাখানেক পরে চোখ বুজে এল সুহিতার। হঠাৎ একটা ঝাঁকি খেয়ে জেগে গেল। নীচতলায় কেউ হাঁটাহাঁটি করছে।

কেউ পা টেনে টেনে হাঁটছে। একটু পরে আর শব্দটা শোনা গেল না। দীর্ঘ সময় আড়ষ্ট হয়ে বিছানায় শুয়ে থাকল সুহিতা, নিমীলিত চোখ আঁধারে। নিজেকে বোঝানোর প্রাণপণ চেষ্টা করছে ও, কোনও শব্দ-টব্দ শুনতে পায়নি, প্রার্থনা করল আর যেন কোনও শব্দ শুনতে না হয়।

আবার শব্দটা ভেসে এল। কেউ পা ঘষটে হাঁটছে। হয়তো মিসেস ডেভিডসন, মনকে প্রবোধ দিতে চাইল সুহিতা। কিন্তু মন জানে ওটা মিসেস ডেভিডসন নয়। হাউজকিপার থলথলে মোটা পা নিয়ে বাড়ি কাঁপিয়ে হাঁটে, নীচের মত লঘু পদক্ষেপে নয়।

মনকে বোঝাতে নানান ব্যাখ্যা দিতে লাগল সুহিতা। হতে পারে বাতাস। বাতাসে মেঝেতে খড়মড় আওয়াজ উঠেছে। ইঁদুর হওয়াও বিচিত্র নয়। কিন্তু কোনও ব্যাখ্যাই মানছে না মন। সুহিতা ভাল করেই জানে ওর একটি ব্যাখ্যাও যুক্তিসংগত নয়। ও পাথর হয়ে, কান খাড়া করে শুয়ে রইল বিছানায়। অনেকক্ষণ শুধু ব্রায়ানের নাক ডাকার শব্দ পেল। কান খাড়া করে রাখতে রাখতে কানই গেছে ব্যথা হয়ে। তারপর আবার শোনা গেল ওটা।

খসখস একটা আওয়াজ। কাপড়ে কাপড় ঘষার মত। তারপর ভোঁতা একটা শব্দ, কেউ পা ফেলেছে। শব্দটা অস্পষ্ট কিন্তু ভীতিকরভাবে বাস্তব। 'ব্রায়ান,' শ্বাসটানার গলায় স্বামীকে ডাক দিল সুহিতা।

'ক্-কী-?'

জেগে গেছে ব্রায়ান। ওর ঠোঁটে আঙুল চাপা দিল সুহিতা যাতে কথা না বলে। ব্রায়ানের ঘুমের চটকা পুরোপুরি কেটে যাওয়ার পরে আঙুল সরিয়ে নিল সুহিতা।

'কী হয়েছে?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল ব্রায়ান।

'নীচে কে যেন এসেছে।'

'মানে?'

'শ্‌শ্‌। শোনো!'

বিছানায় উঠে বসল ওরা। কাঁধে ঠেকে রইল কাঁধ, কান পাতল। কেটে যেতে লাগল সময়। সুহিতার বুকে ব্যথা শুরু হয়ে গেল, বুঝতে পারল ও আসলে বন্ধ করে রেখেছে নিঃশ্বাস। নিঃশব্দে লম্বা একটা শ্বাস ছাড়ল সুহিতা।

'আমি তো কিছুই শুনতে পাচ্ছি না,' বলল ব্রায়ান। কণ্ঠে বিরক্তি।

'না। আমি শুনেছি। সত্যি।'

আরও দুটো অসহ্য মিনিট কেটে গেল। মাথায় মাথা ঠেকিয়ে স্বামী-স্ত্রী তাকিয়ে রইল দরজার দিকে।

কিন্তু কিছুই শোনা গেল না। কিছুই ঘটল না।

'সুহিতা-' বলল ব্রায়ান, তার কণ্ঠ এখন স্বাভাবিক।

'আমি কিছু কল্পনা করিনি,' বলল সুহিতা। 'নীচে সত্যি কিছু একটা আছে। কিংবা ছিল।'

'কেউ'র বদলে "কিছু একটা" বলছ কেন তুমি?'

'খোদা, আমি জানি না তো! "কেউ" বা "কিছু"তে কী এসে যায়?'

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে গায়ের ওপর থেকে কম্বল ফেলে দিল ব্রায়ান। 'আচ্ছা, আমি নীচে গিয়ে দেখছি।'

বিছানা থেকে নামল ব্রায়ান, সাদা পাজামার ওপর একটা রোব চাপাল তারপর পা বাড়াল হলওয়েতে। সুহিতাও গা থেকে ছুঁড়ে ফেলল কম্বল। এখানে বসে ভয়ে অস্থির হয়ে থাকার কোনও মানে নেই। গায়ে একটা রোব চাপিয়ে বেরিয়ে এল ঘর থেকে, হলওয়ে ধরে কদম বাড়াল সিঁড়িতে। সিঁড়ির মাথায় এসে হ্যারির ঘরে তাকাল। ঘুমাচ্ছে ছেলেটা। সুহিতা নীচে নেমে এল স্বামীর সঙ্গে যোগ দিতে।

নীচতলার সবগুলো আলো জ্বেলে দিয়েছে ব্রায়ান। একটার পর একটা ঘরে উঁকি দিচ্ছে। সিঁড়ির শেষ ধাপে পা রেখেছে সুহিতা, ফিরে এল ব্রায়ান। পেছনে মিসেস ডেভিডসন। ঘুমে ফোলা মুখ।

'এখানে কিছু দেখলাম না,' বিরক্তি চেপে রেখে বলল ব্রায়ান।

'মিসেস ডেভিডসন,' বলল সুহিতা, 'তুমি কিছু শুনেছ?'

'জ্বী. না। আমি মরার মত ঘুমাচ্ছিলাম। মি. অ্যাডামস এসে ঘুম ভাঙালেন।'

'বললামই তো এখানে কিছু নেই,' বলল ব্রায়ান।

'তুমি ঘুমাতে যাও। মিসেস ডেভিডসন, বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত।'

ব্রায়ান ঘরের বাতি নেভানো পর্যন্ত অপেক্ষা করল সুহিতা, তারপর ওর পেছন পেছন উঠে এল দোতলায়। শুয়ে পড়ল বিছানায়। সুহিতার দিকে পিঠ ফিরে শুয়ে থাকল ব্রায়ান। সুহিতার ইচ্ছে করল হাত বাড়িয়ে কাছে টেনে নেয় স্বামীকে। কিন্তু হাত বাড়াল না। খাড়া করে রাখল কান। কিন্তু নীচতলা থেকে আর কোনও শব্দ শোনা গেল না। অনেকক্ষণ পরে ঘুমিয়ে পড়ল সুহিতা। তবে ভাল ঘুম হলো না। ছটফট করতে লাগল ও ঘুমের মধ্যে।

নয়

পরবর্তী দুটো রাত ঠিকমত ঘুম হলো না সুহিতার। সে কান খাড়া করে রাখে নীচতলা থেকে কোনও শব্দ শোনা যায় কি না। কিন্তু অস্বাভাবিক কোনও শব্দ শুনতে পায় না। রাতের বেলা বাড়ির স্বাভাবিক আওয়াজগুলোই যেমন দরজার ক্যাঁচ-ক্যাঁচ, মেঝেতে খড়মড় ইত্যাদি শব্দই কেবল শোনা যায়। কিন্তু এসব শব্দই পিলে চমকে দেয় সুহিতার। অশুভ ইঙ্গিত খুঁজে পায় সে এসব শব্দের মাঝে।

দিনের বেলা সুহিতা অপ্রয়োজনে বাড়ি থেকে বের হয় না। তবে কাছের মেইল বক্সে চিঠি ফেলার সময়ও বারবার পেছন ফিরে দেখে কেউ ওর পিছু নিয়েছে কিনা। কেউ ওর পিছু লেগে নেই।

অবশেষে একটু আধটু স্বস্তি বোধ করতে লাগল ও। হয়তোবা ওসব ওর নিছকই কল্পনা ছিল—অনুসরণকারী, রাতের বেলা নীচতলা থেকে ভেসে আসা বিচিত্র সব শব্দ। হয়তো সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।

এমন সময় ওর গাছপালাগুলো শুকিয়ে যেতে লাগল।

প্রথমে রোগাক্রান্ত হলো বোস্টন ফার্ন। পানির পাত্র এবং স্প্রে বোতল হাতে পানি ছিটাতে গিয়ে সুহিতা লক্ষ্য করল গাছটির করাতের মত পাতাগুলো বাঁকা এবং বাদামী হয়ে মেঝেয় লুটিয়ে পড়েছে। ভাল করে পরীক্ষা করতে বুঝতে পারল গাছের আরও

অনেক পাতা শুকিয়ে গেছে। স্পাইডার প্লান্টের কাছে গেল সুহিতা। দেখল এ গাছের সতেজ পাতাগুলোও কেমন মিইয়ে গেছে। পাতার সুঁইয়ের মত ডগাগুলো বাদামী হয়ে যাচ্ছে। ওর সবচেয়ে প্রিয় ফিলোডেনড্রন এখনও খাড়া হয়ে থাকলেও পাতাগুলো হারিয়েছে তাদের ঔজ্জ্বল্য।

সুহিতা শুনল কিচেনে ঢুকেছে মিসেস ডেভিডসন। ডাক দিল ও মহিলাকে। তোয়ালেয় হাত মুছতে মুছতে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল হাউজকীপার।

'জ্বী, মিসেস অ্যাডামস?'

'তুমি কি গাছে পানি দাও?'

'আমি আপনার গাছের ধারে কাছেও যাই না। আপনিই মানা করেছিলেন।'

'ও, আচ্ছা, ঠিক আছে, ধন্যবাদ।'

'আর কিছু?'

'না, আর কিছু না।'

মহিলা ফিরে গেল কিচেনে। সুহিতা গাছগুলো ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। সন্দেহ নেই কোনও একটি সমস্যা হয়েছে এগুলোর। তবে সমস্যা হলো অসুস্থ গাছে বেশি পানি দেয়া হোক আর অল্প পানি দেয়াই হোক, চেহারা একইরকম দেখায়। পানি দেয়ার ব্যাপারে সব সময় সতর্ক থাকে সুহিতা, লক্ষ রাখে প্রতিটি গাছ পর্যাপ্ত আলো এবং তাপ পাচ্ছে কিনা। যেখান থেকে ও গাছ কিনে এনেছে সে দোকানের মাটি এসব গাছের জন্য বিশেষভাবে ব্লেণ্ড করা। গাছগুলো নিয়মিত পুষ্টি পাচ্ছে কিনা সেদিকেও কড়া নজর রাখে সুহিতা। কিন্তু তারপরও ওর গাছগুলো এরকম অসুস্থ হয়ে পড়ল কেন?

পরবর্তী চব্বিশ ঘণ্টায় গাছের দশা আরও শোচনীয় হয়ে উঠল। কাণ্ডের নীচে পড়ে থাকল অজস্র বিবর্ণ পাতা। স্পাইডার প্ল্যান্ট মরার মত ঝিমোচ্ছে, পাতাগুলো হলুদ হয়ে মুড়ে গেছে।

ফিলোডেনড্রন হারিয়েছে তার চনমনে সুস্বাস্থ্য। শুকনো পাতা, শেকড় দিয়ে কেমন নেতিয়ে পড়ে ঝুলছে। খুঁটির গায়ে কোনমতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, যেন খাড়া হয়ে থাকতে খুব কষ্ট হচ্ছে।

আর অপেক্ষা করা সমীচীন মনে করল না সুহিতা। গাছ তিনটা নিয়ে চড়ে বসল নিজের ছোট ডাটসানে, চলল অরোরার প্ল্যান্ট ওয়ার্ল্ডে। ওখান থেকে গাছ কিনেছে ও। গাছগুলোকে অসুস্থ বাচ্চার মত বয়ে নিয়ে চলেছে, ব্যাপারটা নিজের কাছে হাস্যকর লাগলেও এটা তো ওর কর্তব্যের মধ্যেই পড়ে।

প্ল্যান্ট ওয়ার্ল্ড-এর পার্কিং লটে গাড়ি দাঁড় করাল সুহিতা। এক এক করে গাছগুলো নামিয়ে আনল। কাউন্টারের মহিলা ওর গাছগুলোর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করায় স্বস্তি বোধ করল সুহিতা।

'গত কয়েক দিন ধরে এগুলোর এরকম অবস্থা,' জানাল সুহিতা। 'কী সমস্যা হয়েছে বলতে পারেন?'

'নাহ্, বলতে পারছি না, মি.বজর্কলুণ্ড বিকেলে দোকানে আসবেন। তিনি অসুস্থ গাছ দেখলেই বলতে পারেন কী সমস্যা।'

'আমি কি গাছগুলো এখানে রেখে যাব? কাল এসে কথা বলব মি.–'

'বজর্কলুণ্ড,' বলল মহিলা। 'অবশ্যই আপনি গাছগুলো রেখে যেতে পারেন। গাছ নিয়ে আপনাকে দুশ্চিন্তা করতে হবে না। মি. বজর্কলুণ্ড না ফেরা পর্যন্ত আমি এগুলোর ওপর খেয়াল রাখব।'

'ধন্যবাদ,' বলল সুহিতা। গাছগুলোর গায়ে একটু আদর করার ইচ্ছেটা বহুকষ্টে দমন করে বেরিয়ে এল দোকান থেকে।

বাড়ি ফিরছে সুহিতা, একটা হতাশা গ্রাস করে রইল ওকে। গাড়িটি খালি খালি লাগছে। নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করল ও, স্রেফ তিনটা গাছ ফেলে রেখে এসেছে ও, তিনটি সন্তান নয়। মূড ভাল করার জন্য নতুন গড়ে ওঠা কেনমোর শপিং মল-এ খানিকটা

সময় কাটানোর সিদ্ধান্ত নিল সুহিতা। একটু ঘুরে ফিরে দেখবে।

দোতলা শপিং মলটি বেশ সুন্দর। ভেতরে আছে ফোয়ারা, গাছের ঝাড়, প্লাস্টিক পার্ক বেঞ্চ। বাতাসে একটা সুগন্ধি ছড়িয়ে দিয়েছে ওরা। দেয়ালে লুকানো স্পীকারে মৃদুলয়ে বাজছে মিউজিক।

সুহিতা ধীরপায়ে হাঁটছে, গহনা এবং পোশাকের দোকানে দেখছে উঁকি মেরে। একটা লেদার-গুডসের দোকানে ঢুকল ও। চামড়ার গন্ধটা ভাল লাগল ওর।

চাবি রাখার একটা কেস তুলে নিল সুহিতা। ব্রায়ানের পছন্দ হবে। মাস্টার চার্জ কার্ড দিয়ে চুকিয়ে দিল দাম। দোকানি রশিদ লিখছে, সুহিতার মনে পড়ে গেল ওর বাবামা'র বিবাহ বার্ষিকীর আর বেশি দেরি নেই। ব্রায়ানের জন্য কেনা জিনিসটা নিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে এল সুহিতা, নীচের তলায় যাওয়ার জন্য পা বাড়াল চলন্ত সিঁড়িতে।

নিঃশব্দ চলন্ত সিঁড়িতে কদম রেখেছে সুহিতা, তাকাতেই দেখতে পেল রায়হান মর্তুজাকে।

হাঁটু কাঁপতে লাগল সুহিতার, কালো রাবারের হ্যাণ্ড রেইল চেপে ধরল ভারসাম্য রক্ষা করতে। সুহিতার সামনে দাঁড়ানো এক মহিলা ঘাড় ঘুরিয়ে ভুরু কুঁচকে তাকাল ওর দিকে। দৃষ্টিতে অসন্তোষ।

চলন্ত সিঁড়ি সুহিতার পায়ের নীচে এসে পৌঁছেছে, সিঁড়ি যেখানে অদৃশ্য হয়ে গেছে, সেই ঝাঁঝরিতে পা রাখতে গিয়ে প্রায় টলে পড়ে যাচ্ছিল সুহিতা। ও নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে, পেছনের মানুষজন প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল সুহিতার গায়ে। সুহিতা চলন্ত সিঁড়ির শেষ মাথায় তাকিয়ে আছে। দেখা যাচ্ছে না কাউকে। নিজেকে সামলে নিতে এক মুহূর্ত সময় লাগল সুহিতার। তারপর অপর এস্কেলেটরের দিকে এগুলো। চলন্ত সিঁড়িতে উঠে পড়ল ও পেছনের লোকজনের জ্বলন্ত চক্ষু অগ্রাহ্য করে।

আপার লেভেলে চলে এল সুহিতা। তাকাল নীচে। ওখানে একটু আগে রায়হানকে দেখেছে ও। এখন ওখানে দু'টি কিশোর দাঁড়িয়ে অলস চোখে দেখছে সিঁড়ি বেয়ে ওঠা আর নেমে আসা মানুষজনকে। রায়হান মর্তুজা কিংবা তার মত চেহারার কাউকে দেখতে পেল না।

ছেলে দুটির কাছে দ্রুত এগিয়ে গেল সুহিতা। 'এখানে একটু আগে যে লোকটা ছিল সে কোথায় গেছে?'

ছেলে দু'টি পরস্পরের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করল, তারপর তাকাল সুহিতার দিকে। 'কোন্ লোক?'

'এই তো তোমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছ এখানে ছিল সে।'

'এখানে কোনও লোককে দেখিনি আমরা,' বলে ওর কাছ থেকে সরে গেল দুই কিশোর।

তিন মিনিট আগেও একটা লোক এখানে দাঁড়ানো ছিল, ওদের সঙ্গে ব্যাপারটা নিয়ে তর্ক করতে গিয়েও থেমে গেল সুহিতা। নিতান্তই ছেলেমানুষি হয়ে যাবে কাজটা। বাচ্চা দুটোর সঙ্গে এ নিয়ে তর্ক করে লাভ কী? হতাশা নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল সুহিতা, দোকানে ঘোরাঘুরি করতে থাকা মানুষজনের দিকে তাকাল।

রায়হান মর্তুজাকে আবার এক ঝলক দেখতে পেল সুহিতা। একটা এক্সিটের ধারে, চওড়া খিলানের মাঝে অদৃশ্য হয়ে গেল। পরনে ডেনিম জ্যাকেট এবং ফেড জিনস। মাথার চুল লম্বা, চওড়া কাঁধ। স্মৃতি বেদনার খোঁচা দিল সুহিতার বুকে। খিলানের দিকে পা বাড়াল ও।

এক্সিটে পৌঁছে দেখল এটা একটা কংক্রিট ওয়াকওয়ের দিকে চলে গেছে। তারপর পার্কিং লট। ব্রিজে কেউ নেই। সুহিতা দ্রুত ব্রিজ পার হয়ে পার্ক করা গাড়িগুলোর দিকে চলে গেল। উঁকি দিল। ডেনিম পরা মানুষটার কোনও চিহ্ন নেই। সুহিতা হঠাৎ লক্ষ করল ওর হাতজোড়া কাঁপছে। মোটা থামে দাঁড়াল হেলান দিয়ে। ব্রায়ানের জন্য কেনা চাবির কেসটা কোথাও পড়ে গেছে কিংবা

ফেলে রেখে এসেছে ও। তবে ওটার খোঁজ করতে যেতে ইচ্ছে হলো না সুহিতার।

ড. গারফিল্ড মুখোমুখি বসেছেন সুহিতার। চেহারায় পেশাদারী মনোযোগ।

'নিজেকে এখন আমার কেমন বোকা বোকা লাগছে,' বলল সুহিতা। 'আপনাকে শপিং সেন্টার থেকে ফোন করেছিলাম মনে হচ্ছিল যেন জীবন-মরণ সমস্যায় পড়ে গেছি। তবে আপনি যে আমাকে সময় দিয়েছেন এজন্য কৃতজ্ঞবোধ করছি।'

মৃদু হাসলেন ডক্টর। 'আমি "আপনাদের সেবায় নিয়োজিত" ধরনের কথা বলাটা নিতান্তই হাস্যকর শোনায়। তবে আমি তো আসলে তোমাদের সেবা করার জন্যই, সুহিতা।'

'কিন্তু কীভাবে শুরু করব বুঝতে পারছি না।'

'শপিং মলে যে লোকটাকে দেখেছ তার সম্পর্কে বলো। তাকে কি ভাল করে লক্ষ করতে পেরেছ?'

'হ্যাঁ। দু'এক সেকেণ্ডের জন্য দেখলেও পরিষ্কার লক্ষ করেছি ওকে।'

'লোকটা কি তোমাকে কিছু বলেছে?'

'না।'

'কোনও অঙ্গভঙ্গি করেছে? তোমাকে চিনতে পেরেছে এমন কোনও ভঙ্গি করেছে?'

'সে শুধু আমার দিকে তাকিয়ে ছিল।'

'লোকটার সঙ্গে তোমার সাবেক স্বামীর মিল আছে?'

'ড. গারফিল্ড, আমি আমার সাবেক স্বামীকেই দেখেছি। ওই লোকটা ছিল রায়হান মর্তুজা।'

ড. গারফিল্ড বুড়ো আঙুল আর তর্জনী দিয়ে নীচের ঠোঁটে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে চিমটি কাটতে লাগলেন। বেশ অনেকক্ষণ পরে বললেন, 'কিন্তু তুমি না বলেছিলে তিন বছর আগেই মারা গেছে

রায়হান মর্তুজা।'

সুহিতা টের পেল ওর মাথা ব্যথা করছে। বলল, 'আমি জানি না ড্রাগোতে ও মারা গেছে কিনা। ভেবেছি মারা গেছে। তবে ধারণাটা ভুল ছিল। ও বেঁচে আছে। ওকেই আমি আজ কেনমোর মল্-এ দেখেছি।'

ড. গারফিল্ড চেয়ার ছাড়লেন। 'সোফায় বসা সুহিতার পাশে চলে এলেন। বিষণ্ন ম্লান চোখে কী যেন খুঁজলেন সুহিতার চেহারায়। তারপর বললেন, 'তোমাকে হপ্তায় একদিন দেখা করতে বলা আমার উচিত হয়নি। সম্ভব হলে হপ্তায় দুতিনদিন তুমি এসো আমার কাছে।'

কান্না পেল সুহিতার। ভেবেছিল থেরাপিতে ওর অবস্থার উন্নতি হয়েছে। কিন্তু কোথায় কী! এসব হচ্ছেটা কী? ওকে কেউ অনুসরণ করছে, রাতে নানান ভুতুড়ে শব্দ শুনছে, মরা স্বামীকে জ্যান্ত হয়ে হাঁটতে দেখছে চোখের সামনে এসবই তো প্যারাডয়েড সিজোফ্রেনিয়ার লক্ষণ। গত কয়েক মাসের মধ্যে এই প্রথম ওর সন্দেহ জাগল ও সত্যি হয়তো বাস্তবতা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। অ্যানালিস্টের সঙ্গে ওর আরও সময় ব্যয় করা উচিত। 'আমি আমার স্বামীর সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলব,' বলল সুহিতা। 'বিদায়, ডক্টর।'

দড়াম করে খুলে গেল সুহিতাদের বাড়ির সদর দরজা। বন্ধ হলো সশব্দে। সবেগে ঘরে ঢুকল হ্যারি অ্যাডামস, ছুটতে ছুটতেই স্কুল বইগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিল হলওয়েের টেবিলে, এক দৌড়ে এসে থামল সিঁড়িগোড়ায়। 'আম্মি।' হাঁক ছাড়ল হ্যারি।

এক ঝুড়ি লণ্ড্রির কাপড় নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এল মিসেস ডেভিডসন। 'তোমার মা বাড়ি নেই।'

'কোথায় সে?'

'শহরে গেছে।'

'ডাক্তারের কাছে?'

'জানি না আমি।'

'মা আজ ডাক্তারের কাছে গেল কেন? আজ তো তার ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করার ডেট না।'

'তার আমি কী জানি?'

'মা বোধহয় আবার ওই স্বপ্নগুলো দেখতে শুরু করেছে। ভয়ের স্বপ্ন।'

'স্বপ্নের কথা আমি কিছু জানি না,' বলল মিসেস ডেভিডসন। 'এখন খাবে এসো। তোমার জন্য ভেজিটেবল সুপ বানিয়েছি।'

'ক্যাম্পবেল?'

'না, বাড়িতে বানিয়েছি।'

'আমার ক্যাম্পবেলের সুপ ভাল্লাগে।'

'আমার সুপ ক্যাম্পবেলের চেয়েও ভাল। এসো। আমি তোমার জন্য খাবার বাড়ছি।'

হ্যারি লাফাতে লাফাতে ঢুকল রান্নাঘরে। দুই বাটি সুপ খেয়ে ফেলল। স্বীকার করল সুপটা প্রায় ক্যাম্পবেলের মতই ভাল। লাঞ্চও শেষ করল পিনাট বাটার, জেলি স্যাণ্ডউইচ এবং এক গ্লাস দুধ সহযোগে। মিসেস ডেভিডসন এই ফাঁকে পাশের লণ্ড্রি রুমের ওয়াশারে ঢুকিয়ে ফেলল বাসি জামা-কাপড়।

'মা কখন ফিরবে?' বলল হ্যারি। 'কাল রাতে একটা মুখ দেখেছি। মা এলে বলব।'

রান্নাঘরে ফিরল মিসেস ডেভিডসন। 'কী বললে মুখ দেখেছ?'

'হুঁ। গত রাতে আমার জানালা দিয়ে তাকিয়ে ছিল। ইঃ, কী বিশ্রী চেহারা!'

'তুমি আসলে স্বপ্ন দেখেছ।'

'না। স্বপ্ন দেখিনি। ওটা একটা মুখই ছিল। লোমে ভরা মুখ। ইয়া বড় বড় দাঁত। খুবই কদাকার দেখতে।' হাউজকীপার ছেলেটিকে এক মুহূর্ত পরখ করল। 'দেখে ভয় পাওনি?'

হ্যারি মিসেস ডেভিডসনের দিকে তাকাল তারপর ফেটে পড়ল খিল খিল হাসিতে। 'ভয় পাব কেন? জানি তো ওটা কে!'

'কে?'

'কেলি। রাবারের মুখোশ পরে এসেছিল। ওর কাজই উদ্ভট সব কাণ্ড করা। ভেবেছে ছাদে উঠে আমাকে ভয় দেখাবে। পাগল!'

'এত রাতে সে এখানে কেন আসবে?' মিসেস ডেভিডসনের কণ্ঠে অসন্তোষ।

'ও যতক্ষণ ইচ্ছে জেগে থাকতে পারে,' বলল হ্যারি। 'আমি ওর বয়সী অথচ আমাকে রাত জেগে "কোজাক" দেখতে দেওয়া হয় না।'

'রাত জেগে ওসব হাবিজাবি দেখতে হবে না! কেলির মত উদ্ভট খেলা করারও দরকার নেই।'

'আমি আম্মিকে বলব একটা মুখোশ কিনে দিতে,' বলল হ্যারি। 'কেলির মুখোশের চেয়েও ভয়ঙ্কর। তারপর ওর বাসায় গিয়ে এমন ভয় দেখাব, ওর আত্মা উড়ে যাবে।'

'মাকে এসব কিনতে বলতে হবে না,' বলল মিসেস ডেভিডসন।

'কেন বলব না? আমি জানি বললেই মা আমাকে একটা মুখোশ কিনে দেবে।'

'হয়তো দেবে। তবে তোমার মা'র শরীর ভাল নেই। জানালায় কুৎসিত চেহারা দেখার কথা শুনতে তার নিশ্চয় ভাল লাগবে না।'

'অঃ।'

'তুমি তো চাও তোমার আম্মি যেন সুস্থ হয়ে ওঠে, না?'

'অবশ্যই চাই।'

'তা হলে এসব আজেবাজে কথা বলে তাকে চিন্তায় ফেলতে হবে না।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে।'

টেবিল থেকে লাফ মেরে নীচে নামল হ্যারি, জোরে বন্ধ করে দিল দরজা। মিসেস ডেভিডসন ওর গমন পথের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকল কয়েক সেকেণ্ড, তারপর মাথা ঝেড়ে চিন্তাটা যেন দূর করে দিতে চাইল, ফিরে গেল কাপড় ধোয়ার কাজে।

দশ

এভারগ্রীন মোটেলের ৯ নম্বর রুমটি ঠাণ্ডা, জানালার পর্দা ঠেলে পর্যাপ্ত আলো ঢুকতে না পারায় ছায়াময়। রায়হান মর্তুজা বিছানার পাশে বসে আছে। দলা পাকানো চাদরে শুয়ে থাকা রমণীর হাত ওর হাতের মুঠোয়।

'গত রাতে ঘরে ফেরনি বলে তোমার জন্য আমার খুব দুশ্চিন্তা হচ্ছিল,' বলল রায়হান।

মার্সিয়া গড়ান দিয়ে মাথা রাখল বালিশে, তাকাল রায়হানের দিকে। মার্সিয়ার গভীর সবুজ চোখের নীচে কালি পড়েছে তবে জ্বলজ্বলে ভাবটা আগের মতই অম্লান।

ও বলল, 'আমি এখন ঠিক আছি। তবে কাল ভয় লাগছিল। মহিলার বাড়ির খুব কাছাকাছি গিয়েছিলাম আমি। দারুণ উত্তেজনা বোধ করছিলাম।'

রায়হান কিছু না বলে মার্সিয়ার কপালের এক গোছা কালো চুলে আদর করে হাত বুলাল।

'ওদের বাড়িটা গাছপালা দিয়ে ঘেরা,' বলে চলল মার্সিয়া।

'আমি ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে ছিলাম। কেউ আমাকে দেখতে পায়নি, শুধু ছোট ছেলেটা ছাড়া। ও কী দেখেছে নিশ্চয়

বুঝতে পারেনি।'

'আমাদের বোধহয় এ ব্যাপারটা ভুলে যাওয়া উচিত... এখান থেকে অন্য কোথাও চলে যাই চলো। তোমার মঙ্গলের জন্যই।'

'ভুলে যাব?!' বিছানায় সিধে হলো মার্সিয়া। ওর সমস্ত শরীর দিয়ে যেন বিচ্ছুরিত হচ্ছে শক্তি। 'কক্ষনো না! আমি এতদিন ধরে অপেক্ষা করে, এত দূর এসেছি ফিরে যাবার জন্য নয়। কাল রাতে যা ঘটেছে এরকম আর যেন কখনও না ঘটে সেদিকে লক্ষ থাকবে আমার। আমি আমার আবেগটাকে সংযত রাখব।'

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ধীরে মাথা দোলাল রায়হান। বিছানা ছাড়ল ও, এগিয়ে গেল জানালায়। পর্দা টেনে নীচে অ্যাসফল্টের পার্কিং লটে তাকাল। সিয়াটলের প্রধান হাইওয়েগুলো থেকে দূরে এভারগ্রীন মোটেল। আর হপ্তার মাঝামাঝি এ সময়ে লোকজনের হাতে কাজকর্মও বোধহয় কম। মাত্র তিনটে গাড়ি পার্ক করা বাইরে। রায়হানের সাদা ফোর্ডের সঙ্গে আরও দুটো গাড়ি। ঝিরঝিরে বর্ষায় পরিত্যক্ত এবং শীতল লাগছে ওগুলোকে।

'বৃষ্টি হলে মুষলধারে বৃষ্টিই ভাল লাগে, এরকম প্যাঁচপেঁচে বৃষ্টি অসহ্য,' বলল রায়হান। 'বাইরে বেরুনো যায় না আবার ঘরে থাকতেও ইচ্ছে করে না।'

'আমরা এখানে আর বেশিদিন থাকব না,' বলল মার্সিয়া। 'তোমার সুহিতা এখন ভয়ে আধমরা। আর আমরা তো এটাই চেয়েছি।'

'তুমি ওকে "আমার সুহিতা" বলছ কেন?'

'দুঃখিত। এমনি মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেছে। তুমি বিরক্ত হলে আর বলব না।'

'হ্যাঁ, আমি বিরক্ত হই। আর এত কথা বলারই বা দরকারটা কী?' জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে রায়হান। 'আমরা যা করতে এসেছি তা শেষ করে চলে গেলেই পারি।'

মার্সিয়া বিছানা থেকে পিছলে নেমে এল, রায়হানের পাশে

এসে দাঁড়াল। 'তোমার কথামতই কাজ হবে, আমার রায়হান।'

মার্সিয়াকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল রায়হান, তবে তাকাল না ওর দিকে।

'এ কাজটা শেষ হলে আমি তোমাকে দারুণ সুখে রাখব, রায়হান। জানি গত কয়েক মাস ধরে নারীত্বের পুরোপুরি সুখ দিতে পারিনি তোমাকে। তবে তোমার পাওনা আমি সুদে-আসলে মিটিয়ে দেব। আমার সঙ্গে আছ বলে তোমাকে আফসোস করতে হবে না, ডার্লিং।' হাতের বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করল মার্সিয়া, এক কদম পেছাল, রায়হানের চোখে চোখ রাখল। 'তুমি আমার সঙ্গে আছ, আছ না, আমার রায়হান?'

'তুমি সে কথা ভাল করেই জান, মার্সিয়া।'

'গুড,' রায়হানের মুখে হালকা চুম্বন করল মার্সিয়া। তারপর সরে গিয়ে কাপড় পরতে লাগল। আবার সিরিয়াস একটা ভাব ফুটল চেহারায়।

'তুমি নিশ্চিত ও তোমাকে শপিংসেণ্টারে দেখেছে?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল রায়হান। 'ও এস্কেলেটারে ওঠার সময় একবার আমাকে দেখেছে, আরেকবার দেখেছে আমি বেরুনোর সময়। পিছু নিয়ে পার্কিং লটে চলে এসেছিল। কিন্তু আমি ওর চোখ ফাঁকি দিয়ে চলে আসি।'

'গুড। ও এসব ভেবে ভেবে মাথা গরম করতে থাকুক আমরা এই ফাঁকে আমাদের আগামী প্ল্যানের বাস্তবায়ন ঘটাব।'

'সেটা কী...?'

'আমরা হত্যা করব ছেলেটাকে।'

নিঃশ্বাস আটকে এল রায়হানের, ধীরে ধীরে শ্বাস ফেলল। 'এ ছাড়া আর কোনও উপায় নেই?'

'এটাই শ্রেষ্ঠ উপায়। মেয়েটাকে পুরোপুরি শেষ করে দেয়ার আগে ওকে চরম মানসিক আঘাতটা এভাবেই দেব।' রায়হানের ওপর স্থির হলো মার্সিয়ার চোখের তারা।

'কেন, তোমার এতে আপত্তি আছে?'

'না, মানে... ছেলেটাকে খুন করব...'

মার্সিয়ার উচ্চকিত হাসি ছোট ঘরটির দেয়ালে বাড়ি খেল।

'তোমার মুখে এ কথা মানায় না, রায়হান। গত তিন বছরে তুমি কী করেছ মনে নেই? কত রক্ত তুমি ঝরিয়েছ? আরেকটা খুন করলে কীইবা এসে যাবে?'

মার্সিয়ার জ্বলজ্বলে চাউনি সহ্য হলো না রায়হানের, চোখ সরিয়ে নিল ও। 'মার্সিয়া, তোমার জন্য আর আমার জন্য কিন্তু একরকম নয়। আজ আমি যা এরজন্য সম্পূর্ণভাবে তুমিই দায়ী। আমি এখনও পুরোপুরি নেকড়ে হয়ে উঠতে পারিনি। আমার ভেতরের মানবিক কিছু গুণ এখনও পুরোপুরি বিনষ্ট হয়ে যায়নি।'

মার্সিয়া সরে এল রায়হানের কাছে, হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করল মুখ। 'আমি তা জানি, ডার্লিং। একটা সময় আসবে যখন কোনও কিছুর জন্য তুমি আর বিচলিত হবে না। ততদিন পর্যন্ত আমার কাছ থেকে শক্তি ধার করতে হবে আমাকে। জানি যখন সময় আসবে, ব্যর্থ হবে না তুমি।'

'কবে...কখন সেই সময় আসবে?'

'এখন থেকে প্রতি রাতে আমরা বাড়িটার ওপর লক্ষ রাখব। ছেলেটাকে যে মুহূর্তে একা পাবে, ওকে হত্যা করবে তুমি।'

এগারো

মি. বজর্কলুণ্ড শ্রাগ করে হাতজোড়া মেলে দিলেন অসহায় ভঙ্গিতে। 'আমি দুঃখিত।'

তিনি আরও কিছু বলবেন এ অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল সুহিতা। কিন্তু মি. বজর্কলুণ্ড কিছু বলছেন না দেখে ওদের দু'জনের মাঝখানের কাঠের লম্বা কাউন্টারে তাকাল। ওখানে পটের মধ্যে রাখা হয়েছে ওর গাছ তিনটে। এখন আর গাছ বলে চেনা যায় না। ফার্ন এবং স্পাইডার প্ল্যান্ট শুকিয়ে কুৎসিত চেহারা ধারণ করেছে। হলুদ-বাদামী রঙের গাছগুলো দেখে বোঝার জো নেই এক সময় এগুলোর গায়ে ঝলমল করত সবুজ পাতা। তবে একগুঁয়ে ফিলোডেনড্রন এখনও হাল ছেড়ে দেয়নি। মরে যাচ্ছে তবু জড়িয়ে ধরে আছে শ্যাওলা পড়া কাঠের খুঁটি, তবে ওর পাতাগুলো হয়ে গেছে বিবর্ণ এবং ম্লান, গায়ে লিভারের অসুখে ভোগা বুড়ো মানুষের হাতের মত বাদামী ছোপ।

'ওদেরকে নিয়ে আর আশা নেই,' বললেন মি. বজর্কলুণ্ড। 'আমার করার কিছু নেই।'

'তবু ধন্যবাদ,' নিস্তেজ গলায় বলল সুহিতা।

'আপনি গাছগুলোকে কী খাওয়াচ্ছিলেন?'

সুহিতা জবাব দিল, 'আমি কিছু খাওয়াইনি। আপনি যে মাটিটা আমার জন্য ব্লেণ্ড করে দিয়েছিলেন ওটাই ওদের খাবার ছিল। আর পানি দেয়ার ব্যাপারেও আমি যথেষ্ট সতর্ক ছিলাম।'

'কেউ ওদেরকে খাইয়েছে,' বললেন মি. বজর্কলুণ্ড। 'ওদেরকে বিষ দেয়া হয়েছে।'

ফাঁকা দৃষ্টিতে মি. বজর্কলুণ্ডের দিকে তাকিয়ে থাকল সুহিতা।

'আমি তিনটে পাত্রেরই মাটি পরীক্ষা করেছি। প্রতিটির মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে হার্বিসাইড পেয়েছি। এ বিষ একটি ডগলাস ফারকেও খুন করতে পারে।'

'এ হতেই পারে না।'

আবার কাঁধ ঝাঁকালেন বর্জকলুণ্ড। 'পরীক্ষায় যা পেয়েছি সেটা আপনাকে জানিয়ে দিলাম।'

'মাটিতে দুর্ঘটনাক্রমে হার্বিসাইড মিশে যেতে পারে না?'

'না। ইচ্ছাকৃতভাবে এবং সতর্কতার সঙ্গে মাটিতে মেশানো হয়েছে এ বিষ। আমার ধারণা কেউ প্লাস্টিক বোতলের মুখ গাছের শিকড়ে ঠেকিয়ে বিষ পাম্প করেছে।'

'কিন্তু এমন কাজ কেউ কেন করতে যাবে?'

'সে আপনিই ভাল জানেন।'

সুহিতা কুঁচকে যাওয়া, বিবর্ণ জিনিসগুলোর দিকে তাকাল যেগুলো এক সময় ওর প্রিয় গাছ ছিল। 'ওরা কি সব...মরে গেছে?'

'নতুন মাটি এবং বিশেষ পুষ্টির ব্যবস্থা করা গেলে ফিলোডেনড্রনটা হয়তো আরও ক'টা দিন টিকতে পারে। তবে আমার মতে ওটার আয়ু শেষ। আপনি বললে আমি ওটাকে বাঁচানোর চেষ্টা করতে পারি।'

'না,' তীক্ষ্ণ গলায় বলে উঠল সুহিতা। 'তার আর দরকার হবে না।' ঘুরল ও, কদম বাড়াল দরজায়।

'এ গাছগুলোর বদলে কি আপনাকে তিনটে নতুন গাছ দেব?' পেছন থেকে হাঁক ছাড়লেন বজর্কলুও।

'না, ধন্যবাদ।'

'এ পটগুলোর কী হবে? এগুলো তো আপনার।'

'আপনি রেখে দিন।' পেছন ফিরে তাকাল না সুহিতা। 'আমার ওগুলো আর কাজে আসবে না।'

মাউন্টলেক টেরেসের বাড়িটি অসহ্যরকম খালি লাগছে সুহিতার কাছে। অস্থিরভাবে বাড়িতে ঘুরে বেড়াচ্ছে ও, হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। ও সবগুলো ঘরে ঢুকেছে শুধু ফ্যামিলি রুম বাদে। ওই ঘরে ওর গাছগুলো ছিল।

গাছগুলো ওর নিজের ছিল। একান্ত আপনার। গাছগুলো মারা গেছে। ওদেরকে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু এমন কাজ কে করবে? এবং কেন? এমন কেউ কাজটা করেছে যে ওর ক্ষতি করতে চাইছে। সে রাতে যে বাড়িতে ঢুকেছিল সে-ই কি কাজটা করেছে?

ব্রায়ান বাড়ি ফিরেছে। সন্দেহের ব্যাপারটা আপাতত মাথা থেকে দূরে সরিয়ে রাখল সুহিতা। স্বামীকে সংক্ষেপে জানাল ওর গাছগুলো একটিও বেঁচে নেই।

ব্রায়ান স্ত্রীর মুড বোঝে। চেহারা দেখেই বুঝতে পারল সুহিতার মন খুব খারাপ। সে সুহিতাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'অনেক দিন এক সঙ্গে বাইরে যাওয়া হয় না। চলো না আজ রাতে টিগল-এ ডিনার করি?'

'কিন্তু তোমার তো কাল কাজ আছে।'

'কাল না হয় একটু দেরি করে অফিসে যাব। তুমি যাবে ডিনারে?'

'যাব,' বলল সুহিতা।

মিসেস ডেভিডসন গলা খাঁকারি দিয়ে ঘরে ঢুকল। 'আপনাদের কি খানা দেব?'

'আমরা বাইরে খাব,' বলল ব্রায়ান। 'তুমি হ্যারির জন্য কিছু একটা রান্না কোরো।'

হাউজকীপার মাথা দুলিয়ে চলে গেল।

'মিসেস ডেভিডসন,' ডাকল ব্রায়ান।

'জ্বী?'

'বাড়ির পেছনের দেয়ালে একটা মই দেখলাম সেদিন। আমি ওটা সরিয়ে রেখেছি।'

সুহিতা ঝট করে ওর দিকে তাকাল।

'মই?' খিক খিক হাসল মিসেস ডেভিডসন। 'নিশ্চয় হ্যারির বন্ধু বেলির কাণ্ড।'

'হ্যারিকে বলে দিও ওর বন্ধুরা কোনও জিনিস ব্যবহার করার পরে যেন আগের জায়গায় রেখে দেয়।'

'বলব,' বলল মিসেস ডেভিডসন।

ঘরের ভেতরটা উষ্ণ কিন্তু সুহিতার শরীর কেঁপে উঠল, যেন শীতল দমকা হাওয়া ঝাপটা মেরেছে গায়ে।

বারো

সেজেগুজে বাইরে যেতে তেমন উৎসাহ বোধ করছিল না সুহিতা। বাইরে ঘুরতে গেলেই সবকিছু বদলে যাবে না। তবে ব্রায়ান যে ওর মন ভাল করার চেষ্টা করছে সে প্রচেষ্টাটুকু ভাল লাগছে সুহিতার। তাই ও ডিনারে যেতে রাজি হয়েছে। ড্রেসিং-টেবিলের সামনে বসে হালকা গোলাপি রঙের লিপস্টিক ঠোঁটে ঘষছে সুহিতা, হঠাৎ বুঝতে পারল ও আসলে বাইরে যাওয়ার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে। ব্রায়ান ঠিকই বলেছে অনেকদিন এক সঙ্গে বেরুনো হয়ে উঠছে না।

সিধে হলো সুহিতা, ক্লজিট ডোরের এক মানুষ সমান লম্বা আয়নায় দেখছে নিজেকে। অনেক দিন পরে শাড়ি পরেছে ও। লাল জর্জেট শাড়িটা ফর্সা, ছিপছিপে শরীরে মানিয়ে গেছে দারুণ। উদার হাতে পারফিউম স্প্রে করল শাড়িতে, ভুরভুরে মিষ্টি গন্ধে ভরে গেল ঘর। নেমে এল নীচে। ব্রায়ান অপেক্ষা করছে ওর জন্য।

ওদেরকে বিদায় দিতে সদর দরজা পর্যন্ত এগিয়ে এল মিসেস ডেভিডসন।

'আমাদের ফিরতে দেরি হতে পারে,' জানাল ব্রায়ান। হাসল সুহিতার দিকে তাকিয়ে। 'ডিনারের পরে কোথাও গিয়ে একটু ডান্স করে আসব।'

সুহিতা ফিরিয়ে দিল হাসি।

'আমি তা হলে আপনাদের জন্য বসে থাকব না?' জিজ্ঞেস

করল মিসেস ডেভিডসন।

'দরকার নেই,' জবাব দিল সুহিতা। 'হ্যারিকে ঠিক সময়ে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে তোমার ছুটি।'

মিসেস ডেভিডসন মৃদু হাসি দিয়ে বুঝিয়ে দিল হ্যারির জন্য ওদেরকে চিন্তা করতে হবে না।

ব্রায়ান সুহিতার একটি হাত পুরে নিল নিজের মুঠোয়। তারপর নুড়ি বিছানো রাস্তায় কদম ফেলে এগুলো গ্যারেজে। মাঝামাঝি এসেছে, দাঁড়িয়ে পড়ল সুহিতা। পার্ক করা সাদা ফোর্ড গাড়িটিতে কেউ নড়ে উঠল যেন। ওই গাড়িটা কার? পড়শীদের কারও গাড়ি যে ওটা নয় সে ব্যাপারে নিশ্চিত সুহিতা।

'কী হলো?' প্রশ্ন করল ব্রায়ান।

'না, কিছু না,' ধীর গলায় বলল সুহিতা। 'একটা নুড়ি ঢুকে গিয়েছিল হিলের মধ্যে, চলো।'

সাদা গাড়িতে কাউকে দেখতে পাচ্ছে না সুহিতা। হয়তো ভুল দেখেছে ও। কেউ হয়তো পড়শীদের বাড়িতে বেড়াতে এসেছে, তার গাড়ি ওটা। ব্রায়ানকে এ ব্যাপারে কিছু বলে ওর মূড নষ্ট করার মানে হয় না।

মিসেস ডেভিডসন দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে দেখল চলে যাচ্ছে অ্যাডামস দম্পতি। ওদের একটু ঘুরে আসা দরকার ছিল, ভাবল সে। তার মাঝেমাঝেই মনে হয় মি.অ্যাডামস অতি মাত্রায় পরিশ্রম করেন। আর মিসেস অ্যাডামসের তো নানান সমস্যা। দরজা বন্ধ করল মিসেস ডেভিডসন। চলে এল ভেতরে।

টিভিতে চার্লিস এঞ্জেলস দেখছে হ্যারি। এ সিরিজের সুন্দরী মেয়েগুলো ওর ভারী পছন্দ। মিসেস ডেভিডসন ওকে সুন্দরী নায়িকাদের সৌন্দর্য উপভোগ করার সুযোগ দিয়ে নিজের ঘরে ঢুকল। টিভি চালিয়ে বেটি ডেভিসের একটি ছবি দেখতে লাগল। দশটা নাগাদ হ্যারিকে শুইয়ে দিল বিছানায়। হ্যারি 'বেরেটা'

দেখার জন্য জোরাজুরি করছিল, পাত্তা দেয়নি হাউজকীপার। ছেলেটাকে শুইয়ে দিয়ে মিসেস ডেভিডসন ফ্যামিলি রুমে, অ্যাডামসদের বড় টিভিতে অর্ধ সমাপ্ত সিনেমাটি দেখতে লাগল।

ছবি শেষ হলো এগারোটায়। শুরু হলো রাতের সংবাদ। মিসেস ডেভিডসন টিভির সুইচ অফ করে দিল। খবরে মারামারি, খুনোখুনি আর প্লেন দুর্ঘটনার সংবাদ ছাড়া আর কিছু থাকে না। মিসেস ডেভিডসন নিজের ঘরের ছোট বাথরুমে ঢুকল। আঁচড়াতে লাগল চুল।

রাত সাড়ে এগারোটার দিকে পরিষ্কার একটি ফ্ল্যানেলের গাউন পরে বিছানায় শুয়ে পড়ল মিসেস ডেভিডসন। মাঝে মাঝে সে ঘণ্টাখানেক টিভিতে জনি কারসন দেখে। তারপর ঘুম এলে ঘুমিয়ে যায়। কিন্তু আজ আর সিরিজটি দেখতে ইচ্ছে করছে না। ক্লান্ত লাগছে।

চোখ বুজল মিসেস ডেভিডসন। উষ্ণ কম্বলের নীচে আরাম লাগছে। স্বামীর মৃত্যুর পরপরই হাউজকীপারের এ চাকরিটি তার কাছে মনে হয়েছিল দেবতার আশীর্বাদ। তার একটি দূরসম্পর্কের বোন ছাড়া কোনও আত্মীয়-স্বজন নেই, একটা কাজ পাওয়া তার জন্য খুব জরুরী ছিল। এ বাড়ি এবং হ্যারি তাকে বেশ ব্যস্ত রাখে। তবে আরও কাজে ব্যস্ত থাকতে চায় মিসেস ডেভিডসন।

মি. ব্রায়ান এবং তার ছেলের জন্য 'হাউজ-মাদার'-এর একটা অবস্থান গড়ে তুলেছিল মিসেস ডেভিডসন। মি. ব্রায়ান বিয়ে করে নতুন বউ ঘরে নিয়ে আসার পরে নিজের অবস্থানটা টিকে থাকবে কিনা এ নিয়ে একটু শংকিতই ছিল মহিলা। মিসেস অ্যাডামসকে প্রথম প্রথম তার পছন্দ হয়নি। সুন্দরী, একহারা গড়নের বাঙালি মেয়েটিকে প্রৌঢ় মি. ব্রায়ানের পাশে ঠিক মানানসই মনে হয়নি তার। হ্যারির সঙ্গে মেয়েটি নিজেকে মানিয়ে নিতে পারবে কিনা ভেবেও দুশ্চিন্তা হচ্ছিল মিসেস ডেভিডসনের।

তবে সুহিতা দারুণভাবে মানিয়ে নিয়েছে সবার সঙ্গে।

চেহারায় খুকী ভাব থাকলেও মিসেস অ্যাডামস কাজেকর্মে দায়িত্বশীলতা এবং পরিপক্বতার পরিচয় দিয়েছে। প্রথম সাক্ষাতেই হ্যারিকে আপন করে নিয়েছে তার নতুন মা।

বিছানায় গড়ান দিয়ে চিৎ হলো মিসেস ডেভিডসন। সব চিন্তা ঝেড়েঝুড়ে ঘুমানোর চেষ্টা করল।

একটা ছায়া স্যাৎ করে সরে গেল তার জানালার সামনে দিয়ে।

ঝট করে বিছানায় উঠে বসল মিসেস ডেভিডসন। তাকাল জানালার পর্দায়।

কিছু নেই ওখানে।

কিন্তু কিছু একটা আছে নিশ্চয়। জানালার বাইরে। দম চেপে কান খাড়া করল হাউজকীপার।

কোনও শব্দ শোনা যাচ্ছে না।

কিন্তু কিছু একটা অবশ্যই ওখানে ছিল। মিসেস ডেভিডসন ছয় বছরের হ্যারি নয় যে রাতের বেলা জানালায় ছায়া দেখার কথা কল্পনা করবে। বিছানা ছাড়ল সে, গায়ে চড়াল রোব, কোমরে বেল্ট বাঁধতে বাঁধতে এগিয়ে গেল জানালায়। পর্দা টেনে সরাল একপাশে। মেঘ কেটে বেরিয়ে আসা চাঁদের আলোয় বাগানের একাংশের গোলাপের ঝাড় আর গ্যারেজের পেছনের অংশটা দেখতে পাচ্ছে মিসেস ডেভিডসন। কেউ বা কিছু ওখানে নেই।

নিজের ঘর ছেড়ে বেরুল মিসেস ডেভিডসন। বাড়ির দরজা-জানালাগুলো পরীক্ষা করে দেখছে। যদিও সে শুতে যাবার আগে এগুলো ভাল করে বন্ধ করে গেছে। লিভিং-রুমে ঢুকেছে মিসেস ডেভিডসন, একটা শব্দ শুনতে পেল।

সদর দরজার বাইরে পা ঘষটানোর শব্দ। দরজার পিপহোল দিয়ে বাইরে তাকাল মিসেস ডেভিডসন। কিন্তু কিছুই চোখে পড়ল না। পিছিয়ে আসছে, বাইরে খসখস আওয়াজ পেয়ে থমকে গেল। তারপর খড়মড় শব্দ। কোনও জানোয়ার যেন থাবা দিয়ে আঁচড়

কাটছে দরজায়।

জানোয়ার? হয়তো কুকুর-টুকুর হবে, ভাবল প্রৌঢ়া। ওর বোনের জার্মান শেফার্ড কুকুরটা কোনওভাবে ছাড়া পেয়ে এখানে চলে এসেছে? কিন্তু মিসেস ডেভিডসনের বোন অনেকদূরে থাকে। কিন্তু কুকুর তো বহু দূরের রাস্তা চিনেও আসতে পারে। হয়তো ওটা কোনও কারণে আহত হয়েছে। দরজা খুলল মিসেস ডেভিডসন।

শূন্যে উড়ে এল নেকড়েটা, শরীরের সমস্ত ওজন নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল মিসেস ডেভিডসনের বুকে। মেঝেয় দড়াম করে আছড়ে পড়ে গেল মহিলা। নেকড়েটা ডিগবাজি খেয়ে ছিটকে গেল হলওয়েতে।

কী ঘটছে তা নিয়ে চিন্তা করার সময় নেই মিসেস ডেভিডসনের। আত্মরক্ষাই তার কাছে এখন প্রধান।

এতবড় নেকড়ে জীবনেও দেখেনি মিসেস ডেভিসন। শক্তিশালী পা জোড়া ভাঁজ করে দাঁড়িয়ে আছে হলওয়েতে। প্রশস্ত, চকচকে মাথাটা ডানে-বামে ঘোরাল, যেন খুঁজছে কিছু একটা।

হাঁচড়েপাঁচড়ে খাড়া হলো মিসেস ডেভিডসন। সদর দরজা এখনও খোলা, হু হু করে ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকছে ঘরে। বাইরে রাত শান্ত এবং পরিষ্কার; ভেতরে বিরাজ করছে আতঙ্ক।

'ভাগো এখান থেকে!' মিসেস ডেভিডসন দুর্বল গলায় ধমক দেয়ার চেষ্টা করল নেকড়েটাকে।

নেকড়েটা মাথা ঘুরিয়ে তাকাল প্রৌঢ়ার দিকে। ওটার ঠোঁট জোড়া পেছন দিকে সরে গিয়ে লম্বা, ধারাল দাঁত বেরিয়ে পড়ল। যেন শয়তানের হাসি হাসছে। গলার গভীর থেকে উঠে এল হুঙ্কার। গর্জনে ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেল মিসেস ডেভিডসন।

'কে ওখানে?' সিঁড়ির মাথা থেকে ভেসে এল হ্যারির কাঁপা, উত্তেজিত কণ্ঠ।

মিসেস ডেভিডসনের ওপর থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে সিঁড়িতে

তাকাল নেকড়ে। মৃদু গর্জন ছেড়ে পা বাড়াল ওদিকে।

ছেলেটাকে রক্ষা করতে হবে, সহজাত এই প্রবৃত্তিতে মিসেস ডেভিডসন দরজার কাছে কাঠের স্টাণ্ডে ঝোলানো একটা ছাতা টেনে নিল বিদ্যুৎবেগে। ওটাকে গদার মত উঁচিয়ে ধরে ছুটল সিঁড়িতে।

'হ্যারি, সরে যাও!' চেঁচাল হাউজকীপার। 'ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে রাখো।'

সিঁড়ির মাথায় ছেলেটির ঘরের দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ হলো। নেকড়েটা কটমট করে একবার তাকাল প্রৌঢ়ার দিকে, দৃষ্টিতে তীব্র ঘৃণা, মিসেস ডেভিডসনের পাশ কাটিয়ে ছুটল সিঁড়ির দিকে। ওটা পাশ দিয়ে যাচ্ছে, মিসেস ডেভিডসন ধাঁই করে হাতের ছাতা দিয়ে নেকড়ের পিঠে বাড়ি মেরে বসল। গতি কমে গেল নেকড়ের। মিসেস ডেভিডসন ঝাঁপিয়ে পড়ল ওটার গায়ে, মাথায় বাড়ি মারল।

হাউজ-কীপারের ভারী শরীরের চাপে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল নেকড়ে, মহিলাকে নিয়ে সিঁড়ির গায়ে আছড়ে পড়ল। পরক্ষণে চার হাত পায়ে দাঁড়িয়ে গেল নেকড়ে, দাঁত বের করে খিঁচিয়ে উঠল।

মিসেস ডেভিসনও টলতে টলতে সিধে হয়েছে, হাতের ছাতাটা তরবারির মত বাগিয়ে ধরল নেকড়েটাকে লক্ষ্য করে। গলা দিয়ে বেরিয়ে আসছে ভয়ার্ত চিৎকার।

মিসেস ডেভিডসন শেষ দৃশ্যটা দেখতে পেল নেকড়েটা মুখ হাঁ করে তার ওপর লাফিয়ে পড়ছে। জানোয়ারের বিশাল শরীরের নীচে অসহায়ভাবে চাপা পড়ল মিসেস ডেভিডসন, নেকড়ের থাবার আঘাতে ছিটকে গেছে ছাতা। নেকড়ে তার নিষ্ঠুর দাঁতগুলো বসিয়ে দিল মহিলার গলায়। শক্তিশালী চোয়ালের চাপে ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল থাইরয়েড কার্টিলেজ, ছিন্নভিন্ন করে দিল স্বরযন্ত্র এবং অন্ত্রনালী। দাঁত ঢুকে গেল প্লাটিজমা মাসলে, ছিঁড়ে ফেলল

কার্টয়েড ধমনী। গলা দিয়ে বারকয়েক ঘরঘর শব্দ বেরিয়ে এল। শেষ মৃত্যু খিঁচুনি দিয়ে স্থির হয়ে গেল দেহ।

ক্ষত-বিক্ষত গলার ওপর থেকে রক্তাক্ত মুখ সরিয়ে নিল নেকড়ে, পিছিয়ে এল লাশের কাছ থেকে। ঘুরল। তারপর ওপরে উঠতে লাগল সিঁড়ি বেয়ে।

তেরো

প্রচণ্ড এক লাফে সিঁড়ির এক-তৃতীয়াংশ দূরত্ব পার হয়ে এল নেকড়ে। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল সে। কী যেন শুনছে কান পেতে। বাইরে পড়শীদের হল্লার আওয়াজ। মিসেস ডেভিডসনের চিৎকার শুনে ছুটে আসছে সুহিতাদের বাড়িতে।

কী করা উচিত ভাবতে গিয়ে দ্বিধায় পড়ে গেল নেকড়ে। রক্তাক্ত মুখটা একবার ফেরাল খোলা সদর দরজায়, তারপর তাকাল ওপরে। ল্যাণ্ডিং-এ ছেলেটির ঘরের দরজা বন্ধ। বন্ধ দরজার পেছনে তারস্বরে চিৎকার করছে হ্যারি। পাতলা কাঠের প্যানেল বিশালদেহী নেকড়ের ওজন বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারবে না, সহজেই দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকতে পারবে সে। কিন্তু বাইরের ধাবমান পায়ের আওয়াজ ক্রমে কাছিয়ে আসছে যে! বাগানে শোনা যাচ্ছে ছুটন্ত পদশব্দ।

চাচা আপন প্রাণ বাঁচা নীতি অবলম্বন করল নেকড়ে। সিঁড়ির ওপর দিয়ে লাফ মারল সে, শরীরটাকে শূন্যে স্বচ্ছন্দে ভাসিয়ে নেমে এল হলওয়ের মেঝেতে। ঠিক ওই সময় একজন পড়শী পৌঁছে গেছে সদর দরজায়। বিরতি দিল না নেকড়ে, ছুটল

লিভিং-রুমে, শূন্যে আবার উড়াল দিল সে, বড় একটি কাচের জানালা লক্ষ্য করে ডাইভ দিয়েছে। বিকট শব্দে ভাঙল কাচ। নেকড়ের শরীর অদৃশ্য হয়ে গেল ভাঙা জানালার ফোকরে। বাড়ি থেকে ভেসে আসছে পড়শীদের চিৎকার, লন ধরে ছুটল নেকড়ে, নিখুঁতভাবে ছেঁটে রাখা ঝাড়ের মাঝ দিয়ে দৌড়াচ্ছে, উধাও হয়ে গেল গাছ-পালার আড়ালে।

রাস্তার ওপাশে, ব্রায়ানদের বাড়িতে ছুটে আসা লোকজনের অলক্ষে, সাদা রঙের একটি ফোর্ড গাড়ির ইঞ্জিন চালু হয়ে গেল, হেডলাইট না জ্বালিয়েই ফুটপাত থেকে দূরে সরে গেল ওটা।

ঘরের ভেতরে শুধু রক্ত আর রক্ত। মিসেস ডেভিডসনের ছিন্নভিন্ন, রক্তের বন্যায় ভেসে যাওয়া লাশ প্রথম দেখল সবার আগে ছুটে আসা পড়শীরা। আতংকে স্তম্ভিত হয়ে গেল তারা। তাদের পেছনে যারা সবেগে ছুটে আসছিল, হঠাৎ ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়া প্রথম দলটির গায়ে তারা হুমড়ি খেয়ে পড়ল। রক্তে পেছল মেঝেতে তাদের পা হড়কে গেল।

এক লোক ঘুরে দাঁড়িয়েই বমি করতে লাগল।

আর্তচিৎকার দিল এক মহিলা।

'লোকটি জানালা দিয়ে পালিয়েছে।' চিৎকার করে জানান দিল একজন।

'ওর পিছু নাও!'

'না, দাঁড়াও। ওর কাছে বন্দুক থাকতে পারে।'

'পুলিশে কেউ ফোন করছ না কেন?'

দলটার সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকা এক মহিলা তার পাশের লোকটিকে বলল, 'খুনীকে দেখে কিন্তু মনে হয়নি ওটা মানুষ। দেখলাম যেন মস্ত একটা কুকুর লাফিয়ে পড়ল জানালা ভেঙে।'

লোকটি মহিলার দিকে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে তাকাল। ভিড় ঠেলে সামনে এগোল লাশটা আরও ভালভাবে দেখতে।

হ্যারির ঘরের দরজা খুলে গেল। হ্যারি ভয়ার্ত চেহারা নিয়ে

পা টেনে টেনে বেরুল ঘর থেকে। দাঁড়াল সিঁড়ির মাথায়। তার মুখ রক্তশূন্য, ফোলা। চোখ বিস্ফারিত। এক লোক মিসেস ডেভিডসনের লাশ ডিঙাল নিঃশব্দে, দৌড়ে গেল সিঁড়িতে। হ্যারিকে কোলে তুলে নিয়ে ওর বেডরুমে ঢুকল।

রাত একটার দিকে বাড়ি ফিরল সুহিতা এবং ব্রায়ান। দেখল ওদের বাড়ির রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে রয়েছে ইমার্জেন্সির গাড়ি। বাড়ির সামনের বাগানে গিজ গিজ করছে মানুষ। স্থানীয় টিভি স্টেশনের মোবাইল নিউজ ক্রু তাদের গাড়ি দাঁড় করিয়েছে ড্রাইভওয়েতে। তাদের ফ্লাডলাইটের আলোয় বাড়ি এবং উঠোন আলোকিত। মাথার ওপরে, শক্তিশালী স্পট লাইট জ্বেলে বৃত্তাকারে এলাকা চক্কর দিচ্ছে সগর্জনে উড়তে থাকা পুলিশের একটি হেলিকপ্টার।

পুলিশের কাঠের ব্যারিকেডে বাধা পেল ব্রায়ানের গাড়ি। লাফ মেরে সে গাড়ি থেকে নামল। ছুটল বাড়ির দিকে, পেছন পেছন সুহিতাও। সদর দরজায় পৌঁছার আগেই কোঁচকানো ইউনিফর্ম পরা এক লোক থামিয়ে দিল ওদেরকে।

'এক মিনিট, সার।'

'এটা আমাদের বাড়ি,' বলল ব্রায়ান। 'আমরা এখানে থাকি। আপনি কে?'

'আমি সিয়াটল পুলিশের লেফটেনেন্ট ম্যাককিনলে। আপনারা কি মি. এবং মিসেস অ্যাডামস?'

'জ্বী, কী হয়েছে?'

'একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে। ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা।'

'ওহ্, খোদা, হ্যারি!' চিৎকার দিল সুহিতা। 'হ্যারির কিছু হয়েছে।'

'ছোট ছেলেটার নাম কি হ্যারি?' বলল লেফটেনেন্ট। 'না, ওর কিছু হয়নি। একজন পড়শী ওকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেছেন।'

‘তা হলে?’ জিজ্ঞেস করল ব্রায়ান।

‘এখানে এক প্রৌঢ়া মহিলা থাকতেন...’

‘মিসেস ডেভিডসন,’ বলল ব্রায়ান। ‘আমাদের হাউজকীপার।’

‘উনি মারা গেছেন, সার। খুন হয়েছেন।’

সুহিতার মনে হলো ওর পা জোড়া হঠাৎ রাবারের পায়ে পরিণত হয়েছে। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। ব্রায়ান ওর কাঁধ জড়িয়ে ধরল এক হাতে যাতে পড়ে-টড়ে না যায়।

‘কীভাবে ঘটল ঘটনা?’ ম্যাককিনলেকে জিজ্ঞেস করল সে।

‘আপনারা একটু ভেতরে চলুন।’ বলল লেফটেনেন্ট। ‘কিছু প্রশ্ন আছে। জবাব শুনলে হয়তো অনুমান করা যাবে কীভাবে ঘটল ঘটনা।’

ব্রায়ান তাকাল সুহিতার দিকে।

‘ঠিক আছে। চলো,’ আবছা গলায় বলল ও।

ব্রায়ান ফিরল লেফটেনেন্টের দিকে। ‘আপনি যা খুশি জিজ্ঞেস করতে পারেন, লেফটেনেন্ট। জবাব জানা থাকলে অবশ্যই উত্তর দেব।’

মিসেস ডেভিডসনের লাশ সরিয়ে ফেলা হয়েছে। তারপুলিন দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে সিঁড়ি গোড়ার মেঝে। তাতে রক্ত অনেকটাই ঢাকা পড়েছে। লেফটেনেন্ট ম্যাককিনলে সুহিতাদেরকে নিয়ে ফ্যামিলি রুমে ঢুকল। ঘর থেকে রক্ত দেখা যায় না।

ব্রায়ান লেফটেনেন্টকে জানাল সন্ধ্যায় বাড়ি থেকে বেরুনোর সময় সবকিছু স্বাভাবিক দেখে গেছে। না, মিসেস ডেভিডসনকে কে হত্যা করতে পারে সে ব্যাপারে ওদের কোনও ধারণাই নেই। হ্যাঁ, মহিলা খুব সাবধানী ছিল। সে সবসময় ঘরের দরজা বন্ধ করে রাখত। না, মিসেস ডেভিডসন কখনও কোনও অচেনা কারও অনুপ্রবেশের কথা ওদেরকে বলেনি।

লেফটেনেন্ট ম্যাককিনলে একটি বাঁধানো খাতায় দ্রুত লিখে নিচ্ছে সুহিতা এবং ব্রায়ানের জবাব।

'আপনাদের বাড়ির আশপাশে কাউকে সন্দেহজনকভাবে ঘুরঘুর করতে দেখেছেন?'

সুহিতা কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল। ওর দিকে তাকাল গোয়েন্দা। 'মিসেস অ্যাডামস?' এক সেকেণ্ডের জন্য ব্রায়ানের কপালে ভাঁজ পড়তে দেখল সুহিতা, পরমুহূর্তে মিলিয়ে গেল ভ্রূকুটি।

'আঃ ইয়ে... একজনকে দেখেছি...তবে এ ঘটনার সঙ্গে ব্যাপারটা সম্পর্কযুক্ত কিনা বুঝতে পারছি না।'

'কী দেখেছেন বললে রহস্য উদ্‌ঘাটনে আমাদের সুবিধে হয়।'

'এক মহিলাকে দেখেছি,' দ্রুত বলতে লাগল সুহিতা। 'বেশ কয়েকবার দেখেছি তাকে। মনে হচ্ছিল সে আমার পিছু নিয়েছে।'

চোখ সরু হয়ে এল ম্যাককিনলের। 'আপনি বলছেন এক মহিলা আপনাকে ফলো করছিল?'

ঠোঁট কামড়াল সুহিতা। তাকাল স্বামীর দিকে। সুহিতার হাত নিজের মুঠোয় পুরল ব্রায়ান।

'এসব জেরা আর কতক্ষণ চলবে?' গোয়েন্দাকে জিজ্ঞেস করল সে। 'আমার স্ত্রী অসুস্থ। তার চিকিৎসা চলছে। ডাক্তার ওর নার্ভের ওপর চাপ পড়ে এমন কিছু থেকে দূরে থাকতে বলেছেন।'

'নার্ভ' শব্দটা শুনে সামান্য আড়ষ্টবোধ করল সুহিতা। 'আমি খুব দ্রুত কাজ সারব,' বলল ম্যাককিনলে। 'উনি যা জানেন তা বললে কিডন্যাপ করতে চাওয়ার এই কেসের সুরাহা দ্রুত করা যাবে।'

'কিডন্যাপ?' প্রশ্ন করল সুহিতা। 'আপনি কি বলতে চাইছেন কেউ হ্যারিকে অপহরণের চেষ্টা করছিল?'

'চেষ্টা করতেই পারে। তো, ওই মহিলার ব্যাপারে আর কী কী জানেন বলুন তো...'

সুহিতা কৃষ্ণকেশী মহিলার চেহারার বর্ণনা দিল, জানাল মহিলাকে ও কফিশপে এবং রাস্তায় দেখেছে। আরেকবার দেখেছে

ট্যাক্সিতে চড়তে।

'প্রতিবার কি একই মহিলাকে দেখেছেন?' জিজ্ঞেস করল গোয়েন্দা।

'জ্বী। আমি প্রায় নিশ্চিত একই মহিলা।'

'প্রায়,' শব্দটা পুনরাবৃত্তি করল লেফটেনেন্ট। তার চোখ থেকে আগ্রহ ফুরিয়ে যেতে দেখল সুহিতা। 'আমরা বিষয়টি তদন্ত করে দেখব,' বলল সে, 'আজ আর কোনও প্রশ্ন নয়।' জামার পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে ব্রায়ানকে দিল। 'হঠাৎ যদি আরও কিছু মনে পড়ে, আমাকে একটা ফোন করবেন।'

নোটবুক বন্ধ করে সিধে হলো ম্যাককিনলে, চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়েছে। ইউনিফর্ম পরা এক অফিসার ঢুকল ঘরে।

'লেফটেনেন্ট, আপনি কি ওই মহিলার সঙ্গে এখন কথা বলবেন? মহিলা বলেছিল সে নাকি একটা জানোয়ার দেখেছে।'

ঝট করে অফিসারের দিকে তাকাল সুহিতা।

'না,' জবাব দিল ম্যাককিনলে, 'মহিলার শুধু বিবৃতি নিলেই চলবে।'

'কীসের জানোয়ার?' জানতে চাইল সুহিতা।

ব্রায়ান ওর দিকে কটমট করে তাকাল।

'আপনাদের এক পড়শী বলছে সে নাকি দেখেছে জানালার কাচ ভেঙে মস্ত কুকুরের মত একটা জন্তু পালিয়ে গেছে।' হাত নেড়ে মাছি তাড়ানোর ভঙ্গি করল লেফটেনেন্ট। 'লোকে হুলস্থুলের মধ্যে কতকিছুই না দেখে।'

'কিন্তু ওটা কি সত্যি জানোয়ার হতে পারে না?' জিজ্ঞেস করল সুহিতা।

মাথা নাড়ল ডিটেকটিভ। 'মহিলা যে সাইজের কুকুরের বর্ণনা দিয়েছে অতবড় কুকুর এ তল্লাটের দু'দশ মাইলের মধ্যেও নেই। তা ছাড়া...' সে খিলানের দিকে তাকাল, ওখানে তারপুলিন দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে রক্ত মাখা মেঝে, 'আমি এমন কোনও কুকুরের

কথা শুনিনি যে এত হিংস্রভাবে মানুষের শরীর ছিন্নভিন্ন করে ফেলতে পারে।'

'কুকুরটা যদি নেকড়ে হয়?' সুহিতা কিছু ভাবার আগেই ফট করে মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল প্রশ্নটা।

'সুহিতা, প্লীজ,' বলল ব্রায়ান।

গম্ভীর গলায় ওর প্রশ্নের জবাব দিল লেফটেনেণ্ট ম্যাককিনলে। 'এরকম হওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই। নেকড়ে থাকে জঙ্গলে। আর এখানে জঙ্গল বলতে আপনাদের বাড়ির ওপাশে কিছু ঝোপঝাড় আর কয়েকটা গাছপালা। ওখানে কাঠবেড়ালির চেয়ে বড় প্রাণীর বাস করার প্রশ্নই নেই। না, আমরা এখানে যাকে খুঁজছি সে একজন পুরুষ। সবল; প্রকাণ্ডদেহী কেউ। সম্ভবত কোনও সাইকোপ্যাথ।'

'আশা করি লোকটাকে আপনারা গ্রেফতার করতে পারবেন, লেফটেনেণ্ট,' গনগনে গলায় বলল ব্রায়ান। 'মিসেস ডেভিডসন আমাদের আত্মীয়র মত ছিল।'

'চিন্তা করবেন না, মি. অ্যাডামস,' বলল, গোয়েন্দা। 'আমরা ওকে ধরবই।'

সুহিতা ওদের সামনে থেকে সরে এল। জানালা দিয়ে দেখল মেঘের আড়ালে চাঁদের লুকোচুরি। *না, লেফটেনেণ্ট,* মনে মনে বলল ও, *একে আপনারা ধরতে পারবেন না। অন্তত এই একজনকে নয়।*

চোদ্দ

পুলিশ, টেলিভিশনের লোকজন, পড়শী আর উৎসাহী দর্শকের দল চলে যাওয়ার পরে প্রতিবেশীর বাড়ি থেকে হ্যারিকে নিয়ে এল ব্রায়ান। ওরা রাতটা কাটাল একটি মোটেলে। পরদিন ব্রায়ান হ্যারিকে ওর ফুপুর বাড়ি নিয়ে গেল। বেলভ্যু'র লেকের ধারে থাকেন ফুপু। তারপর স্বামী-স্ত্রী চলে এল থানায়। লেফটেনেণ্ট ম্যাককিনলের আরও কিছু প্রশ্নের জবাব দিতে হলো। শেষ বিকেলে নিজেদের বাড়ি ফিরল ওরা।

পায়চারি করতে করতে জরুরী গলায় বলতে লাগল ব্রায়ান। 'সবার আগে ভাঙা জানালায় কাচ বসাতে হবে। হল-এ নতুন কার্পেট পাতব। সিঁড়ি এবং দেয়ালও পুরো ধুয়েমুছে সাফ করা দরকার।'

'সব কাজ এখনই করতে হবে?' জিজ্ঞেস করল সুহিতা। 'সংসার তো করতে হবে এবং সেটাই জরুরী,' জবাব দিল ব্রায়ান। 'হ্যারিকে বাসায় নিয়ে এসো। যত দ্রুত সম্ভব সব কিছু স্বাভাবিকভাবে আমি শুরু করতে চাই।'

'না, ব্রায়ান,' মৃদু গলায় বলল সুহিতা। 'এতে কোনও কাজ হবে না। সবকিছু আবার স্বাভাবিক হবে না। সে তুমি যতই চেষ্টা কর না কেন।'

'প্লীজ, সুহিতা, জানি মস্ত একটা ধাক্কা খেয়েছ তুমি। ব্যাপারটা আমার জন্যও কম যন্ত্রণাদায়ক নয়। কিন্তু এ ঘটনা নিয়ে সারাক্ষণ মুষড়ে থাকলে তো চলবে না।'

'তুমি বুঝতে পারছ না?' বলল সুহিতা। 'তুমি জান না কীসে হত্যা করেছে মিসেস ডেভিডসনকে? না, কুকুর নয়, কিংবা কোনও সাইকোপ্যাথের কাজও নয় ওটা।'

'তুমি নিশ্চয় বলতে চাইছ না...'

'হ্যাঁ, তুমি যা ভাবছ আমি তাই বলতে চাইছি। ড্রাগোর নেকড়েগুলো এখানে এসেছে। ওয়্যারউলফগুলো। ওরা এসেছে আমাকে খুন করতে।'

'তুমি আসলে প্রচণ্ড আপসেট হয়ে আছ তাই আবোলতোবাল বকছ। আমি ড. গারফিল্ডকে ফোন করছি। তোমার নার্ভ শান্ত করার ওষুধ দিতে বলব।'

'ড. গারফিল্ড আমার নার্ভ শান্ত করতে পারবেন না। কেউই পারবে না। ওরা আমার খোঁজ পেয়ে গেছে। আমার ঘুম চিরদিনের মত হারাম হয়ে গেছে। মিসেস ডেভিডসনের মৃত্যুর জন্য আসলে আমিই দায়ী।'

'কী পাগলের মত কথা বলছ! কোনও খুনীর কাজ ওটা।'

সুহিতা স্বামীর দুই হাত তুলে নিল নিজের হাতে। 'মিসেস ডেভিডসনকে কোনও মানুষ খুন করেনি, ডার্লিং। আমি জানি তুমি নিজেও জান কথাটা। এখানে যদ্দিন থাকব, বিপদ কাটবে না আমার। বিপদ শুধু আমার একার নয়, তোমার এবং হ্যারিরও।'

'তুমি আসলে কী বলতে চাইছ?'

'বলতে চাইছি আমাকে এখান থেকে চলে যেতে হবে, ব্রায়ান।'

'না,' চেঁচিয়ে উঠল ব্রায়ান।

'আমার কোনও উপায় নেই।'

'কিন্তু...তুমি কোথায় যাবে? কতদিন ঘরের বাইরে থাকবে?'

'এর অবসান না ঘটা পর্যন্ত। আর কোথায় যাব সেটা এখনই তোমাকে না বলাই ভাল।'

'তোমার পরিকল্পনা আমার মনঃপূত হচ্ছে না।'

'প্লীজ, ব্রায়ান। কথা দিচ্ছি, যত দ্রুত সম্ভব তোমাকে জানিয়ে দেব আমি কোথায় আছি। যত কম মানুষ আমার গন্তব্য সম্পর্কে জানবে, আমার পিছু নেয়ার সম্ভাবনা ততই কমবে।'

'আমি তোমার সঙ্গে যাব,' বলল ব্রায়ান। 'এক সঙ্গে লড়াই করব।'

মাথা নাড়ল সুহিতা। 'না, ডার্লিং। হ্যারির সঙ্গে তোমার থাকা দরকার। তোমার শক্তি তার প্রয়োজন।'

'সুহিতা, আমি তোমাকে...এভাবে চলে যেতে দিতে পারি না।'

'কিন্তু আমাকে যেতেই হবে,' বলল ও। 'আমি এখানে থাকা মানে তুমি এবং হ্যারিও ঘোর বিপদের মধ্যে রইবে। তুমি যদি আমাকে সত্যি ভালবাস, ব্রায়ান, দয়া করে বাধা দিও না।'

ব্রায়ান সুহিতাকে জড়িয়ে ধরল। 'যদি তোমাকে ভালবাসি? মাই গড, সুহিতা, পৃথিবীতে তোমার চেয়ে ভাল আমি কাউকেই বাসি না।'

সুহিতা স্বামীর প্রশস্ত বুকে মাথা রাখল। একটা শব্দ শুনল ও যা আগে কখনও শোনেনি। কাঁদছে ব্রায়ান।

পরদিন সকালে সুহিতা সিয়াটল টাকোমা এয়ারপোর্টে গিয়ে ওয়েস্টার্ন এয়ারলাইন্সের লস এঞ্জেলেসগামী প্লেনের একটি টিকেট কিনল। খেয়াল করল না মুখে স্কার্ফ পেঁচানো এক বুড়ি, কাছেই কাগজের ফুল বিক্রি করছিল, এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে ওর দিকে।

পনেরো

ফ্লাইট ঘোষণার কথা শুনে দ্রুত গেটে কদম বাড়াল সুহিতা। নানান লোকজন তাদের বন্ধু বা আত্মীয়-স্বজনকে বিদায় জানাচ্ছে, তাদের দিকে তাকাল না ও। হ্যারির বিস্মিত, ব্যথাতুর মুখখানা ভাসছে এখনও চোখে। আম্মি কয়েকদিনের জন্য বাইরে চলে যাবে শুনে ভয়ানক মন খারাপ করেছে ছেলেটা, ওকে শান্ত করতে বেগ পেতে হয়েছে সুহিতাকে। আম্মি অল্প ক'দিন পরেই বাড়ি ফিরবে, এ প্রতিশ্রুতি পাবার পরে কান্নাকাটি বন্ধ হয়েছে হ্যারির। আশা করি প্রতিশ্রুতিটি আমি রক্ষা করতে পারব, মনে মনে বলল সুহিতা।

প্লেনে নিজের আসন খুঁজে নিয়ে বসল ও। বৃষ্টিস্নাত রানওয়েতে তাকাল। উড়াল দেয়ার জন্য দৌড় শুরু করতে যাচ্ছে বিমান। সুহিতা জানে এভাবে পালিয়ে যাওয়াটা সমস্যার সমাধান নয়। কিন্তু এখানে বসে লড়াই করেও ফায়দা হবে না কোনও। নির্ঘাত হেরে যাবে ও। কিন্তু শুধু নিজের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই তো এটা নয়, ওকে ভাবতে হবে ব্রায়ান এবং হ্যারির কথাও। সুহিতা জানে নেকড়েটা হ্যারিরও ক্ষতি করতে চাইছে। মিসেস ডেভিডসনের সাহসিকতা আর পড়শীরা সময় মত এসে পড়ায় জানে বেঁচে গেছে ছেলেটা। সুহিতা বুঝতে পেরেছে যতদিন ও বাড়িতে থাকবে, ওর স্বামী এবং সন্তান বিপদমুক্ত হতে পারবে না।

টাওয়ার থেকে ক্লিয়ারেন্স সংকেত পেল ওয়েস্টার্ন

এয়ারলাইন্স, বজ্রের শব্দ তুলে ছুটল রানওয়ে ধরে, একটু পরেই গা ভাসিয়ে দিল শূন্যে। খানিক বাদে স্টুয়ার্ডেস এল হাতে প্লাস্টিকের ইয়ারফোন নিয়ে। সংক্ষিপ্ত এ ফ্লাইটে সিনেমা দেখানোর বন্দোবস্ত নেই, তবে রেকর্ড করা স্টেরিও মিউজিক শোনানোর ব্যবস্থা রয়েছে। সুহিতা হালকা ক্লাসিক গানের প্রোগ্রাম চালিয়ে দিল এ আশায় সঙ্গীত ওর মানসিক দুশ্চিন্তা সাময়িকভাবে হলেও দূর করে দেবে।

কিন্তু গান সুহিতার দুশ্চিন্তা দূর করতে ব্যর্থ হলো। চোখ বুজলেই মানসপটে ভেসে উঠছে চুলের মাঝখানে রূপোলি কাটার দাগঅলা মহিলার ছবি। মনে পড়ছে রায়হান মর্তুজাকে, যে মর্তুজা মরে গেছে বলেই জানত সুহিতা। মৃত স্বামী ওকে লক্ষ করছে চলন্ত সিঁড়ির ওপর থেকে, দৃশ্যটা ভয়ানক অস্বস্তির। চোখে ভাসছে ধূসর তারপুলিনে ঢাকা মিসেস ডেভিডসনের রক্তাক্ত ক্ষত-বিক্ষত লাশ।

ড্রাগো নেকড়েগুলো কী করে ওর খোঁজ পেল বুঝতে পারছে না সুহিতা। ও নিশ্চিত হয়ে গেছে ওরা প্রতিশোধ নিতেই ওর পিছু নিয়েছে। ড্রাগো গ্রামটা জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, সেই সঙ্গে অস্বাভাবিক কতগুলো পৈশাচিক প্রাণীর মৃত্যু ঘটেছে, এসবের জন্য ওকেই দায়ী করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই সুহিতার। সবাই মারা গেছে ওই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে... না, সবাই নয়। বেঁচে গেছে রায়হান। সেই সঙ্গে আরেকজন।

মার্সিয়া!

একটা ঝাঁকি খেয়ে সীটে সটান হয়ে বসল সুহিতা, ইয়ার ফোন মাথা থেকে আলগা হয়ে খসে এল।

চোখের সামনে দৃশ্যগুলো ভাসছে এখন—কফি শপের সেই মহিলা, রাস্তায়, এবং ট্যাক্সিতে...মাথার কাটা দাগটা কপাল ছুঁয়েছে, সানগ্লাস খুলে ফেলায় সবুজ চোখজোড়া এক ঝলক দেখতে পেয়েছিল সুহিতা। ওটা মার্সিয়া লুরা ছাড়া কেউ নয়।

কিন্তু তা কী করে সম্ভব? সুহিতা নিজে মহিলাকে গুলি করেছিল, কালো মাদী নেকড়েটার খুলিতে ঢুকে গিয়েছিল সিলভার বুলেট। ওরা কীভাবে বেঁচে গেল জানে না সুহিতা, তবে ওরা যে রায়হান এবং মার্সিয়া সে ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই সুহিতার। ওরা ওকে হত্যা করতে এসেছে।

সীটে আবার গা এলিয়ে দিল সুহিতা, ঝড়ের বেগে চলছে মস্তিষ্ক। ও এখন অন্তত জানে কার বা কীসের বিরুদ্ধে ওকে লড়াই করতে হবে। এখন হয়তো কোনও বুদ্ধি বের করা যাবে। বাবা-মা'র সঙ্গে অল্প ক'দিন থাকবে সুহিতা। মার্সিয়া এবং রায়হান যদি ওকে সত্যি সিয়াটলে দেখে থাকে, ওরা ওকে আবার খুঁজে বের করবে। নিজের কারণে প্রিয়জনের জীবন বিপদাপন্ন করে তুলতে চায় না সুহিতা।

টেলিফোনে বাবা-মাকে শুধু বলেছে সুহিতা যে ও বেড়াতে আসছে। ওঁরা জানতে চেয়েছিলেন ব্রায়ান এবং হ্যারিও আসছে কিনা সঙ্গে। সুহিতা সংক্ষেপে শুধু 'না' বলায় ওঁরা আর কারণটা জানতে চাননি। সুহিতা বাবার বাড়িতে বসে একটা প্ল্যানপ্রোগ্রাম ঠিক করে ফেলবে। সিদ্ধান্ত নেবে এরপরে কী করা যায়। কিন্তু কী যে করবে নিজেই জানে না সুহিতা। কিন্তু কোনও একটা বুদ্ধি তো বের করতেই হবে। সারা জীবন ভয় আর আতঙ্ক নিয়ে বাস করতে পারবে না ও।

স্যান বার্নারডিনো পর্বতমালার ওপর মস্ত একটা বাঁক নিল প্লেন, তারপর নামতে লাগল লস এঞ্জেলেস ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে। বাবা-মা ওয়েস্টার্ন এয়ারলাইন্সের প্যাসেঞ্জার গেট-এ মেয়ের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। মেয়ে বাবা-মাকে দেখে মধুর হাসল।

আবরার চৌধুরী লম্বা, মাথার ফিরফিরে সাদা চুলগুলো সযত্নে আঁচড়ানো। তাঁর স্ত্রী নাঈমা সুলতানা গোলগাল, সুশ্রী চেহারার, পঞ্চাশ ছুঁইছুঁই। তাঁর চোখের তারায় ফুটে আছে হাসির রেখা।

প্লেনের ওয়াকওয়ে ধরে হেঁটে আসছে একমাত্র কন্যা, মা ছুটে গেলেন মেয়েকে আলিঙ্গন করতে। পেছন পেছন এলেন আবরার চৌধুরী, অভিজাত এবং নিয়ন্ত্রিত, তবে চোখ ভরা অপত্য স্নেহ যেন গলে গলে পড়ছে।

পার্কিং লটের দিকে তিনজনে মিলে পা বাড়াল, ওখানে আবরারের বুইক দাঁড় করানো। সুহিতা স্বাভাবিক আচরণ করার চেষ্টা করল, বুঝতে দিতে চায় না কী ঝঞ্ঝা বয়ে যাচ্ছে ওর ওপর দিয়ে। বর্তমান সিয়াটল এবং লস এঞ্জেলেসের আবহাওয়ার পার্থক্য নিয়ে কথা বলল ওরা, আলোচনা করল ব্রায়ান এবং হ্যারিকে নিয়ে, সুহিতার আকাশ-ভ্রমণ কেমন হলো জানতে চাইলেন ওঁরা।

ব্রেণ্টউডে, বাবার বাড়ি যাওয়ার পথে গাড়িতে আর তেমন কথা হলো না, একটা অস্বস্তিকর নীরবতা জগদ্দল পাথর হয়ে চেপে বসে রইল তিনজনের মাঝে। আবরার চৌধুরী মেয়ের সঙ্গে দেখা হলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলতে ভালবাসেন, মেয়ের গম্ভীর মুখ দেখে আর এ প্রসঙ্গ তুললেন না।

সুহিতার মা পেছনের আসনে বসেছেন, সুহিতা বাবার সঙ্গে সামনের সীট দখল করেছে। মিসেস সুলতানা সামনে ঝুঁকলেন, একটা হাত রাখলেন মেয়ের কাঁধে।

'তোর কী হয়েছে, মা?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

মা'র হাতে মৃদু চাপড় দিল সুহিতা। কণ্ঠ স্বাভাবিক রাখতে চাইল, 'কিছু হয়নি, মা। আমি ভালই আছি।'

'কিন্তু তোর চেহারা দেখে তো মনে হচ্ছে না ভাল আছিস।' বললেন নার্গিমা। 'কিছু নিয়ে টেনশন করছিস নাকি?'

মাকে ছেল ভুলানো কিছু কথা বলতে গেল সুহিতা, কিন্তু গলায় আটকে গেল শব্দগুলো। শেষে বলল, 'সিরিয়াস কিছু না। ডাক্তার বলেছেন আমার নার্ভগুলো আবার উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। তাই ভাবলাম তোমাদের এখানে ক'টা দিন বেড়িয়ে গেলে হয়তো

উত্তেজিত নার্ভ শান্ত হবে।'

'ওই স্বপ্নগুলো আবার দেখছিস, না?' জিজ্ঞেস করলেন সুহিতার বাবা। রাস্তা থেকে এক সেকেণ্ডের জন্য চোখ সরিয়ে নিয়ে এক ঝলক দেখলেন মেয়েকে।

'হুঁ,' স্বীকার করল সুহিতা। 'আরও কিছু ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু এসব নিয়ে কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। অন্তত এ মুহূর্তে নয়।'

'ঠিক আছে,' বললেন নাঈমা সুলতানা। 'তোর যখন ইচ্ছে বলবি। আর যদ্দিন ইচ্ছা থাকতে পারিস। কোনও কিছু দরকার হলেই বলবি।'

ঘাড় ঘুরিয়ে মা'র দিকে তাকিয়ে হাসল সুহিতা। 'বলব।' বাবার দিকে ফিরল ও, হাত দিয়ে স্পর্শ করল আবরারের বাহু। 'তোমরা খুব ভাল, বাবা। তোমাদের মত বাবা-মা যার আছে তার অন্য কিছুর দরকার হয় না।'

যাত্রার বাকি অংশটুকু কাটল টুকটাক কথাবার্তায়। ওরা চলে এল অ্যালস্টেয়ার ড্রাইভের প্রকাণ্ড বাড়িতে। ওদের বাড়িটা আগের মতই আছে, একটুও বদলায়নি দেখে খুশি হলো সুহিতা। বহুদিন পরে ও বাড়ি ফিরেছে।

বাড়ির পেছনে, দোতলায় নিজের ঘরে গেল সুহিতা। ঘরটি ওর নানান স্মৃতি ফিরিয়ে আনল। হাইস্কুল জীবনের বান্ধবীদের সঙ্গে ওর বাঁধানো ছবিটি এখনও আছে টেবিলে। ওই সময় বিটলসদের সাংঘাতিক ভক্ত ছিল সুহিতা। ঘরময় তাদের পোস্টারগুলো এখনও অমলিন। তারপর ড্রাগো'র সেই ভয়ঙ্কর স্মৃতিগুলো ভিড় করল মনে। ঘরের ছায়াময় জায়গাগুলোতে যেন ঘাপটি মেরে রয়েছে সেইসব স্মৃতি।

সুহিতা ওর সুটকেস খুলল। অল্প কিছু জামা-কাপড় আর নিজের ব্যবহার্য নিয়ে এসেছে ও। দুশ্চিন্তাগুলো জোর করে দূর করে দিতে চাইল মন থেকে।

বাড়ি ফেরার তিনদিন পরে, রাতে, খাবার টেবিলে বাবার বলা

একটি জোকস শুনে উচ্চকিত গলায় হাসল সুহিতা। অবাক হয়ে লক্ষ করল ও এখন আগের চেয়ে রিল্যাক্স বোধ করছে। বহুদিন পরে এমন প্রাণখোলা হাসি হাসতে পারল ও। বুঝতে পারছে এ ক'টা দিন কী সাংঘাতিক মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে ছিল ও। বাড়ি এসে ঠিক কাজটিই করেছে। কিন্তু ওই রাতেই ভুল ভেঙে গেল সুহিতার।

নেকড়ের ডাক শুনতে পেল সুহিতা। আধো ঘুম, আধো জাগরণে ভাবল স্বপ্ন দেখছে। বিছানায় উঠে বসল ও, তাকাল জানালার বাইরে–ঘরে ধূসর, আয়তাকার একটি ছায়া। বসে রইল সুহিতা, মনে মনে প্রার্থনা করল ছায়াটা যেন স্বপ্ন হয়। আবার ডাকটা শুনল ও। মায়া নেকড়ে ডাকছে। গভীর, প্রলম্বিত যন্ত্রণাকাতর আর্তনাদ। কোথায় বসে ডাকছে বোঝা যাচ্ছে না, মনে হচ্ছে চারদিক থেকে ভেসে আসছে। ক্রমে কাছিয়ে আসছে। ওরা আবার সুহিতার খোঁজ পেয়ে গেছে।

ওই রাতে আর ডাকল না ওয়্যারউলফ, কিন্তু সারারাত দু'চোখের পাতা এক করতে পারল না সুহিতা। ভোরের দিকে চরম ক্লান্তি ভর করল দেহে, নার্ভগুলো ক্ষত-বিক্ষত।

নাশতার টেবিলে সুহিতাকে লক্ষ করলেন ওর মা। মেয়ের বিধ্বস্ত চেহারা, চোখের কোলে কালি কিছুই নজর এড়াল না তাঁর।

'কাল রাতে ঘুমাসনি?' জিজ্ঞেস করলেন মিসেস চৌধুরী।

'না,' জবাব দিল সুহিতা। 'হজমে বোধহয় গোলমাল হচ্ছিল। রোস্টটা বেশি খাওয়া উচিত হয়নি।'

ওর কথা শুনে হাসলেন না নাঈমা। মেয়ের ওপরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এক পলকের জন্যও সরেনি।

'কুকুরের ডাকে বোধহয় ঘুমাতে পারিসনি,' বললেন তিনি।

'কুকুর?'

'কেউ হয়তো কুকুরটাকে ঘরে আটকে রাখতে ভুলে

গিয়েছিল। রাত দু'টোর সময় ডাকাডাকি করে ঝালাপালা করে দিয়েছে কান,' তারপর নিরাসক্ত গলায় প্রশ্ন, 'কেন, তুই শুনিসনি?'

শুনেছি তো অবশ্যই, মনে মনে বলল সুহিতা। তবে ওটা কুকুরের ডাক ছিল না। এ নিয়ে মা'র সঙ্গে কথা বলে কোনও লাভ নেই। মুখে বলল, 'না, আমি কিছু শুনতে পাইনি।'

চেহারা দেখেই বোঝা যায় মেয়ের জবাবে সন্তুষ্ট হতে পারেননি মা। তবে বিষয়টি নিয়ে আর কথা বাড়ালেন না।

পরোটা, হালুয়া আর আলুভাজি করেছেন নাঈমা সুহিতার জন্য। নাশতায় সুহিতার প্রিয় খাবার, কিন্তু ওর খিদেটা মরে গেছে। প্রায় কিছুই খেতে পারল না। মা ওকে লক্ষ করছেন, তাই পরোটা আর আলুভাজা সামান্য খেয়ে প্লেটটা ঠেলে সরিয়ে দিল সুহিতা। নাঈমা আপত্তি করে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, বাধা পেলেন ডোরবেলের শব্দে।

মিসেস সুলতানা নিজেই চেয়ার ছাড়লেন দরজা খুলে দিতে। মা'র পেছন পেছন লিভিং-রুমে চলে এল সুহিতা। ওদের পড়শী মিসেস জিপসন এসেছেন। স্থূলকায়া মহিলার চোখেমুখে উত্তেজনা।

সুহিতার সঙ্গে সংক্ষিপ্ত সৌজন্য সম্ভাষণ সেরে নাঈমার দিকে ফিরলেন মিসেস জিপসন।

'কালরাতের ভয়ঙ্কর ঘটনাটার কথা শুনেছেন? স্ট্রোভালদের ঘটনা?'

'না তো!'

'কে যেন মেরে ফেলেছে জোরা স্ট্রোভালের ঘোড়াটাকে।'

'কী! ওই সুন্দর ঘোড়াটাকে?'

'শুধু তাই নয়। ঘোড়াটাকে এমন নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে যদি দেখতেন! ওটার গলার নলি ছেঁড়া, পেট চিরে বের করে ফেলা হয়েছে নাড়িভুঁড়ি। ওই বাড়িতে পুলিশ এসেছে। বলেছে এমন ভয়ানক হত্যাকাণ্ড জীবনেও দেখেনি তারা। বলল কোনও

ম্যানিয়াকের কাজ এটা। কয়েক বছর আগে এক উন্মাদ এভাবে হত্যা করত গরু-বাছুর।'

সুহিতার দিকে উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন মিসেস নাঈমা। 'কাজটা কার ধারণা করতে পেরেছে পুলিশ?' প্রশ্ন করল সুহিতা।

'ওরা জানে না। যদিও বলছে কিছু ক্লু পেয়েছে। কিন্তু এরকম তো ওরা বলেই থাকে। কী যে ভয়ঙ্কর দৃশ্য। লাশের কাছে কাউকে ঘেঁষতে দিচ্ছে না পুলিশ। বেচারী জোরা একদম ভেঙে পড়েছে। ঘোড়াটা ওর খুব প্রিয় ছিল।'

আর সহ্য হলো না সুহিতার। চলে এল ওখান থেকে। ঢুকল নিজের ঘরে। জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা শুরু করে দিল। যে ভয়টা ও করছিল, তা-ই ঘটেছে। ড্রাগোর নেকড়েরা আবার খোঁজ পেয়ে গেছে ওর। ঘোড়াটাকে কে হত্যা করেছে ভাল করেই জানে সুহিতা। ওকে আবার পালাতে হবে।

হঠাৎ নিজেকে খুব অসহায় লাগল সুহিতার। ধপ করে বসে পড়ল বিছানায়। মার্সিয়া লুরা আর রায়হান মর্তুজার ভয়ে এভাবে আর কতদিন পালিয়ে বেড়াবে ও? পালিয়ে গিয়েও তো লাভ হচ্ছে না। ওরা গন্ধ শুঁকে ঠিকই হাজির হয়ে যাচ্ছে। সুহিতার সন্ধান পেতে ওদের মোটেই সমস্যা হচ্ছে না। একদিন সময়-সুযোগ বুঝে হামলা চালাবে।

সিধে হলো সুহিতা। তাকাল আয়নায়। চোখ মুছল, সর্দি ঝাড়ল রুমালে। এসব ছাড়ো মেয়ে, মনে মনে নিজেকে বলল ও। এখন ঘুরে দাঁড়িয়ে লড়াই করতে হবে তোমাকে। প্রতিজ্ঞাটা মনে সাহস যোগাল। তবে জানে একা ও ওদের বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারবে না। যে ভয়-ভীতির মাঝ দিয়ে ও যাচ্ছে, সে ব্যাপারটি কেউ পুরোপুরি উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হলে ওকে সাহায্যও করতে পারবে না। গোটা দুনিয়ায় একজন মানুষই এখন ওকে সাহায্য করতে পারবে। আগেও একবার সাহায্য করেছিল। সাগর চৌধুরী।

ষোলো

সকালে পুরানো নোটবই ঘেঁটে সাগর চৌধুরীর একটা ফোন নাম্বার বের করল সুহিতা। মেরিনা ডেল রেতে, সার্ফ কিং নামে একটি সিঙ্গল কমপ্লেক্সের ঠিকানা আছে ওতে। তিন বছর আগে এখানেই থাকত সাগর। কিচেনের ফোন দিয়ে ফোন করল সুহিতা।

বারকয়েক ক্লিক ক্লিক শব্দ শেষে একটি মহিলা কণ্ঠ ভেসে এল: *যে নাম্বারে আপনি ফোন করেছেন ওটা এখন বন্ধ আছে। প্লীজ, ফোন ডাইরেক্টরি দেখে নির্ভুল নাম্বার সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে আবার ফোন করুন।*

রেকর্ড করা পরামর্শ মাফিক কাজ করল সুহিতা। আবারও একই কৃত্রিম কণ্ঠ পুনরাবৃত্ত হলো। হতাশ হয়ে ঠাস করে রিসিভার নামিয়ে রাখল সুহিতা। এমনটাই ঘটার আশঙ্কা করেছিল ও। প্রায় তিন বছর ধরে সাগরের সঙ্গে যোগাযোগ নেই ওর। সাগর বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যেতেই পারে। তবু ওই বাড়িতে গেলে সাগরের নতুন ঠিকানা হয়তো পেয়েও যেতে পারে সুহিতা। আশা ছাড়তে চাইল না ও। বাবার কাছ থেকে গাড়ির চাবিটা চেয়ে নিল। বেরিয়ে পড়ল বাড়ি থেকে। তখন প্রায় দুপুর।

বুইকটা খারাপ নয়। মসৃণ গতিতে চলছে অ্যাসফল্টের রাস্তা ধরে। সানদিয়েগো ফ্রীওয়ে ধরে এগোল সুহিতা, কালভার সিটি পার হয়ে মোড় নিল মেরিনার দিকে।

চারটে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত অ্যাপার্টমেন্ট ভবন নিয়ে গড়ে উঠেছে সার্ফ কিং। প্রতিটি ভবনের রয়েছে সুদৃশ্য ব্যালকনি।

'ভিজিটর্স' লেখা একটি জায়গায় গাড়ি দাঁড় করাল সুহিতা। পাম গাছে ঘেরা প্রবেশপথ দিয়ে কমপ্লেক্সে প্রবেশ করল ও। লাল রঙের উঠোন পার হলো, পাশ কাটাল অলিম্পিক সাইজের সুইমিং-পুল। পুলে গোসল করছে তরুণ-তরুণীর দল, কেউ কেউ তীরে প্রায় উলঙ্গ শরীরে শুয়ে উপভোগ করছে রোদ। সুহিতা হেঁটে যাচ্ছে, ওদের অলস চোখ অনুসরণ করল ওকে। পাত্তা দিল না সুহিতা, সার বাঁধা বাষ্পীয় স্নানঘর আর জাকুজ্জি পার হয়ে এগোল ম্যানেজারের আপ্যার্টমেন্টে।

বাযারে আঙুল দিয়ে চাপ দিল সুহিতা, পেশীবহুল শরীরের, মুখ ভর্তি কালো দাড়ি, টিশার্ট পরা এক যুবক খুলে দিল দরজা।

'হাই,' বলল সে, 'আমি রন।'

'হ্যালো–' শুরু করতে যাচ্ছিল সুহিতা। ওকে কথা শেষ করতে দিল না রন, 'আপনি একদম ঠিক সময়ে এসে পড়েছেন,' কলকল করে উঠল সে, 'একটা ঘর খালি আছে আমাদের। মানে আগামী হপ্তায় খালি পাবেন। ঘরটা ভালই লাগবে আপনার। ব্যালকনি আছে, আছে ডিশ ওয়াশার, ওয়েটবার, সোফাটাকে খুলতেই কুইন সাইজ বেডে পরিণত হয়। দেখবেন একবার?'

'না, ধন্যবাদ,' বলল সুহিতা। 'আমি ঘর ভাড়া নিতে আসিনি।

মিলিয়ে গেল রনের মুখের হাসি।

'আমি একজনের খোঁজে এসেছি। এখানেই থাকে। মানে থাকত আর কী। ওর নাম সাগর চৌধুরী।'

কপালে ভাঁজ পড়ল ম্যানেজারের। 'সাগর চৌধুরী? নামটা শুনেছি বলে মনে হচ্ছে না। এখানে দুশো লোকের বাস। আসছে-যাচ্ছে। তবু ভাড়াটেদের তালিকাটা একবার দেখছি।'

একটি ডেস্কে বসল সে, অসংখ্য নাম লেখা একতাড়া কাগজ বের করল। অনেকের নামের পাশে কাটা চিহ্ন। নামগুলোতে চোখ বুলাল রন।

'নাহ্, সরি। এখানে সাগর চৌধুরী নামে কেউ থাকে না।'

'নিশ্চয়ই চলে গেছে,' বলল সুহিতা। 'আমি জানি তিন বছর আগে ও এখানেই থাকত।'

'গত তিন বছরে বহু মানুষ এসেছে এবং চলে গেছে,' বলল ম্যানেজার। 'আমি এ চাকরিতে যোগ দিয়েছি মাত্র চারমাস হলো।'

'আপনি কি একবার দয়া করে রেকর্ডটা দেখবেন?' অনুরোধ করল সুহিতা। 'আপনাদের তো রেকর্ড থাকার কথা।'

'আছে। তবে ওগুলো এখন তালা মারা।'

পুরুষ ভোলানো বিখ্যাত হাসিটি ঠোঁটে ফোটাল সুহিতা। 'আপনি যদি আমার জন্য একটু কষ্ট করে রেকর্ডটা চেক করে দেখতেন। ব্যাপারটা খুব জরুরী।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও চেয়ার ছাড়ল যুবক, অদৃশ্য হয়ে গেল পাশের ঘরে। সুহিতা বড়সড় একটি সোফায় বসে অপেক্ষা করতে লাগল। ভাবল এ সোফা খুললে নির্ঘাত এটা কুইন সাইজ বিছানায় পরিণত হবে। অনেকক্ষণ পরে হাতে খতিয়ান বই টাইপের একটি খাতা নিয়ে ঘরে ঢুকল ম্যানেজার।

'আপনি ঠিকই বলেছেন,' বলল সে। 'সাগর চৌধুরী তিন বছর আগে ৩১৪ সি-তে থাকতেন। গত এপ্রিলে তিনি চলে গেছেন।'

সুহিতা মনে মনে হিসেব করল লাস ভেগাসে ওদের মাঝে মনোমালিন্য হবার কিছুদিন পরে বাড়ি ছেড়েছে সাগর।

'ও কোথায় গেছে?' জানতে চাইল সুহিতা।

খাতায় চোখ বুলাল রন। 'এখানে ঠিকানা লেখা নেই।'

'কিন্তু ঠিকানা তো থাকতেই হবে,' আতঙ্কে কেঁপে গেল সুহিতার কণ্ঠ।

'কিন্তু নেই,' বলল রন, 'ভাড়াটে কোথায় যাবেন না যাবেন তার ঠিকানা দিতে তিনি বাধ্য নন। এ লোককে যদি এতই দরকার হয় আপনার, গোয়েন্দা ভাড়া করুন না। সে খুঁজে বের করবে।'

কিন্তু সে সময় আমার নেই, মনে মনে বলল সুহিতা। সাগরকে আমার এখন দরকার, আজই, কোন কিছু ঘটে যাওয়ার আগেই।

'কী হলো?'

সংবিৎ ফিরে পেল সুহিতা ম্যানেজারের ডাকে। ও এতক্ষণ ফাঁকা দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল যুবকের দিকে। মাথা নেড়ে চেষ্টাকৃত হাসি ফোটাল মুখে। 'না, কিছু না। সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ।' চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়াল। 'আমাদের ঘরটা সত্যি একবার ঘুরে দেখবেন না? আমরা টেনিস কোর্ট বানাচ্ছি, এখানে হপ্তায় তিন দিন পার্টি হয়।'

আরেকবার মাথা নাড়ল সুহিতা, চলে এল সার্ফ কিং থেকে। বুইকের ড্যাশবোর্ডের ঘড়ি জানান দিচ্ছে দিনের অর্ধেক শেষ। সাঁঝ নামার আগেই সাগর চৌধুরীকে খুঁজে পেতে হবে।

এরপর বিমানবন্দরের কাছে, ইঙ্গলউডে টেকট্রন ইঞ্জিনিয়ারিং-এ গেল সুহিতা। ভেতরে ঢুকল। ছোট অফিসে বসে কথা বলল পার্সোনেল ম্যানেজারের সঙ্গে।

'সাগর চৌধুরী টেকট্রন ছেড়েছে বছর দুই আগে,' জানাল ম্যানেজার।

বুকের ভেতরটা হঠাৎ ফাঁকা লাগল সুহিতার।

'দীর্ঘদিনের ছুটি নিয়েছিল সাগর। ছুটি শেষে যখন কাজে যোগ দিল ওকে আর আগের চেহারায় পাইনি আমরা। কেমন অস্থিরতায় ভুগত সবসময়। ও চলে যাওয়ায় আমরা সবাই খুব কষ্ট পেয়েছিলাম। এখানকার সবাই পছন্দ করত সাগরকে। কিন্তু কাজে আর মন বসাতে পারছিল না ও। বলত ওর আরও স্বাধীনতা দরকার। তারপর একদিন হুট করে ছেড়ে দিল চাকরিটা।'

কী জবাব পাবে জানে সুহিতা তবু সাহস করে করেই ফেলল প্রশ্নটা। 'ও কোথায় গেছে জানেন?'

'জানি।'

দপ করে আশার আলো জ্বলল সুহিতার বুকে।

'সাগরের সঙ্গে ওয়াল্টার মরিস নামে এক লোক কাজ করত। তারা দু'জনে মিলে পার্টনারশিপে নিজেদের কনসাল্টিং ফার্ম চালু করেছিল। চমৎকার একটা টীম। সাগর উৎসাহ-উদ্দীপনা আর সৃজনশীল চিন্তাভাবনার যোগানদাতা ছিল আর প্রাকটিকাল কাজগুলো করত মরিস।'

'ওরা কি এখনও ব্যবসায় আছে?'

'আছে। এবং ভালই চালাচ্ছে ব্যবসা। আমরা সমস্যায় পড়লে এখনও মাঝেমধ্যে ডাকি ওদেরকে।'

ম্যানেজার সুহিতাকে উত্তর হলিউডের একটি ঠিকানা লিখে দিল। সুহিতা লোকটাকে ধন্যবাদ দিয়ে দ্রুত উঠে পড়ল বুইকে। দুপুর গড়িয়ে এখন বিকেল। সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে দ্রুত।

ল্যাঙ্কারশিম বুলেভার্ডের একতলা ভবনটির মাথায় একটি সাইনবোর্ডে বড় বড় অক্ষরে লেখা **S and W Engineering consultants** বিল্ডিং-এর সামনে সরল রৈখিক একটা জায়গায় বেশ কয়েকটা গাড়ি পার্ক করা। আশা নিয়ে গাড়িগুলোর ওপর চোখ বুলাল সুহিতা যদি সাগরের টকটকে লাল রঙের কামারো গাড়িটা দেখা যায়। কিন্তু গাড়িটা নেই ওখানে। হয়তো আরেকটা গাড়ি কিনেছে সাগর, নিজেকে বোঝাল সুহিতা।

রিসেপশন ডেস্কে বসা চেস্টনাট স্বর্ণকেশীটি সুহিতার দিকে তাকিয়ে হাসল।

'মি. চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি,' বলল সুহিতা।

'মি. চৌধুরী নেই,' বলল মেয়েটি। 'মি. মরিসের সঙ্গে দেখা করলে চলবে?'

আবার নিঃশেষিত মনে হলো নিজেকে। বাস্তব জীবনে কাউকে খুঁজে পাওয়া যে কী কঠিন! সিনেমায় একটা ফোন করলেই

কাঙ্ক্ষিত মানুষটির খোঁজ মেলে। 'চলবে,' জানাল সুহিতা।

ওয়াল্টার মরিস লম্বা, বাদামী, ঝাঁকড়াচুলো। চোখে কালো রিমের প্লাস্টিক গ্লাসের চশমা, অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে কথা বলল সুহিতার সঙ্গে।

'সাগরের সঙ্গে আপনার দরকার আছে?' জিজ্ঞেস করল সে।

'জ্বী,' জবাব দিল সুহিতা। 'তবে ব্যক্তিগত দরকার।'

মরিস ঘরের দূরপ্রান্তে মেলে দিল দৃষ্টি। 'সাগর এ মুহূর্তে ছুটিতে আছে। আপনি ওর বান্ধবী হলে নিশ্চয় জানেন অবসরটা সে ঘুরে বেড়াতে পছন্দ করে।'

'জানি,' দ্রুত বলল সুহিতা। 'ও এখন কোথায় আছে বলা যাবে?'

অস্বস্তি ফুটল মরিসের চেহারায়। 'আহ্, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না আমার বলা উচিত হবে কি না...'

'আপনি নিশ্চিত থাকুন,' বলল সুহিতা, 'এর মধ্যে কোনও প্রেম-পিরিতির ব্যাপার নেই। আমার ব্যক্তিগত প্রয়োজনের সঙ্গে সাগরের ব্যক্তিগত জীবনের কোনও সম্পর্ক নেই।'

স্বস্তির হাসি ফুটল মরিসের মুখে। 'সরি, আপনার মত সুন্দরী কেউ এসে যদি সাগরের খোঁজ করে তা হলে আমার ভাবাটা অমূলক নয় যে...যাকগে, কিছু মনে করবেন না। ও এ মুহূর্তে মেক্সিকোয় রয়েছে। মাযাটলানের একটি হোটেলে। হোটেলের নাম প্যালেসিও ডেল মার।'

'ধন্যবাদ,' বলল সুহিতা। 'ভয় নেই, আমি সাগরকে কোনও বিপদে ফেলব না।'

'ওহ্, একটা কথা বলতে ভুলে গেছি,' বলল মরিস। 'সাগর ওখানে একা নেই।'

সুহিতা একটু ইতস্তত করে বলল, 'সাগরকে যদ্দূর জানি সে কখনও সঙ্গীহীন হয়ে কোথাও ছুটি কাটাতে যায় না।'

ব্রেণ্টউডে ফিরতে ফিরতে শেষ বিকেল। সানসেট বুলেভার্ডে

এসে ট্রাফিক জ্যামে আটকা পড়ল সুহিতা। নীরবে গালাগাল দিল ও জ্যামকে। বাড়ি ফিরতে দেরি হয়ে যাচ্ছে। আরেকটু পরেই নেমে আসবে সাঁঝের আঁধার। আর রাত মানেই ওয়্যারউলফের রাজত্ব।

বাবার বাড়ি পৌঁছেছে সুহিতা, ততক্ষণে সান্তা মোনিকা পর্বতমালার পেছনে বিদায় নিয়েছে অস্তগামী সূর্য। অন্ধকারের পর্দাটা নেমে এল ঝপ করে। সুহিতা গাড়ি রাখল গ্যারেজে। বাইরে দাঁড়িয়ে নামিয়ে দিল গ্যারেজের দরজা, তারপর পা বাড়াল বাড়িতে। আধাআধি পথ এসেছে, হঠাৎ জমে গেল ও।

একটা শব্দ শুনেছে সুহিতা।

ঝোপের আড়ালে নড়াচড়া করছে কিছু একটা।

ভয়ার্ত দৃষ্টিতে ওদিকে তাকাল সুহিতা। গাঢ় কালো একটা কাঠামো দেখতে পেল ও। ছায়ার মাঝ দিয়ে এগিয়ে আসছে আরেকটা ছায়া। কিন্তু কী ওটা তা ঠাহর করতে বিন্দুমাত্র সময় লাগল না সুহিতার।

অসাড় হয়ে আসছে শরীর, গায়ের সমস্ত শক্তি জড়ো করে দৌড় দিল সুহিতা। *ও খোদা, দয়া করো, দরজাটা যেন খোলা থাকে!* নিরেট ওক কাঠের গায়ে দড়াম করে বাড়ি খেল সুহিতা, এক সেকেণ্ডের জন্য হাতড়াল দরজার নব, পিচ্ছিল হাতে ঘোরাল নব, প্রায় এলিয়ে পড়ল ঘরের মধ্যে।

লিভিং-রুমে বসেছিলেন মি. এবং মিসেস চৌধুরী। সুহিতাকে হুমড়ি খেয়ে পড়তে দেখে বিস্মিত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন তাঁরা। হাঁচড়েপাঁচড়ে সিধে হলো সুহিতা, সজোরে বন্ধ করল কপাট, ঝড়াং করে লাগিয়ে দিল ছিটকিনি। বাইরে, দরজার গায়ে থ্যাচ করে কিছু একটা বাড়ি খেল। তারপর নীরবতা।

নাঈমা ছুটে এলেন মেয়ের কাছে। 'কী হয়েছে, সুহি?'

'বাইরে কেউ আছে?' জিজ্ঞেস করলেন সুহিতার বাবা।

দরজার দিকে পেছন ফিরে হেলান দিল সুহিতা। গলার স্বর

স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করল। 'না, কেউ বাইরে নেই।'

সুহিতার মা মেয়ের কাঁধে সস্নেহে হাত রাখলেন। আবরার দরজার নবে হাত বাড়ালেন।

'কিন্তু একটা শব্দ শুনলাম যেন...' বললেন তিনি।

'না, বাবা। বাইরে যেয়ো না!' আর্তনাদ করে উঠল সুহিতা। তীক্ষ্ণ চোখে মেয়ের দিকে তাকালেন আবরার। গলার স্বর শান্ত করল সুহিতা। 'দোহাই তোমার!' হাতটা সরিয়ে আনলেন আবরার।

'খিড়কির দুয়ার বন্ধ আছে তো?' জিজ্ঞেস করল সুহিতা। 'আর জানালাগুলো?'

'সুহি,' বললেন ওর বাবা, 'কিছু একটা ঘটছে। ব্যাপারটা আমার জানা দরকার।'

'আবরার,' বললেন নাঈমা সুলতানা, 'ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে রাখলে তো অসুবিধে কিছু নেই। সুহি ভয় পাচ্ছে দেখতে পাচ্ছ না!'

আবরার স্ত্রীর ওপর থেকে নজর ফিরিয়ে তাকালেন মেয়ের দিকে। 'ঠিক আছে...ও যদি...আচ্ছা।'

'চলো, চেক করে দেখি দরজা-জানালা বন্ধ আছে কিনা,' বলল সুহিতা।

মি. এবং মিসেস চৌধুরী পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করলেন। তারপর জানালাগুলো পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন। সুহিতা ছুটল খিরকির দুয়ার বন্ধ আছে কিনা দেখতে। দরজা বন্ধ আছে দেখে স্বস্তি পেল। কিচেনের জানালাও বন্ধ আছে দেখে শক্ত পেশীতে ঢিল পড়ল। বাবা-মা হয়তো চাপা গলায় নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছেন তাঁদের মেয়েটার মাথা গেছে, শুধু শুধু ভয় পাচ্ছে। তাঁরা তা ভাবুন গিয়ে কিন্তু সুহিতা তো জানে ওর ভয় অমূলক নয়। বাইরে, রাতের আঁধারে যে জিনিসটা ঘাপটি মেরে রয়েছে, তার জন্য কোনও ঝুঁকি নেয়া চলবে না। জানোয়ারটা

আসলে ওকে নিয়ে খেলছে, বুঝতে পারছে সুহিতা। জানিয়ে দিচ্ছে সুহিতাকে যে কোনও মুহূর্তে হত্যা করার ক্ষমতা রাখে সে।

গভীর একটা দম নিয়ে লিভিং-রুমে ফিরল সুহিতা। যোগ দিল বাবা-মার সঙ্গে।

'সব জানালা বন্ধ করেছি,' জানালেন ওর মা।

'এবং ডাবল চেক করা হয়েছে,' যোগ করলেন বাবা।

মাকে আলিঙ্গন করল সুহিতা। তারপর মাকে ছেড়ে দিয়ে বাবার হাত পুরে নিল নিজের মুঠোয়। 'তোমাদের দু'জনকেই ধন্যবাদ,' বলল ও, 'আজ রাতে আর এ নিয়ে কাউকে দুশ্চিন্তা করতে হবে না। আমি কাল চলে যাচ্ছি।'

'চলে যাচ্ছি মানে?' ভুরু কোঁচকালেন নাঈমা। 'আমরা তো আশা করে আছি তুই ক'টা দিন থাকবি আমাদের সঙ্গে।'

'থাকতে পারলে থাকতাম,' বলল সুহিতা, 'কিন্তু জরুরী একটা কাজ আছে। কাজটা শেষ না করা পর্যন্ত স্বস্তি পাব না।'

অপেক্ষা করে রইল সুহিতা বাবা-মার প্রশ্নের জন্য। তাঁরা স্রোতের মত প্রশ্ন করবেন ভাবছে ও। দুশ্চিন্তা এবং ব্যথাতুর চেহারা নিয়ে জানতে চাইলেন সুহিতা কোথায় যাচ্ছে? কেন? কতদিনের জন্য? ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু সুহিতার বাবা-মা আর সবার মত নন। তাঁরা জানেন জানাবার প্রয়োজন হলে মেয়ে নিজে থেকেই সব বলবে, প্রশ্ন করতে হবে না। তাঁরা তাই চুপ করে রইলেন। খুশি হলো সুহিতা।

'ফিরে এসে সব বলব,' বলল ও।

এমন কিছু বলব যা তোমাদের বিশ্বাস হবে।

যখন আমি ফিরে আসব।

যদি ফিরে আসতে পারি।

সতেরো

ক্যালিফোর্নিয়ার উপসাগর থেকে ভেসে আসছে ফুরফুরে হাওয়া, মাযাটলানের চটচটে গরমে স্বস্তির বাতাস। শহরের উত্তরাঞ্চলে, যেখানে উপকূল রেখা বরাবর সুবিস্তৃত গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অরণ্য, প্যালেসিও ডেল মার হোটেলটা ওই অর্ধচন্দ্রাকৃতির সাগর সৈকতের তীরে সগর্বে দাঁড়িয়ে আছে।

হোটেলের সামনে, সাদা বালুতে বিছানো বীচ ব্ল্যাংকেটের ওপর কনুইতে ভর দিয়ে শুয়ে রয়েছে সাগর চৌধুরী। তার মাথায় খড়ের জীর্ণ টুপি, দৃষ্টি নিবদ্ধ লালচে বাদামী চুলের এক সুন্দরী যুবতীর দিকে। মেয়েটি সার্ফিংয়ে ব্যস্ত।

শহরের আকাশ ছোঁয়া নতুন রিসর্টগুলোর কোলাহল থেকে মুক্ত প্যালেসিও। হোটেলটি পুরানো। তবে ইচ্ছে করেই এ হোটেলটি বেছে নিয়েছে সাগর। কারণ এ হোটেলের গায়ে মেক্সিকোর গন্ধ আছে। মূল সাগর-সৈকত মায়ামী বীচ কিংবা ওয়াইকিকি থেকে খুব একটা ভিন্নতর কিছু নয়। তবে প্যালেসিওতে আপনি কামারন গাঁ থেকে আসা স্প্যানিশ ভাষী জেলেদের কথা শুনতে পাবেন, রান্নাঘর থেকে ভেসে আসবে মসলার সুগন্ধ, হোটেলের কর্মচারীরা ওখানে কাজ করে।

সাগর যেখানে শুয়ে আছে, সৈকতের ওই রাস্তা ধরে হেঁটে যাচ্ছে হোটেলের দুই কর্মচারী। এদের একজন, বছর সতেরোর রবার্টোর হাতের ট্রেতে বরফ চা। সে এগোল ইণ্ডিয়ানাপোলিস থেকে আসা এক দম্পতির দিকে। দম্পতি হোটেলের ছাতার নীচে

বসে আছে। রবার্টোর সঙ্গে শরীরে ছন্দ তুলে এগিয়ে চলেছে মেইডের পোশাক পরা ব্লাঙ্কা। কাবালার জন্য ধোয়া তোয়ালে তার হাতে। তরুণ এবং তরুণী মুখে কথা বলছে না বটে তবে তাদের চোরা চাহনি দেখে সহজেই বোঝা যায় দু'জনের মধ্যে ইটিশ-পিটিশ চলছে।

আহ্, কিশোর প্রেম, ওরা পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে, ওদের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলল সাগর। সে কি কোনদিন এরকমভাবে কারও প্রেমে পড়েছিল? আর একবার হারালে সে প্রেম কি কোনদিন ফিরে আসে?

পানির কিনারে দাঁড়িয়ে আছে সাগরের গার্লফ্রেণ্ড লিসা ভ্যান্স। পরনে গোলাপি বিকিনি। একহারা গড়ন, লম্বা, সুগঠিত এক জোড়া পা। সাগরকে হাত তুলে ডাকল সে। ওর সঙ্গে যোগ দিতে বলছে।

সাগর লিসার দিকে তাকিয়ে হাসল। হাত নেড়ে জানাল যাবে না। লিসা পেশায় অভিনেত্রী। ফটোগ্রাফে খুব সুন্দর লাগে তাকে কিন্তু অভিনয়ের পাঠশালাটি এখনও অতিক্রম করতে পারেনি। তবু বেশ কিছু টিভি সিরিজে তার চেহারা দেখানো হয় স্রেফ অলঙ্কার হিসেবে। মাযাটলানে লিসার সঙ্গ উপভোগ করছিল সাগর। কিন্তু ক'দিন ধরে কাজে ফেরার তাগিদও অনুভব করছে।

লিসা শরীর টানটান করে দাঁড়াল। অধৈর্য ভঙ্গিতে তাকাল সাগরের দিকে। সাগর খড়ের টুপিটা চোখের ওপর টেনে দিয়ে লম্বা হলো বীচ টাওয়েলে।

একটু পরে ঠাণ্ডা পানির ছিটে বুকে এবং পেটে পড়তে চোখের ওপর থেকে হ্যাট সরাল সাগর। লিসা। ভেজা চুল ঝাঁকিয়ে পানি ছিটাচ্ছে। খড়ের হ্যাট আবার আগের জায়গায় ফিরে গেল।

'চলো,' বলল লিসা। 'আমার সঙ্গে সাঁতার কাটবে।'

'দেখছ না বিশ্রাম করছি।'

'ধ্যাত, বিশ্রাম নেয়ার আরও সময় পাবে। আমার এখন

কারও সঙ্গ দরকার।' হাত বাড়িয়ে সাগরের মুখের ওপর থেকে খড়ের টুপি সরিয়ে নিল লিসা। 'তুমি না গেলে আমি হোটেলের ওই তরুণ ছেলেটির কাছে যাব। রবার্টো না কী যেন নাম। ইশারা করলেই কুকুরের মত ছুটে আসবে।'

'হয়তো ছুটে আসবে,' বলল সাগর। 'তবে ওর গার্লফ্রেণ্ডটি কিন্তু তোমাকে ছাড়বে না।'

'চলে এসো, সাগর। বুড়োদের মত কোরো না তো,' লিসা লাথি মেরে বালু ছুঁড়ল সাগরের নগ্ন পেটে। তারপর হালকা পায়ে ছুটল পানিতে, হাসতে হাসতে ঘাড় ঘুরিয়ে একবার তাকাল সাগরের দিকে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে উঠে বসল সাগর। সিধে হলো। তারপর মেয়েটির পেছন পেছন এগোল জগিং করার ভঙ্গিতে। লস এঞ্জেলেসে থাকাকালীন হপ্তায় দু'বার জিমনাশিয়ামে গিয়ে ব্যায়াম করত সাগর। সেইসঙ্গে টেনিস এবং হ্যাণ্ডবল খেলে নির্মেদ ও সুগঠিত করে রেখেছে শরীর। তবে সাঁতার কাটার প্রতি কোনকালেই তেমন আগ্রহ বোধ করেনি সে। ধান-নদী-খালের দেশ বরিশালের সন্তান হয়েও খুব কমই পুকুর বা নদীতে সাঁতার কেটেছে ও। আমেরিকায় পড়তে আসার পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সুইমিং পুলের ধারেকাছে কোনদিন গেছে কিনা সন্দেহ।

লিসা মনের সুখে পানিতে লাফাচ্ছে-ঝাঁপাচ্ছে। পানি বেশ উষ্ণ, ঢেউগুলোও তেমন উঁচু নয়। লম্বা লম্বা স্ট্রোকে মেয়েটা সহজেই সাগরকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেল সামনে।

তীর থেকে পঞ্চাশ গজ এগিয়ে থেমে গেল লিসা। অপেক্ষা করছে সাগরের জন্য। সাগর ওর পাশে আসার পরে ওকে হাত-পা দিয়ে কেঁচকি মারল লিসা, গপ করে চুমু খেল মুখে। তারপর ওকে নিয়ে ডুব দিল পানির নীচে।

মুখ দিয়ে পানি ছিটিয়ে সারফেসে ভেসে উঠল সাগর, পাশে ডলফিনের মত উদয় হলো মেয়েটা। 'তুমি আমাকে চুবিয়ে মারবে

নাকি?' খকখক কাশল সাগর।

লিসা চোখের ওপরের ভেজা চুল আঙুল দিয়ে ঠেলে সরিয়ে হেসে উঠল খিলখিল করে। সাগর চেহারায় কঠোর ভাব ফোটাতে চেয়েও ব্যর্থ হলো।

'তুমি কি জানো তুমি একটা ক্রেজি মেয়ে?' বলল ও।

সাঁতার কেটে সাগরের কাছে চলে এল লিসা, একটা হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল কোমর। 'তুমি পানির নীচে কখনও ওটা করেছ?'

'অবশ্যই বহুবার।'

মূড অফ হয়ে গেল মেয়েটার। পিছিয়ে গেল। 'তোমার কোনও অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ই বাকি নেই, তাই না?' জবাবের অপেক্ষা না করে সাঁতার দিল তীর লক্ষ্য করে।

মূড অফ হয়ে গেল মেয়েটার। পিছিয়ে গেল। সাঁতার দিল তীর লক্ষ্য করে।

না, লিসার পেছনে ধীরগতিতে সাঁতার কাটতে কাটতে ভাবল সাগর। সবরকম অভিজ্ঞতা ওর নেই। তিন বছর আগেও ও ব্যাচেলর জীবন যাপন করত। সাপ্তাহিক ছুটিগুলোতে মেয়েদের নিয়ে স্ফূর্তি করে বেরিয়েছে বটে তবে ব্যাপারটা খুব একটা সুখকর অভিজ্ঞতা ছিল না কখনোই। মেয়েরা ওর কাছে আসত ওর হ্যাণ্ডসাম চেহারার আকর্ষণে, শারীরিক অনুভূতিই সেখানে প্রধান ছিল, মন দেয়া-নেয়ার কোনও ব্যাপার ছিল না। ও জীবনে একজনকেই ভালবেসেছে—সুহিতা সুলতানা। যদিও কথাটা মুখ ফুটে ওকে কোনদিন বলতে পারেনি। পারবেও না হয়তো কোনদিন। কারণ সুহিতা যে ওকে বন্ধুর চোখে দেখে! সুহিতা সাহায্য চেয়ে ছিল ওর কাছে। পাহাড়ী গ্রাম ড্রাগোতে ছুটে গিয়েছিল সাগর সুহিতাকে সাহায্য করতে। এক নারকীয় অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে এসেছে ওখান থেকে। ছ'টা মাস সে আর সুহিতা ওই ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা ভুলে থাকার কত চেষ্টাই না করেছে। কর্মস্থলে ফেরার পরে আর মন দিতে পারেনি কাজে। তারপর পার্টনারশিপে ব্যবসা

শুরু করেছে ওয়াল্টার মরিসের সঙ্গে। মরিস ওকে বছরে দুই-তিনমাসের জন্য ছুটি দেয়। সাগর আগের বাড়ি ছেড়ে বেনেডিক্ট ক্যানিয়নে একটি বাড়ি ভাড়া করেছে। এ বাড়িতে ও মাঝে মাঝে পার্টি দেয়, একা থাকতে চাইলে একা হতে পারে। আর যখন কাজ করে মনপ্রাণ ঢেলে দেয় কাজে। ছুটি কাটানোর তাগিদ অনুভব করলে চলে আসে কোনা কোস্ট, কুরাকাও কিংবা মাযাটলানে। কখনও সঙ্গিনী থাকে, কখনও বা একা।

সাগর কাজের মধ্যে ডুবে থেকে ভুলে যেতে চায় অতীত। কিন্তু সুহিতাকে ওর প্রায়ই মনে পড়ে। সুহিতার সঙ্গে লাসভেগাসে ঝগড়ার পরে একবারও মেয়েটার খোঁজ-খবর নেয়নি বলে অনুতাপ হয়।

আরি, আমি কেন ওর কথা এত ভাবছি? নিজেকে শাসায় সাগর। সুহিতা নিশ্চয় ভাল আছে। সাগর ওর সঙ্গে দেখা করলেই বা কী লাভ হত? ড্রাগোর স্মৃতি ভুলিয়ে দিতে সাগর খুব একটা ভূমিকা রাখতে পারত কি? সুহিতার চিন্তা জোর করে মাথা থেকে দূর করে দিতে চাইল ও। ডুব দিল পানির নীচে। দৃঢ় পায়ে পানি কেটে এগোতে লাগল তীর অভিমুখে।

লিসা সৈকতে অপেক্ষা করছিল ওর জন্য। একটু আগের রাগ চেহারা থেকে উধাও।

'আমার সঙ্গে লাঞ্চ করবে?' সাগর তীরে উঠে এলে জিজ্ঞেস করল ও।

'আবার জিগায়!' হাসল সাগর।

খুশিতে উদ্ভাসিত লিসা। সাগরের হাত ধরে সৈকতে এগোল। উঠে এল স্প্যানিশ আদলে তৈরি হোটেলের চওড়া বারান্দায়। ১৯৬০-এর শুরুর দিকে মূল ভবনের দু'পাশে আলাদা ছ'টি কাবানা বা কটেজ তৈরি করেছে কর্তৃপক্ষ। সাত নম্বর কাবানায় মোড় নিল ওরা। দক্ষিণ দিকে, মূল ভবনের সবচেয়ে কাছে এ কাবানা।

দেড় ঘণ্টা পরে, সাগর বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। নগ্ন বালিশের ওপর মুখ, রিল্যাক্সড শরীর। লিসা হাঁটাহাঁটি করছে ঘরে। কিছুক্ষণ আগে মিলিত হয়েছে ওরা। লিসার চোখে মুখে তৃপ্তির ছাপ। বাঁশের বেড়ার ফাঁক দিয়ে বিকেলের সূর্যের সোনালি রশ্মি মেয়েটার মসৃণ চামড়ায় চকচক করছে।

'পুরুষরা সাঁতার কাটার পরে সবসময় কেন যে ঘুমাতে চায় বুঝি না,' অনুযোগের সুরে বলল লিসা। একটা চেয়ারে এসে বসল।

'উম্‌ম্‌,' বিড়বিড় করল সাগর। হাত বাড়াল। 'নাও, প্যান্টটা দাও।'

যে চেয়ারে বসে আছে লিসা, ওটার ওপরে ভাঁজ করে রাখা জিন্সের সাদা প্যান্টটা নিয়ে সাগরকে দিল। পকেট থেকে কী যেন একটা খসে পড়ল কাবানার ঘাসের তৈরি কার্পেটে। মৃদু শব্দ হলো। লিসা হাঁটু মুড়ে বসল, তাকাল মেঝেতে। খাটের নীচ থেকে রূপোর ছোট একটা জিনিস বের করে আনল। বাড়িয়ে দিল সাগরের দিকে।

'কী এটা?' জানতে চাইল লিসা। 'এরকম জিনিস তোমার কাছে আগে কখনও দেখিনি তো!'

মুখ গম্ভীর হলো সাগরের, 'কিছু না,' হাত বাড়াল ও। 'দাও।'

'এটা বুলেট নাকি?'

ধাতব ছোট জিনিসটা যেন চোখ টিপছে সাগরের দিকে তাকিয়ে। বুলেটই বটে। খাঁটি রূপোর তৈরি .২২ রাইফেলের গুলি। বারোটা ছিল। সাগরের নির্দেশে লস এঞ্জেলেসের এক বন্দুক-নির্মাতা বানিয়ে দিয়েছিল বুলেটগুলো। ড্রাগোতে, [illegible] এবং সেই রাতে এগারোটা বুলেট ব্যবহার করেছিল সে ওয়্যারউলফগুলোকে হত্যা করতে। সুহিতা ছুঁড়েছিল শেষ গুলিটি। সাগর আগুনে-পোড়া গ্রামটিতে একবার শুধু গিয়েছিল। পোড়া

মাটিতে জ্বলজ্বল করছিল একটা সিলভার বুলেট। সে বুলেটটা নিয়ে চলে আসে ওখান থেকে। আর কোনদিন ওমুখো হয়নি।

'এটা একটা খেলনা বুলেট,' লিসাকে বলল সাগর।

'বাদ দাও। খেতে চলো।'

'তোমার আরেকটা সিক্রেট,' আঁধার ঘনাল লিসার চেহারায়, 'তুমি কতকিছু যে গোপন কর আমার কাছে!'

'মানে? আমি তো তোমার কাছে খোলা বইয়ের মত।'

'না। আমি সিরিয়াস। আমি জানি বুলেটটা নকল বা খেলনা নয়। আসল ঘটনাটা আমাকে বললে কী হয়?'

'কারণ এর মধ্যে তোমার নাক গলানোর কোনও প্রয়োজন দেখছি না।'

লিসা বুলেটটা সাগরকে না দিয়ে রুমের ক্লজিটের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। কোট হ্যাঙ্গারে বিরক্ত ভঙ্গিতে ড্রেস খুঁজতে খুঁজতে বলল, 'আমি জানি বুলেটটা তোমাকে ওই মহিলা দিয়েছে।'

'কোন্ মহিলা?'

'ওই মহিলা। যার কথা তুমি ভুলতে পার না। যাকে তুমি ভালবাসতে অথচ সে বিয়ে করেছিল তোমার প্রিয় বন্ধুকে।'

সাগর লিসার নগ্ন পিঠের দিকে তাকিয়ে রইল। সুহিতার কথা ও জানল কী করে? হয়তো আন্দাজে ঢিল মেরেছে কিংবা ঘুমের ঘোরে সুহিতার নাম উচ্চারণ করেছে সাগর।

'কাপড় পরো,' বলল ও। 'আমার খিদে পেয়েছে।'

হোটেলের ডাইনিং-রুমে বসে ওরা লাঞ্চ করছে, টুকিটাকি নীরস আলাপ চলছে; লক্ষ করল না পাশের টেবিল থেকে একজন স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। শুনছে ওদের কথা।

আঠারো

উত্তর আমেরিকার তুলনায় মাযাটলান বিমানবন্দর ক্ষুদ্রকায়। এরোনেভস ৭২৭ রানওয়েতে তার দৌড় থামালে সীটবেল্ট থেকে নিজেকে বিযুক্ত করল সুহিতা সুলতানা। জানালা দিয়ে দেখল বিভিন্ন আকার ও রঙের অসংখ্য বিমান এয়ারপোর্টে। কেউ টেকঅফ করছে, কেউ দাঁড়িয়ে রয়েছে ঠায়। রয়েছে ছিমছাম চেহারার নতুন জেট, পুরানো ডিসি-৩৫, কর্পোরেট লিয়ার, প্রাইভেট সেসনা এবং পাইপার। এমনকী ককপিট খোলা লঝঝড়ে একটি বাইপ্লেনও চোখে পড়ল। যে যার ইচ্ছেমত ছুটছে, অন্তত সুহিতার তাই মনে হলো। কন্ট্রোল টাওয়ারটা আশপাশে নিশ্চয় কোথাও আছে, মনে মনে বলল ও, বিমানগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করছে। তবে লস এঞ্জেলেসের বিশাল বিমান বন্দরের তুলনায় মাযাটলান এয়ারপোর্ট কিছুই না।

খুলে গেল দরজা। অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে প্লেনের সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল সুহিতা। কালো টারমাক পার হয়ে এগোল টার্মিনাল ভবনে।

ভেতরে গরম আর মানুষের হাউকাউ। লোকজনের চেঁচামেচি ছাড়িয়ে পি.এ সিস্টেম লাউডস্পীকার প্রথমে স্প্যানিশ তারপর ইংরেজিতে ঘোষণা করছে কোন্ প্লেনটি উড়াল দিচ্ছে আর কোনটি বিমান বন্দরে অবতরণ করল। ব্যাগেজ ক্লেম কাউন্টারে গেল সুহিতা। ঘণ্টাখানেক পরে হাতে পেল নিজের ব্যাগ। বেরিয়ে এল টার্মিনাল ভবন থেকে। ফুটপাতে নামিয়ে রাখল ব্যাগ।

বাইরের বাতাস ফুরফুরে, শীতল, সাগরের নোনাধরা গন্ধ মেশানো। বুক ভরে বাতাস টানল সুহিতা।

'আপনার সুটকেসটা নিই, লেডি?'

পেছন থেকে ভেসে আসা কণ্ঠস্বরে চমকে গেল সুহিতা। ঘুরল। মুখে ফুটকি, লম্বা একটি তরুণ এবড়োখেবড়ো দাঁত বের করে ওর দিকে তাকিয়ে হাসছে। মুখের কোনায় দেশলাই কাঠি গোঁজা।

'না, ধন্যবাদ,' বলে ঘুরে দাঁড়াল সুহিতা।

'আরে দিন না। এত ভারী ব্যাগ বইতে পারবেন না তো!' সুহিতা রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকল, ছেলেটাকে পাত্তা না দেয়ার ভঙ্গি।

'আমার গায়ে শক্তি আছে। আপনার যত ভারী বোঝাই থাকুক না কেন সব মাল বইতে পারব। প্রমাণ চান?'

'প্রমাণ চাই না,' নির্লিপ্ত গলা সুহিতার। ছেলেটা সুহিতার ব্যাগটা ঝট করে তুলে নিল কাঁধে। 'দেখলেন? কী সহজে তুলে ফেললাম!'

'প্লীজ,' গলার স্বর কঠিন করল সুহিতা, 'ব্যাগ রাখো।'

'রাগ করবেন না, লেডি।'

'অ্যাই ছোকরা!' চাবুকের মত ঝলসে উঠল গমগমে একটা কণ্ঠ। চমকে উঠে ছোকরা সুহিতার কাঁধের ওপর দিয়ে তাকাল। ঘুরল সুহিতা কে হাঁক ছাড়ল দেখতে।

চৌকোনা শরীরের, মুখে মস্ত গোঁফ, এক লোক কটমট করে তাকিয়ে আছে ছেলেটার দিকে। তাকে দেখে মুখের হাসি মিলিয়ে গেল ছোকরার। সুহিতার পায়ের কাছে ব্যাগ নামিয়ে রেখে পিছু হঠল। আবার কথা বলল আগন্তুক, এবার গলার স্বর নরম হলেও তাতে কর্তৃত্বের সুর স্পষ্ট।

ছেলেটা সুহিতার দিকে তাকাল। 'আমি দুঃখিত, লেডি,' বিড়বিড় করল সে তারপর ভবন থেকে বেরিয়ে আসা লোকের ভিড়ে মিশে গেল চট করে।

'আমার শহরের পক্ষ থেকে আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি, সিনোরা,' বলল গোঁফঅলা। 'ওই ছোকরা লোক ভাল নয়। গুণ্ডা। তবে আমরা সবাই ওর মত নই। মাযাটলানে ভালমানুষের অভাব নেই।'

'নিশ্চয়,' বলল সুহিতা, 'ধন্যবাদ।'

লোকটা ফুটপাতে পার্ক করা বছর দশেকের পুরানো, গায়ে কাদামাখা একটি প্লিমাউথের দিকে হাত তুলে ইঙ্গিত করল। সাদা রঙে লেখা TAXI শব্দটি প্রায় বোঝাই যায় না, গায়ে লেপ্টে আছে শুকনো কাদা। 'লুই জ্যারেটের ট্যাক্সি আপনার সেবায় নিয়োজিত, সিনোরা। সঙ্গে গাইড সার্ভিসও। অবশ্য আপনার যদি প্রয়োজন হয়।'

'আ...ইয়ে...আমার ট্যাক্সির দরকার হবে,' বলল সুহিতা, 'আমাকে প্যালেসিও ডেল মার হোটেলে পৌঁছে দিতে পারবে?'

'সানন্দে, সিনোরা,' বলল লুই জ্যারেট। ঝট করে খুলে দিল প্লিমাউথের পেছনের দরজা, ভেতরে ঢুকতে ইশারা করল সুহিতাকে। ব্যাগটা নিয়ে গাড়ির ট্রাঙ্কে রাখল। ইলেকট্রিক তার দিয়ে বাম্পারের সঙ্গে বেঁধে দিল ঢাকনা।

'প্যালেসিও সুন্দর হোটেল,' গাড়িতে হুইলের পেছনে এসে বসল লুই। 'পুরানো এবং আরামদায়ক। আকারে তেমন বড় নয়। আদরযত্নও পাবেন বেশ।'

'বেশ,' অন্যমনস্ক গলায় বলল সুহিতা।

গাড়িতে স্টার্ট দিল লুই, গিয়ারের ঘর্ষণ আর ইঞ্জিনের উচ্চকিত শব্দ তুলে নেমে এল ফুটপাত থেকে। গাড়ি চালাতে চালাতে লুই গর্ব ভরে দেখাতে লাগল শহরের দর্শনীয় স্থানগুলো–ক্যাথেড্রালের সোনার তৈরি জোড়া চূড়া, উপকূলে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকা প্রাচীন ফ্যারল বাতিঘর, ব্যস্ত ফিশিং ডক–হঠাৎ খেয়াল করল পেছনের যাত্রীটির তার কথায় মনোযোগ নেই।

'সিনোরা কি কিছু নিয়ে চিন্তিত?' জিজ্ঞেস করল লুই।

কপাল কুঁচকে তার দিকে তাকাল সুহিতা। 'কী বললে?' লুই জ্যারেট রিয়ারভিউ মিররে গভীরভাবে পরখ করল সুহিতাকে। বলল, 'মাফ করবেন, সিনোরা, আমি অন্য কিছু ভেবে কথাটা বলিনি। আমার শরীরে জিপসীদের রক্ত বইছে। কেউ কিছু নিয়ে দুশ্চিন্তা করলে সহজেই বুঝতে পারি।'

'তাই নাকি?' বলল সুহিতা। 'তুমি জিপসি?'

চোখ পিটপিট করল লুই। 'খানিকটা। আমার প্রমাতামহ ছিলেন জিপসি। আমার শরীরেও প্রমাতামহের রক্ত বইছে। সে হিসেবে আমিও জিপসি, বুঝলেন না?'

'হুঁ, বুঝলাম।' হাসছে সুহিতা।

মাইলখানেক নীরবে গাড়ি চালাল ড্রাইভার। তারপর আবার বকবক শুরু করে দিল। 'সিনোরা কি মাযাটলানে একা এসেছেন?'

সতর্কতার সঙ্গে জবাব দিল সুহিতা, 'না, আ-আমার এক বন্ধু আছে হোটেলে।'

'তা হলে ঠিক আছে। মাযাটলান শহর সুন্দর, ভিজিটরদের আমরা স্বাগত জানাই। কিন্তু জানেনই তো পৃথিবীর কোনও শহরেই দুষ্ট লোকের অভাব নেই। একা একা কোন নারীর ভ্রমণ করা উচিত নয়।' এক মুহূর্ত নীরব থাকল সে, তারপর যোগ করল। 'আপনি কি এখানে অনেকদিন থাকবেন?'

'ঠিক জানি না,' বলল সুহিতা। 'নাও থাকতে পারি,'

'মাফ করবেন,' শ্রাগ করল লুই। 'আমি বোধহয় একটু বেশি কথা বলি। ভাবলাম সিনোরার হয়তো গাইডের দরকার হবে। এমন কোনও গাইড যাকে কম টাকায় ভাড়া করা যাবে এবং যে মাযাটলান শহর এবং শহর ছাড়িয়ে জঙ্গল ও বনভূমি নিজের হাতের তালুর মতই চেনে।'

হাসি চেপে রাখতে পারল না সুহিতা, 'লুই জ্যারেটের মত কোনও গাইড?'

'সি, সিনোরা, নিজের ঢাক নিজে পেটাচ্ছি বলে কিছু মনে

করবেন না। তবে এটাই সত্যি।'

'তোমার প্রস্তাব আমি ভেবে দেখব,' বলল সুহিতা, 'তবে মনে হয় না শহর ঘুরে দেখার খুব একটা সময় পাব।'

'যদি সময় পান এ অধমের কথা একটু স্মরণ রাখবেন।'

'আচ্ছা,' বলল সুহিতা। 'স্মরণ রাখব।'

লুই গাড়ি চালিয়ে শহরের উপকণ্ঠে চলে এল। এদিকের রাস্তার দু'পাশ গাছপালা দিয়ে ঘেরা। বাঁক ঘুরে সাগরের দিকে চলল লুই, খাড়া ঢাল বাইল কিছুক্ষণ, তারপর নেমে এল প্যালিসিও ডেল মারের আধখানা চাঁদের আকারে গড়ে তোলা সৈকতে। লাল টালির ছাদ আর কাবানাসহ সাদা রঙের হোটেল ভবন মুগ্ধ করল সুহিতাকে। দু'দিকে দুটো বাহু বাড়িয়ে যেন আলিঙ্গন করছে সাগর-সৈকত।

সৈকতের রাস্তা ধরে গাড়ি চালাচ্ছে লুই, ডানে বামে তাকাল সুহিতা সাগরকে দেখার আশায়। কিন্তু চোখে পড়ল না ওকে। যত কাছিয়ে আসছে হোটেল, ততই ধড়ফড় করছে বুক। অনেক প্রশ্ন ভিড় করছে মনে। ওকে দেখে কীরকম প্রতিক্রিয়া হবে সাগরের? ওর সঙ্গে কথা বলবে তো নাকি ঘুরিয়ে রাখবে মুখ? এই আতঙ্ক এবং ভয়ের সঙ্গে সাগরকে জড়িয়ে ফেলাটা কি ঠিক হচ্ছে? একবার সাগর এ নিয়ে খুব পেরেশানি হয়েছিল। আবার ওকে এর মধ্যে টেনে আনতে চাইছে সুহিতা। মনে হচ্ছে কাজটা ঠিক হচ্ছে না। হঠাৎ ইচ্ছে করল ড্রাইভারকে বলে ট্যাক্সি ঘুরিয়ে এয়ারপোর্টে যেতে। কিন্তু তারপর কোথায় যাবে সুহিতা? ওর তো যাওয়ার কোন জায়গা নেই। কারও কাছে যাওয়ার নেই।

'সিনোরা?'

ড্রাইভারের ডাকে সম্বিৎ ফিরল সুহিতার। দেখল ওরা হোটেলের স্প্যানিশ আদলের প্রশস্ত বারান্দার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

লুই লাফিয়ে নামল গাড়ি থেকে, সুহিতার দিকের দরজা মেলে

ধরল। ট্রাংকের সঙ্গে রশি দিয়ে বাঁধা ব্যাগ খুলল লুই, সুহিতার পেছন পেছন সিঁড়ি বেয়ে পুরানো হোটেলটার লবিতে ঢুকল। রেজিস্ট্রেশন ডেস্কে এগিয়ে গেল সুহিতা। খাড়া নাকের এক লোক বসে আছে ওখানে। সুহিতাকে দেখে পেশাদারী একটি হাসি উপহার দিল। তার সামনে, কাউন্টারে, একটি ধাতব প্লেটে লেখা: *জে, ডেভিলা, ম্যানেজার।*

'গুড আফটারনুন, সিনোরা,' বলল সে।

জবাবে মাথা ঝাঁকাল সুহিতা। 'আমি একজন ভদ্রলোককে খুঁজছি। উনি এ হোটেলেই উঠেছেন শুনেছি। নাম সাগর চৌধুরী।'

ম্যানেজারের চোখে ছায়া ঘনাল। 'ও, হ্যাঁ, সিনর চৌধুরী। আপনি কি...ওঁর আত্মীয়?'

'না, আমি ওর এক বন্ধু। উনি এ হোটেলে থাকলে ওঁর সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই, প্লীজ।'

ডাভিলা রেজিস্ট্রেশন কার্ড চেক করে দেখল। ফাইল থেকে একটা কার্ড বের করে চোখ বুলাল। 'জ্বী, মি. চৌধুরী আমাদের হোটেলেই উঠেছেন।'

'আমি কি তাঁর রুম নাম্বার জানতে পারি?'

'কাবানা নাম্বার সাত।'

'ধন্যবাদ। আমি কি ফোনে তার সঙ্গে কথা বলতে পারি?'

'দুঃখিত, কাবানায় ফোনের সংযোগ নেই।'

'কাবানাটা কোথায় যদি একটু বলেন তা হলে আমি নিজেই যেতে পারি।'

'কিন্তু গিয়ে কোনও লাভ হবে না। সিনর চৌধুরী এ মুহূর্তে তাঁর কাবানায় নেই?'

মেজাজ চড়ে যাচ্ছে সুহিতার। 'তা হলে সে কোথায়? আমি মি. চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। আর নষ্ট করার মত সময় আমার হাতে একদম নেই।'

লুই জ্যারেট এগিয়ে এল ডেস্কে। 'আমি একটু কথা বলি,

সিনোরা।' বলল সে। তারপর স্প্যানিশে ডেস্কের লোকটার সঙ্গে কী যেন বলল। কথা শেষ হওয়ার পরে হোটেল ম্যানেজার সুহিতার দিকে তাকিয়ে ক্ষমাপ্রার্থনার ভঙ্গিতে হাসল।

'সিনর চৌধুরী এ মুহূর্তে আমাদের ডাইনিং-রুমে লাঞ্চ করছেন।'

'ধন্যবাদ,' শীতল গলা সুহিতার। 'এখন যদি একটু বলেন ডাইনিং-রুমটা কোন্ দিকে...'

চেহারায় অস্বস্তির ছাপ পড়ল ডাভিলার। 'সিনোরাকে বলতে বাধ্য হচ্ছি সিনর চৌধুরী একা লাঞ্চ করছেন না।'

'ওর সঙ্গে একটা মেয়ে আছে তাই তো? তাতে কিছু আসে যায় না। আপনি কি ভেবেছেন—আমি ওর স্ত্রী?'

'না, না, তা ভাবব কেন?' ম্যানেজারের চেহারায় এবারে স্বস্তির ছাপ। 'চলুন, আপনাকে ডাইনিং-রুমে নিয়ে যাই, সিনোরা।'

'আমি কি আপনার জন্য অপেক্ষা করব?' জানতে চাইল লুই।

'না,' জবাব দিল সুহিতা। 'অপেক্ষা করতে হবে না।' ও ভাড়া মিটিয়ে দিল, সঙ্গে মোটা বকশিস।

'মুচাস গ্রাসিয়াস,' স্প্যানিশে ধন্যবাদ জানাল ড্রাইভার। 'মাযাটলানে থাকাকালীন যে কোনও প্রয়োজনে আমাকে স্মরণ করবেন। লুই জ্যারেটের চেয়ে ভাল সহযোগিতা আর কারও কাছ থেকে পাবেন না।'

'মনে থাকবে আমার,' লুইকে আশ্বস্ত করল সুহিতা।

লুই রেজিস্ট্রেশন ডেস্কের পেছনে রাখল সুহিতার ব্যাগ। বেরিয়ে গেল প্রবেশ পথ দিয়ে। ডাভিলা বেরিয়ে এল ডেস্ক ঘুরে। তার পেছন পেছন লবি ধরে চলল সুহিতা। একটা খিলান ঘুরে ঢুকল ডাইনিং-রুমে।

ঘরটি বেশ বড়। রোদে ঝলমল করছে। লম্বা লম্বা জানালা দিয়ে ঢুকছে আলো। টেবিলে জায়গা প্রচুর। সাদা লিনেন কাপড়ে মোড়ানো টেবিল, তাতে রুপোর বাসন-কোসন।

সাগরকে খুঁজতে মাত্র এক লহমা সময় নিল সুহিতা। ও খুব একটা বদলায়নি, ভাবছে সুহিতা। আগের মতই শক্তপোক্ত শরীর, মাথাভর্তি ঝাঁকড়া কালো চুল, রোদেপোড়া চামড়া।

সুহিতার দিকে মুখ করে বসেছে সাগর। তবে ওর দিকে তাকিয়ে নেই। টেবিলে ওর সঙ্গিনী ঝলমলে পিঙ্গল কেশের এক তরুণী। সেক্স যেন উপচে পড়ছে মেয়েটির সর্বাঙ্গে।

হোটেল ম্যানেজার সাগরের টেবিলে পা বাড়াতে যাচ্ছিল, তাকে বাধা দিল সুহিতা।

'ধন্যবাদ,' বলল ও। 'আমি একাই যেতে পারব।'

টেবিলে কদম বাড়াল সুহিতা। সাগরের কাছ থেকে পাঁচ-সাত হাত দূরে, এমন সময় চোখ তুলে চাইল সাগর। লস এঞ্জেলেস ছেড়ে আসার পরে এ মুহূর্তটির জন্য ব্যাকুল হয়ে অপেক্ষা করছিল সুহিতা। সাগরের সঙ্গে চোখাচোখি হওয়া মাত্র সুখ-দুঃখের বহু স্মৃতি বাঁধভাঙা বন্যা হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল মগজে। সাগরের চেহারায় যে ছাপ ফুটল তাতে পরিষ্কার বোঝা যায় একই সঙ্গে স্মৃতিকাতর হয়ে পড়েছে সে-ও। ভাবাবেগের সঙ্গে যোগ হয়েছে নিখাঁদ বিস্ময়। সুহিতাকে এখানে দেখবে কল্পনাও করেনি সাগর। এক মুহূর্ত মূর্তির মত স্থির হয়ে রইল চেয়ারে, তারপর সিধে হলো।

'সুহিতা! কী আশ্চর্য তুমি?'

'হ্যালো সাগর।'

'অনেকদিন পরে দেখা।'

'হ্যাঁ, অনেকদিন।'

ওরা কয়েক সেকেণ্ড একে অন্যের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, কত কথা ভিড় করল মনে কিন্তু বলতে পারল না কিছুই।

সাগরের সঙ্গিনী হাতের পানির গ্লাসটা ঠকাশ করে নামিয়ে রাখল টেবিলে। শব্দে সাগর নীচে তাকাল, যেন এই প্রথম দেখছে মেয়েটিকে।

'আয়াম সরি,' বলল ও। 'সুহিতা, এ হলো লিসা ভ্যান্স।

লিসা, এ আমার পুরানো বান্ধবী সুহিতা সুলতানা।'

'এখন সুহিতা অ্যাডামস।'

'ও, আচ্ছা। জানতাম না।'

লিসা ভুবন ভোলানো একটি হাসি উপহার দিল। প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখল সুহিতাকে। 'আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে সুখি হলাম, মিসেস অ্যাডামস। সাগরের পুরানো কোন বান্ধবী আছে জানতাম না।'

লিসা যেন ইচ্ছে করেই 'পুরানো' শব্দটার ওপর জোর দিল।

'প্লীজ, আমাকে শুধু সুহিতা ডাকবেন,' বলল ও।

সাগর দুই নারীর ওপর অস্থির চোখ বুলাল। 'তুমি লাঞ্চ করেছ, সুহিতা?' দ্রুত বলে উঠল ও। 'আমাদের সঙ্গে যোগ দাও না?'

'হ্যাঁ, প্লীজ, আসুন,' বলল লিসা।

'আমি প্লেনে খেয়ে নিয়েছি,' জানাল সুহিতা। 'তবে এক কাপ কফি খাওয়া যায়।'

সুহিতাকে একটা চেয়ার টেনে দিল সাগর বসার জন্য। ইশারায় ডাকল ওয়েটারকে।

'মেক্সিকোর কফি আপনার তেমন পছন্দ হবে না, সুহিতা,' বলল লিসা। 'খেলে মনে হবে গতরাতের বাসি জিনিস। আমি আর সাগর তো সবসময় চা খাই।'

'আমার সমস্যা হবে না,' মিষ্টি হাসল সুহিতা। 'আমার কফি হলেই চলে।'

ওয়েটার প্রকাণ্ড একটি মগে কালো, তরল একটি পদার্থ নিয়ে এল। সুহিতা চুমুক দিল। দেখাল ও খুব উপভোগ করছে কফি।

পরবর্তী কয়েকটা মিনিট অস্বস্তিকর একটা সময় কাটল সাগরের। সুহিতার সঙ্গে কথা বলছে তবে কাটাতে পারছে না আড়ষ্টতা। এরকম কেন হচ্ছে বুঝতে পারছে না ও। সুহিতা অবশ্য স্বাভাবিক আচরণই করল। নীরবে খেয়ে চলল লিসা,

সুহিতা এবং সাগরের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় নাক গলাল না।

অবান্তর কথা বাদ দিয়ে অবশেষে সরাসরি বলেই ফেলল সাগর। 'তুমি নিশ্চয় বিনা কারণে এখানে আসনি?'

'না,' জবাব দিল সুহিতা। 'এসেছি তোমার খোঁজে।'

'বেশ তো। পেয়ে গেছ আমাকে।'

'খুঁজে পেতে নিশ্চয় কষ্ট হয়েছে আপনার,' মন্তব্য করল লিসা।

'তা তো হয়েছেই,' সরল স্বীকারোক্তি সুহিতার।

আরেকটি অস্থির নীরব মিনিট কেটে গেল।

'আপনি কি এ হোটেলেই উঠেছেন?' অবশেষে নীরবতা ভঙ্গ করল লিসা, ঠোঁটে ফিরিয়ে এনেছে হাসি।

'এখনও উঠিনি,' জবাব দিল সুহিতা। ফিরল সাগরের দিকে। 'তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।'

'নিশ্চয় একা কথা বলতে চাইছেন,' লিসার হাসি ম্লান হলো।

'আপনি যদি কিছু মনে না করেন,' বলল সুহিতা। 'খুব বেশি সময় আমি নেব না।'

'আচ্ছা। ঠিক আছে,' বলল লিসা। দাঁড়াল। টান টান করল হিলহিলে দেহ। হেঁটে গেল সাগরের চেয়ারের পেছনে, ওর ঘাড়ের পেছনে তর্জনী ঠেকিয়ে বলল, 'আমি ঘরে যাচ্ছি, ডার্লিং।'

চলে গেল লিসা। ওকে চোখ দিয়ে অনুসরণ করল সাগর।

'সুন্দরী,' ওরা একা হবার পরে মন্তব্য করল সুহিতা।

'হুঁ,' বলল সাগর প্রসঙ্গটি ইতি টানার ভঙ্গিতে। 'কী হয়েছে?'

ডাইনিং-রুমের চারপাশে চোখ বুলাল সুহিতা। এখানে মানুষজন বড্ড বেশি, নিভৃতে কথা বলার পরিবেশ নেই।

'আমরা অন্য কোথাও গিয়ে কথা বলি?'

'নিশ্চয়,' ওয়েটারকে ডেকে বিল মিটিয়ে দিল সাগর। বেরিয়ে এল হোটেল থেকে। চলল সৈকত ধরে। থামল বালুকাময় সৈকতের শেষ মাথায়। এখানে ঢেউয়ের মধ্যে মাথা উঁচিয়ে আছে বড় বড় পাথর, তীর ঘেঁষে শুরু হয়েছে অরণ্য। একটা প্রকাণ্ড

পাথরের ওপর বসল ওরা দু'জন। কিছুক্ষণ চুপচাপ দেখল মাথায় ফেনার সাদা মুকুট নিয়ে ছুটে আসছে সবুজ ঢেউ, পাথরের কোলে বাড়ি খেয়ে ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে।

'ড্রাগোর অগ্নিকাণ্ডের কথা মনে আছে তোমার?' ঢেউয়ের ওপর চোখ রেখে নীরবতা ভাঙল সুহিতা।

'ওই স্মৃতি কোনদিন ভোলা যায়?'

'মনে আছে ওই ঘটনার পরেও আমরা নেকড়ের ডাক শুনতাম? জানতাম সবগুলো নেকড়ে আগুনে পুড়ে মরেনি। বেঁচে আছে কেউ কেউ।'

'এ ব্যাপারে আমি ঠিক নিশ্চিত নই, সুহিতা। আমরা যেটাকে হাউলিং ভেবেছি ওটা কয়োটির ডাকও হতে পারে। ওরা ড্রাগোর নেকড়ে নাও হতে পারে।'

মাথা নাড়ল সুহিতা। 'না, ওরা ড্রাগোর ওয়্যারউলফই। আমি ঠিক জানি। কারণ ওরা আমাকে খুন করতে চাইছে।'

নিজেকে যতটা পারে সংযত রেখে, শান্ত গলায় যা যা ঘটেছে সব সাগরকে বলল সুহিতা। জানাল ওকে কেউ অনুসরণ করছে সে অনুভূতির কথা, বলল রায়হানকে একটি শপিং মলে দেখেছে, মিসেস ডেভিডসনের মৃত্যু, লস এঞ্জেলেসে বাবার বাড়ি যাওয়ার সময় মায়া নেকড়েরা ওর পিছু নিয়েছিল, সব কিছু বিস্তারিত বলল।

সুহিতার গল্প শেষ হবার পরে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল সাগর। শেষে বলল, 'তোমার তা হলে ধারণা রায়হান তোমার পিছু লেগেছে?'

'আমার তাতে কোনই সন্দেহ নেই। কারণ আমি ওকে দেখেছি।'

'ভুল দেখনি তো?'

'না। আর ওর সঙ্গে সেই মহিলা, মার্সিয়া লুমাও আছে।'

'আর কেউ?'

'জানি না। তবে মনে হয় না ওরা দু'জন ছাড়া অন্য কেউ আছে।'

আবার নেমে এল থমথমে নীরবতা। অবশেষে সাগর বলল, 'তো, তুমি এখন আমাকে কী করতে বলছ?'

চট করে মুখ ঘুরিয়ে নিল সুহিতা, জল এসে গেছে চোখে। না কাঁদার চেষ্টা করছে। 'আমি...আমি জানি না, সাগর। আমি এখানে এসেছি কারণ আমার অন্য কারও কাছে যাওয়ার জায়গা নেই। আমি একা ওদের সঙ্গে লড়াই করতে পারব না।'

নিজেকে আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারল না সুহিতা। ফুঁপিয়ে উঠল। জলের ধারা গড়িয়ে পড়তে লাগল গাল বেয়ে। সাগর একটু ইতস্তত করে একটা হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল ওকে, সুহিতা ওর কাঁধে মাথা রেখে কাঁদতে লাগল।

ফোঁপানোর ফাঁকে ফাঁকে মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল শব্দগুচ্ছ।

'আমি জানি এর মধ্যে তোমাকে জড়ানো উচিত হচ্ছে না, সাগর। এটা তোমার লড়াই নয়। আমার কাছে তোমার কোনও ঋণও নেই যে সে দাবিতে তোমাকে সাহায্য করতে বলব। আমি আমার স্বামী এবং ছোট ছেলেটার কাছ থেকে একরকম পালিয়ে এসেছি সঙ্গে থাকলে ওরাও বিপদে পড়তে পারে ভেবে। এখানে এসে বোধহয় তোমাকে বিপদেই ফেলে দিলাম। আমি খুবই দুঃখিত। আমি আসলে বুঝতে পারছি না কী করব।' সাগরের কাঁধ থেকে মাথা তুলল সুহিতা, হাতের বন্ধন থেকে মুক্ত করল নিজেকে। 'আমি চলে যাচ্ছি। চাই না আমার জন্য তোমারও বিপদ হোক। আমি ফিরে যাব...জানি না কোথায় যাব। তবে এখন বুঝতে পারছি এখানে আসা আমার উচিত হয়নি।'

ওর হাত ধরল সাগর। চোখে চোখ রাখল। শান্ত, গভীর গলায় বলল, 'তোমাকে তো আমি এভাবে চলে যেতে দিতে পারি না, সুহিতা। তুমি তো শুধু আমার বান্ধবী নও, তারচেয়েও বেশি। একটা বিপদে পড়েছ। আমার কাছেই তো আসবে। আমার মত

বন্ধু তোমার আর ক'টা আছে শুনি?'

কান্না থেমে গেছে সুহিতার। পটলচেরা ভেজা চোখ, বড় বড় আঁখি পল্লব। কী যে সুন্দর লাগছে ওর কান্নাভেজা মুখটা দেখতে! তুমি যদি জানতে তুমি আমার কী! মনে মনে বলল সাগর।

'একজনও নেই,' মিষ্টি হাসল সুহিতা।

'রাইট,' হাসি ফিরিয়ে দিল সাগর। 'এখন কাজের কথায় আসি। আমরা ছাড়া কেউ জানে না ওয়্যারউলফের অস্তিত্বের কথা। জানে না ভয়ঙ্কর এ প্রাণীগুলো মানুষের কী ক্ষতি করতে পারে। ওদেরকে কীভাবে শায়েস্তা করা যায় সে বুদ্ধি বের করতে হবে।'

সুহিতার শক্ত পেশীতে ঢিল পড়েছে। হ্যাণ্ডব্যাগ খুলে রুমাল বের করল। মুছল অশ্রু। সাগর ওর হাতটা এখনও ধরে আছে। হাতটা ছাড়িয়ে নিল না সুহিতা।

'আমরা কী করব, সাগর? ওদের বিরুদ্ধে কি সত্যি লড়াই করা সম্ভব?'

'আমরা আগেও একবার লড়াই করেছি,' বলল সাগর। 'তবে তখন কাজটা শেষ করতে পারিনি। ওরা কি তোমার পিছু নিয়ে এখানে চলে এসেছে?'

'সেরকম কোনও আলামত এখনও চোখে পড়েনি। তবে আমার ধারণা, আমার প্রতিটি মুভমেণ্ট ওরা লক্ষ করছে।'

'ধরে নিচ্ছি, আমাদের হাতে এখনও খানিকটা সময় আছে। চলো, আগে তোমাকে হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করি। পরে দু'জনে মিলে কী করা যায় ভাবব।'

হাত ধরাধরি করে উঠল দু'জন। নেমে এল সৈকতে। পা বাড়াল হোটেল অভিমুখে। রাস্তায় আর কথা হলো না।

ম্যানেজার ডাভিলা বিনয়ের অবতার সেজে বলল, 'ওহ্, সিনোরা, আপনার ভাগ্য খুব ভাল। বছরের এ সময়টা আমরা খুব ব্যস্ত থাকি, তবে হঠাৎ করেই একটা ঘর খালি হয়েছে। কাবানা নাম্বার

১২। আপনি ওখানে থাকতে পারবেন।'

'ওটা কোথায়?'

'সিনর চৌধুরী যে কাবানায় থাকেন সেই সারির শেষ মাথার ঘরটা।'

'মেইন বিল্ডিংয়ে থাকার ব্যবস্থা করা যায় না?'

'এ মুহূর্তে সম্ভব নয়, সিনোরা।'

'ঠিক আছে। আমি ওটাই নেব।'

সাগর বলল, 'আমি গেলাম। আমাকে অনেকক্ষণ না দেখে লিসার মাথা বোধহয় গরম হয়ে আছে। ওর মাথাটা ঠাণ্ডা করে আসি। ডিনারে দেখা হবে।'

রেজিস্ট্রেশন খাতায় নিজের নাম ইত্যাদি লেখার ফরমালিটিজগুলো সারল সুহিতা। বছর সতেরোর একটি সুদর্শন তরুণ ওর ব্যাগ তুলে নিয়ে চলল কাবানা অভিমুখে। কুটিরের ভেতরটা তেমন জাঁকজমক পূর্ণ নয় তবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। ঘরে রয়েছে একটি ডাবল খাট, ব্যুরো, নাইট-টেবিল, খান দুই চেয়ার, এবং একটি সেটী। ছেলেটি ক্ষুদ্রাকৃতির ক্লজিট এবং বাথরুম দেখিয়ে দিল। জানালা কীভাবে খুলতে হয়, কেমন করে চালাতে হবে হিটার শিখিয়ে দিল।

ছেলেটি বেরিয়ে যাচ্ছে, ঝকমকে চোখের, কড়া লিপস্টিক মাখা ভেজা ঠোঁটের এক তরুণী ঢুকল ঘরে হাতে ধোয়া তোয়ালে নিয়ে। দু'জনের চোখাচোখি হলো। ওদের চাউনি দেখেই সুহিতা বুঝে ফেলল দুই তরুণ তরুণীর মধ্যে মন দেয়া-নেয়ার মত কিছু একটা চলছে।

মেয়েটি চলে যাওয়ার পরে জুতো খুলে ফেলল সুহিতা। হাত-পা ছড়িয়ে টান টান হলো বিছানায়। বুজল চোখ। মনটাকে ভাসিয়ে দিতে চাইল অন্য কোথাও, অন্য কোনখানে, অন্ধকার এ ভুবন থেকে দূরে কোথাও। ঘণ্টাখানেক পরে বিছানায় উঠে বসল সুহিতা। ফ্রেশ লাগছে বেশ। ওর মনে হচ্ছে সবকিছু ঠিক হয়ে

যাবে।

প্রথমে গরম তারপর শীতল পানিতে গোসল সেরে নিল সুহিতা। নীল সিল্কের শাড়ি পরল। ডিনারে সাগর এবং তার বান্ধবী এল। লিসার ঈর্ষান্বিত চাউনি দেখে বুঝতে পারল শাড়িতে ওকে খুব সুন্দর লাগছে।

তবে ডিনারটা জমল না তেমন। টেবিলে বসে ঝগড়া বাধিয়ে দিল সাগর আর লিসা। রীতিমত অস্বস্তিতে পড়ে গেল সুহিতা। শরীর ক্লান্ত লাগছে, এ অজুহাত দেখিয়ে দ্রুত টেবিল ছাড়ল ও। চলে এল কাবানায়।

ঘরে ঢুকে জানালা দরজাগুলো ঠিকঠাক বন্ধ আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখল সুহিতা। জ্বালিয়ে দিল সব ক'টা বাতি। তবে বাল্বের ভোল্টেজ খুবই কম। ঘরের কিনারের ছায়া পুরোপুরি দূর করতে পারেনি। সূর্য অস্ত যাওয়ার পরপরই শীতল হতে শুরু করে কাবানা। সুহিতা বিছানায় ওঠার আগে চালিয়ে দিল হিটার।

বিছানার চাদর পরিষ্কার, বালিশগুলো বেশি ভারী নয়। পাতলা বালিশই পছন্দ সুহিতার। অন্ধকারে অনেকক্ষণ চোখ বুজে রইল ও। শুনছে তীরে ভেঙে পড়া ঢেউয়ের ছলাৎ ছলাৎ আর জঙ্গল থেকে ভেসে আসা রাতের নিজস্ব কিছু শব্দ। আরও অনেকক্ষণ পরে ঘুম নামল চোখে। তবে ঘুমটা গভীর এবং গাঢ় হলো না।

লস এঞ্জেলেসের সর্বশেষ ফ্লাইটটি আকাশে সামান্য বাঁক নিয়ে নামতে শুরু করল মাযাটলান এয়ারপোর্টে। দূর থেকে দেখা যাচ্ছে এয়ারপোর্টের বিচ্ছিন্ন আলো, কালো জঙ্গল আর কৃষ্ণকালো সাগরের মাঝখানে। ট্যুরিস্ট সেকশনে চওড়া কাঁধের, কালো চুলের এক যুবক বসেছে। তার পাশে জানালার ধারে বসা নারীটি নগরীর আলোর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তার সবুজ চোখজোড়া যেন দু'টুকরো আগুন। অন্যমনস্কভাবে সে তার মধ্যরাতের মত কালো চুলের মাঝখানে, সাদা কাটা দাগটাতে হাত ছোঁয়াল।

উনিশ

দিন শুরু হলো উত্তপ্ত সূর্যের তীব্র গরম নিয়ে। সাগর শান্ত, সবুজ কাচের মত, রাতের ভয়টা কেটে গেছে সুহিতার। খিদে নিয়ে ঘুম ভেঙেছে ওর। সাগরের সঙ্গে দেখা করতে হবে। দিনের প্রথম কাজ এটা। তারপর ওর সঙ্গে নাশতা করবে। মনে পড়ল সাগর একা নয়। কাজেই এ মুহূর্তে ওর কাছে না যাওয়াই ভাল। লিসা ভ্যান্স তার আচরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে 'সাগর আমার'। বোকা মেয়েটা অবশ্য জানে না সাগরের ওপর কোনও দাবি নেই সুহিতার। সে সাগরকে লিসার কাছ থেকে কেড়ে নিতে যাচ্ছে না। তবে লিসার মুখোমুখি হতে চাইছে না ও খামোকা জটিলতা সৃষ্টির ভয়ে। যদিও সাগরকে ওর একা পাওয়া দরকার প্ল্যান-প্রোগ্রাম করার জন্য।

দরজায় করাঘাত হলো। নাইটির ওপর একটা চাদর পেঁচাল সুহিতা, খুলল দরজা। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে লম্বা, সুদর্শন সেই তরুণ। মুখে ঝকমকে হাসি। হাতের ট্রেতে ধোঁয়া ওঠা কফির পট, একটি কাপ এবং মিষ্টি রোল। ছেলেটির পেছনে, কাবানার সঙ্গে লাগোয়া ফুটপাতে একটি ধাতব কার্টে আরও কিছু ট্রে এবং কফির পট চোখে পড়ল সুহিতার।

'*বুয়েনাস ডিয়াস*, সিনোরা। আপনার সকালের কফি, হোটেল কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে।'

'ধন্যবাদ,' ছেলেটির দিকে তাকিয়ে হাসল সুহিতা।

'আপনি কফিতে দুধ-চিনি খান?'

'না, ধন্যবাদ। আমি ব্ল্যাক কফি পছন্দ করি।'

'কোনও কিছুর প্রয়োজন হলে আমাকে দয়া করে ডাকবেন, সিনোরা।'

'কমো সে ইলামা?' স্বল্প জানা স্প্যানিশ বিদ্যার দৌড় ঝালাই করল সুহিতা।

মুখের হাসি চওড়া হলো ছেলেটির। *'মি. ইলামো রবার্টো।'*

'ঠিক আছে, রবার্টো। প্রয়োজন হলে তোমাকে আমি ডাকব।'

চলে গেল ছেলেটি। সুহিতা কফি নিয়ে ঘরে ঢুকল। পট থেকে এক কাপ কফি ঢেলে চুমুক দিল। তেমন স্বাদ নেই।

গোসল সেরে জামা-কাপড় পরল সুহিতা। অন্যান্য কাবানার পাশ কাটিয়ে পা বাড়াল মূল ভবনে। লক্ষ করল সাত নাম্বার কাবানার জানালার খড়খড়ি বন্ধ। মূল হোটেলে ঢুকল সুহিতা। লবি পার হয়ে চলে এল ডাইনিং-রুমে। অনেকে এখানে সকালের নাশতা খাচ্ছে।

অন্যদের থেকে খানিকটা দূরের একটি টেবিল বেছে নিল সুহিতা। চোখ বুলাল মেনুতে। মেক্সিকান খাবার বাদ দিয়ে শুধু ডিম ভাজার অর্ডার দিল। ওদের অমলেটের স্বাদ খারাপ না তবে টোস্টগুলো শুকনো, গলা দিয়ে নামতে চায় না। আলুভাজা প্রায় পুড়িয়ে ফেলেছে। কফির স্বাদ যথারীতি ম্যাড়মেড়ে। কিন্তু তবু ওই কফিই পান করল সুহিতা।

নাশতা সেরে নিজের কাবানায় ফিরল সুহিতা। ট্রাউজার্স আর টীশার্ট পরে হাঁটতে বেরুল সৈকতে। কোত্থেকে ছুটে এল রবার্টো। হাতে ফোল্ডিং চেয়ার।

সুহিতা চেয়ার পেতে এমন একটা জায়গায় বসল যেখান থেকে কাবানার সারি এবং হোটেলের সামনের অংশটা দেখা যায়। দুপুরের খানিক আগে কাবানা থেকে বেরিয়ে এল সাগর, সূর্যের আলোয় পিট পিট করছে চোখ। সৈকতে পা বাড়াল ও, দেখে ফেলল সুহিতাকে। এগিয়ে এল ওর দিকে। সাগরের পরনে শুধু

সাদা সুইমিং ট্রাঙ্ক। হাঁটার তালে রোদে পোড়া চামড়ার নীচে কিলবিল করে উঠছে পেশী।'

'গুড মর্নিং,' বলল সাগর।

'হাই। আশাকরি আমার সঙ্গে কথা বলতে এসে কারও বিরাগভাজন হতে যাচ্ছ না।'

'আহ্, থামবে তুমি। লিসাটাকে নিয়ে আর পারি না। তার ধারণা তুমি এখানে এসেছ শুধু আমাকে পেতে। বললাম তুমি আমার বান্ধবী। কিন্তু মানতে চাইল না।'

'আচ্ছা? তো কী বলল?'

'ওর কথা বাদ দাও। তোমার কথা বলো।' সাগর সুহিতার পায়ের কাছে, বালুর ওপর বসল।

'আমি আর কী বলব? তুমি কোনও বুদ্ধি বের করতে পারলে?'

ঢেউয়ের দিকে চোখ রেখে জবাব দিল সাগর। 'ওরা কোনও পদক্ষেপ না নেয়া পর্যন্ত আমাদের চুপচাপ থাকাই ভাল।'

ঝট করে ওর দিকে ঘুরল সুহিতা। 'পদক্ষেপ? তুমি কি বলতে চাইছ ওরা কাউকে হামলা না করা পর্যন্ত আমরা বসে থাকব?'

সুহিতার দিকে মুখ ফেরাল সাগর। গম্ভীর। 'তোমার কাছে এরচেয়ে ভাল কোনও বুদ্ধি আছে?'

'আ...ইয়ে মানে জানি না। আমি ভেবেছি তুমি জাদুমন্ত্রের মত আমার সমস্ত সমস্যার সমাধান করে দেবে। আমি দুঃখিত, সাগর। আমার আসলে এখানে আসা একদমই উচিত হয়নি। এর মধ্যে আবার তোমাকে টেনে নিয়ে আসা ঠিক হচ্ছে না।'

'বাদ দাও তো,' বলল সাগর। 'তুমি আমার কাছে এসেছ কারণ আর কেউ তোমাকে সাহায্য করতে পারত না। তুমি ঠিক কাজই করেছ। মাথাটা ঠাণ্ডা রাখো। ভাবো এখন কী করা উচিত।'

গভীর দম নিল সুহিতা, হাসল মৃদু। 'আচ্ছা, মাথা ঠাণ্ডা রাখলাম। এখন বলো কী করা উচিত?'

'তোমার কি মনে হয় ওরা তোমার পিছু নিয়ে এখানে চলে আসতে পারে?' জিজ্ঞেস করল সাগর। 'মার্সিয়া এবং রায়হান?'

'আমি নিশ্চিত ওরা আসবেই। লস এঞ্জেলেসে আমাকে খুঁজে বের করতে ওরা খুব বেশি সময় নেয়নি। জানি না কীভাবে, তবে মনে হচ্ছে আমার প্রতিটি মুভমেন্টের খবর ওরা রাখে। ওরা ইতিমধ্যে এখানে চলে এলে অবাক হব না মোটেই।'

'ঠিক আছে, সবচেয়ে খারাপ দিকটাই আগে চিন্তা করা যাক। ধরে নাও, ওরা মাযাটলানে পৌঁছে গেছে এবং তুমি কোথায় আছ তা ওরা জানে। ওদেরকে খুঁজে পাবার সেরা সময় হচ্ছে দিনের বেলা। ওইসময় ওদের বিশেষ কোনও ক্ষমতা থাকে না। সূর্যাস্তের পরে, একবার ওয়্যারউলফে রূপান্তর ঘটলেই ওরা চলে যায় ধরাছোঁয়ার বাইরে। তখন আগুন আর সিলভার বুলেট ছাড়া আর কোনও কিছু দিয়ে ওদের মোকাবেলা করা সম্ভব নয়।'

'রাতের বেলা ওদের মুখোমুখি যদি হতে না পারি, দিনের বেলা কী করে ওদের সন্ধান পাব?'

'সন্ধান পেতে হবে না,' বলল সাগর। 'বরং ওরাই আমাদেরকে খুঁজে নেবে। বলা উচিত তোমাকে খুঁজে নেবে। কারণ ওরা তোমার পেছনে লেগেছে। রাতের বেলা যত ক্ষমতাই থাকুক না, নেকড়ে হয়ে লোকালয়ে যত্রতত্র ঘুরে বেড়ানোর অবকাশ ওদের নেই। সিয়াটলের কথাই ধরো। আগে মানুষের রূপ ধরে ওরা তোমাকে খুঁজে বের করেছে। তারপর সুযোগ বুঝে নেকড়ে রূপে তোমার ওপর হামলার চেষ্টা করেছে। দিনের বেলা আমাদেরকে সাবধান থাকতে হবে, খোলা রাখতে হবে চোখ-কান।'

'আর রাতের বেলা?' প্রশ্ন করল সুহিতা।

'তখন তো কয়েকগুণ বেশি সতর্ক থাকতে হবে।'

'তোমার কি মনে হয় দিনের বেলা আমাদের চোখে ধরা দেয়ার মত বোকামো ওরা করবে?'

'এটাকে আমি বোকামো বলব না,' বলল সাগর। 'তোমাকে ওদের চেহারা দেখতে দেয়াটা ওদের পরিকল্পনারই একটা অংশ। হামলার আগে তোমাকে ভয়ে আধমরা করে ফেলতে চায়।'

'আমি তো ভয়ে আধমরা হয়েই আছি,' বলল সুহিতা। ওদের পায়ের কাছে এক সুতনুকার ছায়া পড়ল।

'কী, দু'জনে মিলে খুব আড্ডা হচ্ছে, না?'

ঘাড় ঘুরিয়ে চাইল সুহিতা। ওর চেয়ারের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে লিসা ভ্যান্স। আড়ষ্ট হাসল সে। চোখ জোড়া অস্থিরভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে সাগর এবং সুহিতার ওপর। সন্দেহ নেই মেয়েটা শরীরী সম্পদে ভরপুর। পরনের ওয়ান-পিস গোলাপি সুইমসুট এতই পাতলা, ভরাট যৌবনের খাঁজভাঁজগুলো তাতে প্রকট।

'হাই,' বলল সাগর। 'লাঞ্চের জন্য রেডি?'

'হ্যাঁ। অবশ্য ইতিমধ্যে তুমি যদি উদর-পূর্তি করে না থাকো।'

লিসার শ্লেষ গায়ে মাখল না সাগর। খাড়া হলো সে, হাত দিয়ে কাপড়ের বালু ঝাড়ল। 'আমি সাঁতার কাটতে গেলাম। একটু পরেই যোগ দেব তোমার সঙ্গে।' সুহিতাকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'এই মেয়েটা আমাকে সাঁতারু না বানিয়ে ছাড়বে না।'

পানিতে নেমে গেল সাগর। এগিয়ে আসা একটা ঢেউ লক্ষ্য করে লাফ দিল। কয়েক সেকেণ্ডের জন্য দুই নারীর চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হলো, তারপর আবার ভুস করে ভেসে উঠল সারফেসে।

'সাগরকে কি আপনি অনেকদিন ধরে চেনেন?' জিজ্ঞেস করল লিসা।

'হ্যাঁ। ও আমার প্রথম স্বামীর বন্ধু ছিল।'

'নো কিডিং।'

লিসার চেহারা এবং কণ্ঠ শুনে মনে হলো সে নিশ্চিত সাগরের সঙ্গে সুহিতার বন্ধুত্ব নিছক বন্ধুত্ব নয়, ওদের সম্পর্ক আরও

গভীরে প্রোথিত। নাহ্, এ ব্যাপারটা একটা ফয়সালা করা দরকার। সুহিতা চেয়ার ছাড়ল। মুখোমুখি হলো লিসার।

'একটা ব্যাপার তোমার জানা থাকা দরকার,' বলল ও। 'তুমি আমার বয়সে ছোট তাই তুমি করেই বললাম। শোনো, তোমার সঙ্গে সাগরের যে সম্পর্কই থাকুক না কেন তাতে আমার কিছু যায় আসে না। সাগর আমার একজন ভাল বন্ধু। আমি এখানে এসেছি আমার বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে। দ্যাটস অল।'

'নিশ্চয় আপনারা ভাল বন্ধু,' চোখ বড়বড় করে বলল লিসা। 'আমি অন্য কিছু ইঙ্গিত করিনি, করেছি কি?'

শিশুর মত নিষ্পাপ দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকা লিসার দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল সুহিতা, তারপর ঘুরে দাঁড়াল।

'ঢঙি!' দাঁতে দাঁত ঘষল ও।

লিসা শুনতে পেয়েছে কিনা জানে না সুহিতা। শুনলেও কোনও প্রতিক্রিয়া দেখাল না।

জগিং করতে করতে এল সাগর। ভেজা চুল দিয়ে ছিটকে পড়ছে নোনা জল।

'চলো,' বলল লিসাকে। তাকাল সুহিতার দিকে। 'আমাদের সঙ্গে লাঞ্চ করবে?'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করল সুহিতা, তারপর বলল, 'না, ধন্যবাদ। আমি সকালে ভরপেট নাশতা খেয়েছি।'

সাগর এবং লিসা নিজেদের কাবানায় পা বাড়াল। লিসা একটা হাত ঢুকিয়ে দিল সাগরের বগলের নীচে। ঘুরল সুহিতা সৈকতের দিকে। দেখল রবার্টো হেঁটে যাচ্ছে। হাত তুলে ওকে ডাকল সুহিতা। ছুটে এল রবার্টো মুখে হীরকদ্যুতি ছড়িয়ে।

'সি, সিনোরা?'

'আমাকে একটা ছাতা এনে দেবে, রবার্টো? রোদের তাপটা খুব লাগছে।'

সজোরে মাথা ঝাঁকাল তরুণ। এক ছুটে চলে গেল হোটেলের

পেছন দিকে। একটু পরে ফিরল কমলা-সবুজ রঙের বিরাট বীচ ছাতা নিয়ে। সুহিতার চেয়ারের পাশে, বালুতে গাঁথল ছাতা। মেলে দিল। পরখ করে দেখল পর্যাপ্ত ছায়া পড়েছে কিনা সুহিতার গায়ে।

সুহিতা ওর ব্যাগে হাত ঢোকাল, তারপর ক্ষমা-প্রার্থনার ভঙ্গিতে তাকাল রবার্টোর দিকে। 'আমি বোধহয় রুমে টাকা ফেলে এসেছি।'

'কোনও সমস্যা নেই, সিনোরা,' বলল রবার্টো। 'আমাকে বকশিস দিতে চাইলে পরেও দিতে পারবেন।' হাসিটা মুখে ধরে রেখে আরেক অতিথির দিকে কদম বাড়াল সে। লোকটা খালি মদের গ্লাস উঁচিয়ে দেখাচ্ছে রবার্টোকে।

ছাতার নীচে, ছায়ায় আরাম লাগছে সুহিতার। চোখ বুজল ও। ঢেউয়ের অবিরাম গর্জন যেন ঘুম পাড়ানি গান, ফুরফুরে বাতাসটা মায়ের আদর। ঘুম এসে গেল ওর। কতক্ষণ পরে জানে না, একটা ঝাঁকি খেয়ে জেগে গেল ও। পশ্চিমে ঢলে পড়েছে সূর্য, রোদ লাগছে পায়ে আর পায়ের গোছে। লাঞ্চের সময় শেষ। তবু ডাইনিং-রুমে যাবে ঠিক করল সুহিতা। যদি স্যাণ্ডউইচ পাওয়া যায়।

ব্যাগ তুলে নিল সুহিতা। বালুতে পা মাড়িয়ে চলল হোটেলে। মূল ভবনে এসেছে, ব্যাডমিণ্টন কোর্টের পাশে মানুষজনের ভিড় দেখল। লোকজন কেন ভিড় জমিয়েছে দেখতে ওদিকে গেল সুহিতা। ঘাসে ভরা কোর্টে, হাসতে হাসতে ব্যাডমিণ্টন খেলছে সাগর এবং লিসা। সাগরের পরনে সাদা ট্রাঙ্ক, স্ট্রাইপ্‌ড্ রাগবি শার্ট। লিসা পোশাক বদলে পরেছে নীল শর্টস এবং হল্টার। বেশ মানিয়েছে দুটিতে। মধ্যবয়সী দর্শকদের চোখে প্রশংসা।

লিসা হঠাৎ চোখ তুলে তাকাল। দেখে ফেলল সুহিতাকে। লিসার ঝকমকে চোখে বিজয় উল্লাস। মেয়েটা হয়তো ভাবছে, দ্যাখো তোমার তথাকথিত বন্ধু আমার সঙ্গে কেমন মজেছে। মেয়েটার মাথায় বুদ্ধিশুদ্ধির বালাই একেবারেই নেই, বিরক্ত হয়ে

ভাবল সুহিতা। সুহিতাকে সে তার প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবেছে। লিসার হাসির জবাবে মৃদু হাসল সুহিতা। চলে এল ওখান থেকে। লন পার হয়ে হোটেলে ঢুকল।

লবিতে, নিজের ডেস্কে বসা ম্যানেজার ডাভিলা সুহিতাকে দেখে অভ্যর্থনার ভঙ্গিতে হাসল।

'এখন কি লাঞ্চ পাওয়া যাবে?' জিজ্ঞেস করল সুহিতা।

'কেন পাওয়া যাবে না, সিনোরা অ্যাডামস? প্লীজ, ভেতরে যান।'

'ধন্যবাদ।' ডাইনিং-রুমে পা বাড়াল সুহিতা।

'আপনার বন্ধুটির সঙ্গে কি সৈকতে দেখা হয়েছে?' জানতে চাইল ম্যানেজার।

'কে, সাগর? হ্যাঁ। দেখা হয়েছে।'

ডাভিলাকে বিস্মিত দেখাল। 'না, সিনোরা। এক ভদ্রমহিলা আপনার খোঁজ করছিলেন।'

শিরদাঁড়া দিয়ে বরফ জল নামল। 'মিস ভ্যান্স?'

'না। আপনার আরেক বন্ধু। কালো চুল, গায়ের রঙ ফর্সা। আপনার খোঁজ করছিলেন। বললাম আপনি সৈকতে আছেন। কোনও সমস্যা?'

স্থির দৃষ্টিতে ম্যানেজারের দিকে তাকিয়ে আছে সুহিতা। 'কালো চুলের এক মহিলা এসেছিল এখানে? আমার খোঁজ করছিল?'

চিন্তাক্লিষ্ট দেখাল ম্যানেজারকে। 'সি, সিনোরা। আপনার মতই কালো চুল মহিলার। লম্বা। কপালে একটা কাটা দাগ আছে। বললেন উনি আপনারা বন্ধু। আপনার কথা তাকে বলে দিয়ে কোনও সমস্যা করলাম না তো?'

'না... ঠিক আছে,' আবছা গলায় বলল সুহিতা। ঘুরল ও, বেরিয়ে যাচ্ছে।

'লাঞ্চ করবেন না, সিনোরা?' পেছন থেকে হাঁক ছাড়ল

ম্যানেজার।

'খিদে নেই,' পেছনে না তাকিয়েই বলল সুহিতা।

ব্যাডমিণ্টন কোর্টে চলে এল ও। লোকজনের ভিড় কাটিয়ে সোজা এসে দাঁড়াল সাগরের সামনে। সাগর তখন সার্ভ করতে যাচ্ছে।

'তোমার সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি?' বলল সুহিতা। সুহিতার কণ্ঠের জরুরী আবেদনটুকু বুঝতে পারল সাগর। 'কী হয়েছে?'

'ওরা এখানে এসে পড়েছে। মার্সিয়া রিসেপশনে আমার খোঁজ করেছে।'

কপালে ভাঁজ পড়ল সাগরের। 'আমরা লাঞ্চ করার সময় এক মহিলাকে দেখেছি ট্যাক্সি ক্যাব থেকে নামছে। ম্যানেজারের সঙ্গে কী কথা বলে চলে গেল।'

'মহিলা দেখতে কেমন?'

'লম্বা। হালকা-পাতলা গড়ন। চোখে সানগ্লাস। লম্বা, কালো চুল।'

'কপালে কাটা দাগ আছে?' মাথা ঝাঁকাল সাগর।

'ও-ই। ভুলে গেছিলাম মার্সিয়া লুরাকে তুমি কখনও দেখনি। অন্তত মানুষের চেহারায়।'

দর্শকরা ওদেরকে কৌতূহলী চোখে দেখছে। নেটের ওপাশে নিতম্বে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে লিসা। 'কোথাও বসা যায় না?' জিজ্ঞেস করল সুহিতা।

'হুঁ। চলো।' ফুলের ছাপঅলা এক মোটকুর হাতে নিজের র‍্যাবেটটা তুলে দিল সাগর। 'আমার হয়ে খেলুন।' লিসাকে বলল, 'আমি এক্ষুণি আসছি।'

কোর্ট থেকে বেরিয়ে এল দুজনে। মোড় ঘোরার আগে লিসার চোখে চোখ পড়ল সুহিতার। প্রবল ঘৃণায় ধকধক্ জ্বলছে চোখ জোড়া।

মাযাটলানের পুরানো মেক্সিকান শাখার একটি ক্যান্টিনার পেছনের টেবিলটি দখল করেছে রায়হান মর্তুজা। ক্যান্টিনার ভেতরটা অন্ধকার। টেবিলের ওপর ছড়িয়ে রাখা নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে আছে সে। মার্সিয়া লুরার পায়ের শব্দে মুখ তুলে তাকাল।

মার্সিয়া রায়হানের পাশে চেয়ার টেনে বসল। ঝুঁকে এল সামনে। ফিসফিসে গলার স্বরে উত্তেজনা।

'ও এখানে।'

ভাবলেশশূন্য চোখে ওর দিকে তাকাল রায়হান। মুখে কিছু বলল না।

'আমার কথা শুনছ তুমি? বললাম ও এখানে এসেছে। আমি দেখেছি ওকে।'

'শুনলাম তো?'

'এতক্ষণে ও নিশ্চয় আমার কথা জেনে গেছে। বুঝতে পারবে ওর পালাবার রাস্তা নেই।'

রায়হান চুপ করে রইল। মার্সিয়া ঘুরে ওর পেছনে চলে এল। লম্বা আঙুলগুলো ঢুকিয়ে দিল রায়হানের ঘাড়ের পেছনের চুলে। ম্যাসেজ করে দিতে লাগল জায়গাটা।

'বুঝতে পারছ না তুমি?' বলল মার্সিয়া। 'ওকে ধাওয়া করার সমাপ্তি এখানে।'

আরামে চোখ বুজে আসছে রায়হানের। 'খুশি হলাম,' সংক্ষেপে বলল শুধু ও।

রায়হানের কানে ঠোঁট ঘষল মার্সিয়া। 'ওর সঙ্গে কে আছে জানো?'

'সুহিতার সঙ্গে কেউ আছে নাকি? আমি তো ভেবেছি ও একা।'

'ছিল। তবে এখানে এসে একজনকে জুটিয়ে নিয়েছে।' মার্সিয়ার গরম জিভ রায়হানের কানে উত্তেজক ভঙ্গিতে ঢুকছে আর বেরুচ্ছে।

চেয়ারটা ঘুরিয়ে নিয়ে মার্সিয়ার মুখোমুখি বসল রায়হান।

'কে? কাকে জুটিয়ে নিয়েছে সে?'

'তোমার পুরানো বন্ধু, রায়হান। তোমার সাবেক স্ত্রীরও বন্ধু।'

'সাগর চৌধুরী? সাগর এখন মাযাটলানে?'

'তুমি নিশ্চয় ভাবছ না সুহিতা বিনা কারণে এখানে চলে এসেছে?'

'ওরা দু'জনে এখন একসঙ্গে আছে?'

'একসঙ্গে মানে খুবই কাছাকাছি। দু'জনেই প্যালেসিও ডি মার হোটেলে উঠেছে। শহরের উত্তরে হোটেলটা। খুব নির্জন। প্রেমিক-প্রেমিকাদের প্রেম করার উপযুক্ত জায়গা। আর আমাদের জন্যও উপযুক্ত জায়গা।'

সুহিতা সাগরের সঙ্গে আছে শুনে ঈর্ষার তীব্র একটা খোঁচা লাগল রায়হানের বুকে। ঘোঁত করে একটা গর্জন ছাড়ল। রাগে বেরিয়ে পড়েছে দাঁত। সুহিতার প্রতি সাগরের দুর্বলতার কথা ওর অজানা নয়। জানে সুহিতাও সাগরকে খুব পছন্দ করে। ওরা দু'জনে এখন কী করছে কে জানে? হয়তো এ মুহূর্তে বিছানায়...

মার্সিয়া লক্ষ করছে রায়হানকে। ওর মুখের কিনারায় ফুটল হাসির রেখা।

'আজ রাতে, রায়হান, আমরা চরম শোধ নেব।'

বিশ

সন্ধ্যায় সাগর সুহিতাকে ধরে বসল সুহিতা যেন ডিনারটা ওদের সঙ্গে করে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি হলো সুহিতা। লিসার সঙ্গ

উপভোগ্য হবে না জানে ও, তবু একা থাকার চেয়ে ডিনারে অংশ নেয়া ভাল। মার্সিয়া হোটেলে এসে ওর খোঁজ-খবর নিয়ে গেছে জানার পর থেকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে সুহিতা।

কাবানায় বসে কাপড় পরতে পরতে উৎকণ্ঠিত চোখে জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখল দিগন্তের কোলে ডুব দেয়ার আয়োজন করছে অস্তগামী সূর্য। দিনের উষ্ণতা ফুরোয়নি এখনও কিন্তু হোটেলের রাস্তায় হাঁটার সময় শরীরটা বারবার শিউরে উঠল সুহিতার। যেন শীত কাঁটা দিচ্ছে গায়ে।

ডাইনিং-রুমে ওর জন্য অপেক্ষা করছিল সাগর আর লিসা। সাগরকে হাসিখুশি দেখাচ্ছে। আর লিসার মুখ যথারীতি রাম গড়ুরের ছানা। টাইটফিটিং ক্যাম্পসুট পরেছে মেয়েটা। লালচে বাদামী চুলগুলো ঝলমলে। সুহিতার ওপর থেকে একবারের জন্যেও দৃষ্টি সরাল না সে।

'তুমি আমাদের সঙ্গে ডিনারে এসেছ বলে আমরা আনন্দিত, দাঁত দেখিয়ে বলল লিসা। 'তোমাকে তুমি বললাম বলে কিছু মনে করনি তো? যদিও তুমি বয়সে আমার বড়।'

'না, কিছু মনে করিনি,' বলল সুহিতা। ফোড়নটা গায়ে মাখল না। খুক করে কাশল সাগর, মেনুতে চোখ বুলাতে বুলাতে বলল, 'আমি কাঁকড়ার মাংস খাব। তোমরা?'

সংক্ষিপ্ত, অস্বস্তিকর নীরবতা। তারপর লিসা বলল, 'আমি স্টিক নেব। মিডিয়াম। মেক্সিকান খাবার আমার মোটেও ভাল্লাগে না।'

'আমার শুধু সালাদেই চলবে,' জানাল সুহিতা। লবির আর্চওয়েতে বারবার তাকাচ্ছে। এখান থেকে মেইন এন্ট্রান্স দেখা যায়। তারপর কাচের দরজার ওপাশে বাইরের কালো আকাশ।

'ছুটিতে এসে ডায়েট না করাই উচিত,' বলল লিসা। 'ওজন অল্প একটু বাড়লই না হয়। রিল্যাক্স। জীবন তো একটাই।'

অন্য সময় হলে মেয়েটার এ কথার যুৎসই একটা জবাব দিত

সুহিতা। কিন্তু ওর এখন তর্ক করতে ইচ্ছে করছে না। বলল, 'আমার তেমন খিদে নেই।'

'মেক্সিকোতে বেড়াতে এলে কারও কারও এরকম হয়,' পণ্ডিতের মত বলল লিসা। 'এখানকার পানি খেয়ে খিদে নষ্ট হয়ে যায়। তাই এখানকার পানি পান না করাই ভাল।'

সাগর হাত ইশারায় ডাকল ওয়েটারকে। ডিনারের অর্ডার দিল। ওদের সঙ্গে জমিয়ে তোলার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলো। লিসা মুখটা প্যাঁচার মত করে বার দুই ফিরিয়ে দিল স্টিক ঠিকমত রান্না করা হয়নি এ অজুহাতে। সুহিতা সাগরের কথার পিঠে কথা চালিয়ে নেয়ার চেষ্টা করল বটে তবে সারাক্ষণই ও সিঁটিয়ে রইল আজকের রাতটিতে কপালে না জানি কী দুর্ভোগ আছে সে দুশ্চিন্তায়।

ওদের খাওয়া শেষ হবার পরে এল ওয়েটার। খালি বাসনকোসন নিয়ে চলে গেল। সাগর মেক্সিকান মিষ্টি কেক আর কফি আনতে বলল ডেসার্ট হিসেবে। লিসা চা খাবে। কিন্তু চা নেই শুনে আবার মুখ গোমড়া হলো তার।

ডেসার্ট এল। খাওয়া শেষ হওয়ার পরে সুহিতা লক্ষ করল ওরা ছাড়া আর কেউ নেই ডাইনিং-রুমে। সাগর যে ইচ্ছে করেই দেরি করছে বুঝতে পারল সুহিতা। লিসা প্রতি দু'তিন মিনিট পরপর ঘড়ি দেখল।

এখানে আর বসে থাকতে ভাল্লাগছে না সুহিতার। কিন্তু একা, অন্ধকারে নিজের কাবানায় ফিরে যাওয়ার কথা ভাবলেই ঠাণ্ডা হয়ে আসছে গা-হাত-পা। সাগরকে বলবে নাকি ওকে যেন কাবানায় পৌঁছে দেয়? কিন্তু লিসা যদি সাগরকে ছাড়তে রাজি না হয়? উল্টো একটা সিনক্রিয়েট করে বসে!

ও কিছু বলার আগেই লিসা বলে উঠল, 'মাঝ রাত পর্যন্ত এখানে বসে দুনিয়ার সবচেয়ে বিস্বাদ কফি পান করার যদি ইচ্ছে থাকে তোমাদের, করো। আমি একটু বাথরুমে গেলাম।'

টেবিল ছাড়ল লিসা, মেঝেতে খটখট্ হিলের শব্দ তুলে থমথমে চেহারা নিয়ে এগোল লবিতে।

'তুমি আমাকে আমার ঘরে পৌঁছে দেবে?' অনুরোধ করল সুহিতা।

'ওই ঘরে তোমার একা থাকা চলবে না,' বলল সাগর। 'মার্সিয়া তোমার খোঁজ-খবর নিয়ে গেছে। কে জানে ও আজ রাতেই তোমার ওপর হামলা চালানোর মতলব করেছে কিনা।'

শিউরে উঠল সুহিতা। 'কিন্তু আমি কী করব? ম্যানেজারকে বলেছিলাম। কিন্তু সে বলল মেইন বিল্ডিংয়ে কোনও ঘর খালি নেই। সারারাত তো আর লবিতে বসে থাকতে পরব না।'

অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে চোয়ালে হাত ঘষল সাগর। 'তুমি আমাদের ঘরে থাকতে পার।'

'সারা রাত?'

'অন্য কোনও বিকল্প তো আপাতত দেখছি না।'

'লিসা তোমাকে ছিঁড়ে খাবে।'

'লিসা জানুক সবসময় ওর ইচ্ছেয় সবকিছু চলে না।'

'তুমি ওকে ঘটনাটা বলনি?'

'ড্রাগো আর ওয়্যারউলফের কথা?'

'হুঁ।'

'না। বললে বিশ্বাস তো করবেই না, হেসে কুটিপাটি হবে। আমাকে পাগল ঠাওরাবে। ওর ধারণা তুমি আমার লাভার। ভাবুক গে। কিছু আসে যায় না।'

'আমাকে নিয়ে তোমাদের সম্পর্কে টানাপোড়েন শুরু হয়েছে, না?'

'টানাপোড়েন শুরু হয়েছে আরও আগেই। ও মেয়ের সঙ্গে প্রেম করা যায় না।'

টেবিলে ফিরে এল লিসা। বসল। মুখখানা আগের মতই থমথমে। নিজেকে অপরাধী মনে হলো সুহিতার। ওর কারণেই

তো লিসার সঙ্গে সাগরের ঝগড়া।

লিসা কফির কাপ ঠোঁটে তুলল তারপর ঠকাশ করে নামিয়ে রাখল পিরিচে। 'এমন বিশ্রী জিনিস আর মুখে তোলা যায় না।'

সাগর গলায় মধু মাখিয়ে বলল, 'একটা কাজ করা যাক, লিসা। এয়ারপোর্ট থেকে কিনে আনা টেকুইলার একটা বোতল এখনও খোলা হয়নি। রাতটা গল্প করে আর মদ পান করে কাটিয়ে দিলে কেমন হয়?'

'সুহিতা বোধহয় ক্লান্ত,' দ্রুত বলল লিসা। 'ও তো আজ সকালে তাড়াতাড়ি উঠেছে ঘুম থেকে।'

সুযোগটা কাজে লাগাল সুহিতা। 'আমি একদমই ক্লান্ত নই।' উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত হলো ও। 'সারা রাত জেগে গল্প করার ব্যাপারটাই অন্য রকম। সাগরের সঙ্গে কত মজার মজার স্মৃতি আছে আমার। এ সুযোগে ঝালিয়ে নিতে পারব স্মৃতিগুলো। তোমার শুনতে খারাপ লাগবে না, লিসা। আর তোমার সম্পর্কেও তো আমি তেমন কিছু জানি না। তোমার কথাও শুনব।'

'তোমার কথাও আমি শুনতে চাই,' বলল লিসা।

'বেশ,' বলল সাগর। 'তা হলে ওই কথাই রইল। আজ রাতটা হবে ম্যারাথন আড্ডার রাত।'

ওয়েটারকে ডেকে বিল মিটিয়ে দিল সাগর। তিনজনে টেবিল ছাড়ল, আর্চওয়ে ধরে এগোল। ডেস্কের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দাঁড়িয়ে পড়ল সাগর।

'আচ্ছা, আমাদের রুমে গ্লাস আছে ক'টা?'

'আমি ঠিক জানি না,' বলল লিসা।

'যদ্দূর মনে পড়ে দুটো। পানি খাওয়ার দুটো বড় গ্লাস।' ডেস্কে এগিয়ে গেল ও। ম্যানেজারকে বলল, 'সাত নাম্বারে কয়েকটা ছোট গ্লাস পাঠাতে পারবেন?' সিনর ডাভিলা ইচ্ছে করেই দুই নারীর দিকে তাকাল না।

'অবশ্যই, সিনর চৌধুরী।' পেশাদারী হাসি দিল সে।

'আমাদের মেয়েটা আপনাদের ঘরে পৌঁছে দেবে গ্লাস।'

'সঙ্গে কিছু লেবু এবং লবণও পাঠাবেন,' বলল সাগর। মেয়েদেরকে উদ্দেশ্য করে যোগ করল, 'টেকুইলা টিজুয়ানা স্টাইলে কীভাবে মদ পান করতে হয় আজ তোমাদের শিখিয়ে দেব।'

'হুপ্পি,' ঠোঁট গোল করে শিস দিল লিসা।

বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে এল ওরা, স্বল্প দূরত্ব পার হয়ে চলে এল সারির প্রথম কাবানায়। এখানেই সাগর আর লিসা থাকে। দরজা খুলল সাগর। ভেতরে ঢুকল ওরা। সুহিতার ঘরের মতই, সাজানো-গোছানো।

ওদেরকে সেটিতে বসতে দিয়ে নিজে একটা চেয়ার টেনে নিল সাগর। চেয়ার আর সেটির মাঝখানে টেনে আনল ছোট একটি টেবিল। ড্রয়ার থেকে বের করল এক বোতল টেকুইলা! বোতল খুলে গন্ধ শুঁকল।

'আমাদের মানসিক যন্ত্রণা দূর করে দেবে এ জিনিস,' মৃদু গলায় বলল সাগর।

সুহিতা এবং লিসা ওর দিকে তাকাল ভাবলেশশূন্য চেহারায়।

দরজায় নক্ হলো। সুন্দরী পরিচারিকা ব্লাঙ্কা ঢুকল ঘরে। হাতের ট্রেতে এক বাটি সুবিন্যস্ত ভাবে কেটে রাখা তাজা লেবু এবং তিনটি ডাবল শট গ্লাস, লবণদানি সহ।

'এবারে জমবে পার্টি,' জোর করে মুখে হাসি ফোটাল সাগর। একটা নোট বাড়িয়ে দিল ব্লাঙ্কার দিকে। মেয়েটি টাকাটা গুঁজে রাখল ব্লাউজের ভেতরে।

'গ্রাসিয়াস, সিনর,' চোখের পাতা অল্প কাঁপাল ব্লাঙ্কা। এক ঝলক তাকাল লিসা আর সুহিতার দিকে। তারপর চলে গেল পেছনে দরজা বন্ধ করে।

বাইরে এসে বুকের দুই উষ্ণ উপত্যকার মাঝখান থেকে টাকাটা বের করল ব্লাঙ্কা। আমেরিকান পাঁচ ডলারের নোট। আজ

রাতটা যে ওর ভাল কাটবে তার ইঙ্গিত।

ব্লাঙ্কা হোটেলের পেছনে একটা ইউটিলিটি শেডে চলে এল দ্রুত পা চালিয়ে। রবার্টো ভাঙা একটা বীচ চেয়ার মেরামত করছে। ব্লাঙ্কার দিকে তাকিয়ে হাসল।

'কাজটা পরে করলে হয় না?' ব্লাঙ্কার চোখে ঝিকিয়ে উঠল দুষ্টুমি।

'কেন? মাত্র তো শুরু করলাম। কাজটা শেষ করা দরকার।'

'তোমাকে একটা গোপন কথা বলব। তুমি আর কাজে মন দিতে পারবে না।' কাছিয়ে এল মেয়েটা।

'আমার সম্পর্কে কোনও গোপন কথা?'

'আমাদের ব্যাপারে,' কাঠের বেঞ্চিতে রবার্টোর পাশে বসল ব্লাঙ্কা, একটা হাত রাখল তরুণের উরুতে।

'অ্যাই, মেয়ে, আমাদের আবার গোপন কথা কী?'

'তুমি এখন আমার সঙ্গে প্রেম করবে কি করবে না সেটা বলো।' বলল ব্লাঙ্কা।

'সাংঘাতিকভাবে করতে চাই। কিন্তু এখানে তো বিছানা নেই। তোমার কিংবা আমার ঘরে যাওয়া যাবে না। ঝুঁকি হয়ে যাবে। আর সৈকতও আমাদের জন্য নিরাপদ নয়।'

'এত রাতে সৈকতে যেতে হবে না। আমাদের জন্য একটি কাবানা অপেক্ষা করছে।'

'তা কী করে সম্ভব? আজ তো কেউ হোটেল ছাড়েনি।' 'ক্যালিফোর্নিয়া থেকে আসা ওই বাঙালি মহিলা তার বন্ধুদের সঙ্গে সাত নাম্বার কাবানায় স্ফূর্তি করছে। মহিলার কাবানা খালি। ওখানে গিয়ে আমরাও স্ফূর্তি করব।'

'কিন্তু যদি সে ফিরে আসে?'

'ঘণ্টাখনেকের মধ্যে তার ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই। আরও পরেও আসতে পারে। ওরা টেকুইলার বোতল খুলে বসেছে। তারপর তিনজনে মিলে কী করবে ঈশ্বর জানেন।'

'কিন্তু যদি টের পেয়ে যায়?'

জিভ দিয়ে বিরক্তিসূচক শব্দ করল ব্লাঙ্কা। 'কিস্যু টের পাবে না। আমি বিছানায় পরিষ্কার চাদর পেতে দেব। আমরা যে ঘরে ঢুকেছি তার কোনও চিহ্নই থাকবে না। আর কোনও কথা আছে? তোমার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে আমার সঙ্গে প্রেম করার ইচ্ছেই তোমার নেই।'

জ্বলে উঠল রবার্টোর চোখ। লাফ মেরে খাড়া হলো, জড়িয়ে ধরল ব্লাঙ্কার সরু কোমর। ওকে টানতে টানতে নিয়ে চলল। 'চলো আমার সঙ্গে। তোমার সঙ্গে প্রেম করার ইচ্ছে আছে কি নেই এখনই টের পাইয়ে দিচ্ছি।'

ব্লাঙ্কাকে নিয়ে শেড থেকে এক ছুটে বেরিয়ে এল রবার্টো। হাত ধরাধরি করে হাসতে হাসতে আর হাঁপাতে হাঁপাতে মূল ভবনের পাশ কাটাল ওরা, রাস্তা ধরে চলে এল বারো নাম্বার কাবানায়।

পাস কী দিয়ে কুটিরের দরজা খুলল ব্লাঙ্কা।

প্যালেসিও ডেল মারের পেছনের খোলা জায়গাটার কিনারে ভোজবাজির মত উদয় হলো একটা নেকড়ে। খানিক আগে ওখানটাতে রোদে পোড়া চামড়ার এক যুবক শারীরিক রূপান্তরের যন্ত্রণায় মোচড় খাচ্ছিল। শরীর টানটান করল নেকড়ে, ঝাড়া দিল গা। ত্বকের নীচের পেশীগুলো কিলবিল করে উঠল। রায়হান মর্তুজার স্তূপ করে রাখা জামাকাপড়ের পাশ কাটাল নেকড়ে। কাবানার সারির পেছনের ঘন ঝোপ মাড়িয়ে নিঃশব্দে এগুলো সে।

সারির শেষ কাবানা তার টার্গেট। জানালায় আলোর চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। মেয়েটা বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে। জেগেও থাকতে পারে। হয়তো স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে আঁধারে, ভয় পাচ্ছে বাইরে তার জন্য কী ওঁৎ পেতে আছে ভেবে। তবে একটু পরে আর ভয় পেতে হবে না সুহিতাকে। আর কোনদিন ভীত

হতে হবে না ওকে। নেকড়ের ভেতরে মানবিক চিন্তা-চেতনার ছিটেফোঁটা যেটুকু এখনও অবশিষ্ট আছে, সেই অংশটা ওকে হত্যা করতে বাধা দিচ্ছে। কিন্তু পৈশাচিক প্রবৃত্তিটা মানবিক প্রবৃত্তির চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। নেকড়ের পৈশাচিক মন উত্তেজনায় অধীর হয়ে আছে।

কাবানা থেকে কয়েক গজ দূরে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল নেকড়ে। নাক উঁচু করে গন্ধ শুঁকল। যৌন মিলনের গন্ধ বাতাসে। বিরাট মাথাটা কাত করল নেকড়ে।

প্রচণ্ড রাগে জ্বলে উঠল নেকড়ের চোখ, মানবিক ঈর্ষাকাতর স্মৃতি প্রতিহিংসার আগুন জ্বেলে দিল মনে। লম্বা কয়েক লাফে কাবানার সামনে চলে এল নেকড়ে।

নেকড়ের বুকের খাঁচায় দড়াম দড়াম বাড়ি খেতে লাগল কলজে। দুটোকে একসঙ্গে ধরবে সে। একজন তার সাবেক স্ত্রী, অপরজন তার একসময়ের বন্ধু।

গলা দিয়ে হিংস্র গর্জন বেরিয়ে এল নেকড়ের, লাফ দিল সে। সামনে বাড়ানো থাবা আছড়ে পড়ল জানালায়। জানালার পর্দা ছিঁড়ে ফ্রেম এবং কাচ ভেঙে ডিগবাজি খেয়ে পড়ল সে মেঝেয়। ঝুরঝুর করে ভাঙা কাচ পড়ল গায়ে।

বিছানায় শোয়া পুরুষ এবং নারী কিছু বুঝে ওঠার আগেই আক্রান্ত হলো।

এ তো সুহিতা নয়! নয় সাগরও! এদেরকে সে চেনে না। মস্ত একটা ভুল হয়ে গেল। কিন্তু ভুলটা বুঝতে পেরেছে সে বড্ড দেরিতে। রক্তের স্বাদ তার মুখে, এখন আর কোনকিছুই বাধা দিতে পারবে না নেকড়েকে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে বিছানা পরিণত হলো রক্তের সাগরে। মাংসের টুকরো, চুল এবং হাড় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়তে লাগল মেঝেতে। নেকড়ে দাঁত দিয়ে মাংস কামড়ে তুলছে, চিবাচ্ছে, গিলছে, দ্রুত গরম মাংসের চাকলা অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে তার মুখ-গহ্বরে।

খেতে খেতে ভাঙা জানালায় চিন্তিত দৃষ্টিতে তাকাল নেকড়ে। হোটেলের মূল ভবন থেকে ভেসে এল মানুষের গলার আওয়াজ। অন্যান্য কাবানার দরজা খুলে গেল। এখন কেটে পড়ার সময়।

রক্তাক্ত বিছানা থেকে এক লাফে মেঝেয় নামল নেকড়ে। পরমুহূর্তে এক লাফে জানালার বাইরে। লম্বা লম্বা লাফে ছুটল জঙ্গলে। কাবানায় যখন মানুষ ঢুকল ততক্ষণে সে ঘন ঝোপের আড়ালে, ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গেছে।

একুশ

সাত নাম্বার কাবানার ভেতরটা সিগারেটের ধোঁয়ায় ভরে আছে। টেবিলে দু'তিনটে গ্লাস, অর্ধেক গ্লাস ভর্তি মদ। লিসা ভ্যান্স তিন নাম্বার গ্লাস ঠোঁটে তুলল, ঢক ঢক করে গিলে ফেলল তরল আগুন। টেবিলের ওপর খালি গ্লাস রাখার সময় টলে উঠল সে।

'ভাগ্যিস গ্লাসটা পুরো ভরা ছিল না,' বলল সে। গ্লাসে আরও টেকুইলা ঢালল লিসা।

'লেবু আর লবণ মিশিয়ে খাও,' বলল সাগর।

'গুষ্টি মারি তোমার লেবু আর লবণের,' মদের গন্ধ শুঁকল লিসা, তারপর গ্লাসটা উঁচিয়ে ধরল সাগরের উদ্দেশে। 'এই যে তোমার কুকারাচা।'

সাগর নিজের গ্লাসে চুমুক দিল। এবারে সে নিজেও লেবু মেশাতে ভুলে গেছে। সুহিতা মদের গ্লাসে চুমুক দিল। বিকৃত দেখাল চেহারা। নামিয়ে রাখল গ্লাস।

সুহিতা হার্ড ড্রিংকস খুব কমই পান করে। অ্যাডামসের সঙ্গে

পার্টিতে গেলে মাঝেসাঝে ভদ্রতার খাতিরে খেতে হয়। টেকুইলার নাম শুনেছে তবে খায়নি কখনও। কৌতূহল মেটাতে চুমুক দিয়েছিল গ্লাসে। আগুন ধরে গেছে কান আর গলায়। বাব্বাহ্, এত ঝাঁঝ! এখানকার পরিবেশে নিজেকে ঠিক মানিয়ে নিতে পারছে না সুহিতা। কেমন অস্বস্তি লাগছে। শুধু ও আর সাগর যদি থাকত, উপভোগ্য হয়ে উঠত সময়। জানে নিজের ঘরের চেয়ে এখানে নিরাপদে আছে ও। কিন্তু লিসার আদিখ্যেতা সহ্য করা কঠিন। ঘড়ি দেখল সুহিতা। সবে মাঝ রাত পেরিয়েছে। ভোর হতে এখনও ঢের দেরি। যা থাকে কপালে নিজের ঘরে যাবে সুহিতা। দরজা-জানালা ভাল মত বন্ধ করে শুয়ে পড়বে। এখানে লিসার ঢঙফঙ সত্যি সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

এমন সময় তীব্র আর্তনাদটা শুনতে পেল ওরা।

কথা বলছিল সাগর, থেমে গেল মাঝপথে। মূর্তির মত নিশ্চল বসে রইল এক মুহূর্ত। লিসা ভয়ার্ত চিৎকারে এমন জোরে কেঁপে উঠেছে, মদ ছলকে পড়ে ওর ব্লাউজ মাখামাখি। সুহিতা চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইল অন্ধকার জানালায়। চিৎকার কোত্থেকে আসছে বোঝা না গেলেও সুহিতা নিশ্চিত এর উৎস কাবানা নাম্বার বারো।

'যীশাস!' গলা কেঁপে গেল লিসার। উঠে দাঁড়িয়েছে। মদ পড়ে নষ্ট হয়ে যাওয়া জামার দিকে নজর নেই। 'কীসের শব্দ ওটা?'

সিধে হলো সাগর, এগিয়ে গেল দরজায়। খুলল। কান পাতল। থেমে গেছে চিৎকার। অন্যান্য কাবানার দরজা খুলে যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে মানুষের গলা। চিৎকারের কারণ জানতে চাইছে তারা। মূল ভবন থেকে ছুটে আসছে লোকজন কাবানার দিকে। দরজায় চৌকাঠ পার হলো সাগর। 'ওদিকে যেয়ো না,' বলল সুহিতা।

ওর দিকে ফিরল সাগর। 'কী হয়েছে দেখা দরকার।'

'তা হলে চলো। আমিও তোমার সঙ্গে যাব,' বলল সুহিতা।

'আমাকে একা রেখে তোমরা যেতে পার না,' বলল লিসা। টলতে টলতে এগিয়ে এল সে, দাঁড়াল সাগরের পাশে, খামচে ধরল বাহু।

একটু ইতস্তত করল সাগর। সারির শেষ কাবানাগুলো থেকে ভেসে আসছে চিৎকার-চেঁচামেচি। 'ঠিক আছে,' বলল ও। 'চলো, একসঙ্গেই যাই সবাই। তবে কেউ দলছুট হয়ো না।'

ওরা তিনজন নেমে এল কুটির থেকে। মেইন বিল্ডিং থেকে ছুটে আসা লোকজনের সঙ্গে যোগ দিল। রাস্তায় আলোটালো নেই, দরজা খোলা অন্যান্য কাবানার আলো আর ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় সামান্য আলোকিত পথ। বারো নাম্বার কাবানার সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল মানুষজন। কুটিরের দরজা খোলা। এক লোক সাবধানে ঢুকল ঘরে, জ্বেলে দিল বাতি।

দর্শকরা আঁতকে উঠল দৃশ্যটা দেখে, ঝাঁকি খেয়ে পিছিয়ে গেল কদম। মুখ ঘুরিয়ে নিল লিসা, কাঁপতে শুরু করেছে।

খোলা দরজা দিয়ে বিছানাটার একাংশ দেখতে পাচ্ছে সুহিতা। ওর বিছানা। দেখল খাটের ওপর রক্ত মাখানো মাংসের টুকরো আর হাড়গোড়। ভয়ঙ্কর! সভয়ে মুখ ফিরিয়ে অন্যদিকে তাকাল সুহিতা, ওর কাঁধ খামচে ধরল সাগর।

হোটেল ম্যানেজার সিনর ডাভিলা ফ্ল্যানেলের নাইট শার্ট গায়ে ছুটতে ছুটতে এল। সরু পা জোড়া খালি। সে একই সঙ্গে অতিথিদেরকে ইংরেজিতে শান্ত থাকতে অনুরোধ করে স্প্যানিশে হুকুম দিতে লাগল তার কর্মচারীদের। সুহিতা শুধু একটি শব্দই বুঝতে পারল *পলিশিয়া*। মানে পুলিশ। ডাভিলা বিরস বদনের দুই কিচেন হেল্পারকে দরজায় পাহারার জন্য দাঁড় করিয়ে দিল। উপস্থিত দর্শক ভিড় ভেঙে চলে যেতে লাগল কাবানা থেকে।

আধঘণ্টা পরে সুহিতা, সাগর এবং লিসা সহ হোটেল বোর্ডারদের অধিকাংশ ভিড় জমাল মূল ভবনের লবিতে। ডাভিলার নির্দেশে কিচেন থেকে গরম কফি পরিবেশন করা হচ্ছে সবার জন্য। খোলা হয়েছে বার। অনেকেই শক সামলাতে গিলছে মদ।

দর্শকদের আলোচনার একমাত্র বিষয় খানিক আগে ঘটে যাওয়া ভয়ঙ্কর ঘটনা। তাদের আলোচনায় ছেদ পড়ল পুলিশের আগমনে। দুটো নীল এবং সাদা রঙের গাড়িতে সাইরেন বাজাতে বাজাতে হোটেলের দরজায় হাজির হয়ে গেল মাযাটলান পুলিশ।

বিজনেস সুট পরা, বেঁটেখাটো, নিপাট চেহারার এক লোক মার্চ করে হোটেলে ঢুকে পড়ল বেশ কয়েকজন ইউনিফর্ম পরা পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে। অফিসারদের কী করতে হবে তার নির্দেশ দিয়ে কথা বলল ম্যানেজারের সঙ্গে। দর্শক কৌতূহল নিয়ে লোকটিকে দেখছে। একটু পরে লোকটি লবি এবং ডাইনিং-রুমের মাঝখানের আর্চওয়েতে এসে দাঁড়াল। মনোযোগ আকর্ষণ করার ভঙ্গিতে হাত তুলল।

'গুড ইভনিং। আমি মাযাটলান পুলিশের সার্জেণ্ট অ্যাণ্টোনিও ভাসকুয়েজ। আপনারা জানেন আজ রাতে মর্মান্তিক একটি ঘটনা ঘটেছে। হোটেলের দু'জন কর্মচারী খুন হয়েছে।' এক সেকেণ্ড বিরতি নিল সে দর্শকদের তথ্যটি হজম করতে দিতে। 'সাময়িকভাবে আমি হোটেল ম্যানেজার সিনর ডাভিলার অফিসটি ব্যবহার করব জেরা করতে। এ অপরাধ সম্পর্কে আপনারা কেউ যদি কিছু জেনে থাকেন তা আমার অফিসারকে বলতে আপনাদেরকে অনুরোধ করছি। বাকিরা যে যার ঘরে যেতে পারেন। তবে আমার সঙ্গে কথা না বলে দয়া করে কেউ হোটেল ত্যাগ করবেন না। আপনাদের সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ।'

মৃদু গুঞ্জন উঠল দর্শকদের মাঝে। তবে কাউকেই স্থান ত্যাগ করতে দেখা গেল না।

মুখ চাওয়াচাওয়ি করল সুহিতা এবং সাগর। ওদের চোখে প্রশ্ন, *আমরা কি বলে দেব?* চোখই জবাব দিল *সাবধান!*

হোটেল বোর্ডারদের মধ্যে অল্প ক'জন সেধে গেল পুলিশের সঙ্গে কথা বলতে, তবে বেশিরভাগ ঘোরাঘুরি করছে লবি এবং বার-এ কী হচ্ছে দেখতে। শান্ত, নিস্তরঙ্গ ছুটি আকস্মিক এক

অ্যাডভেঞ্চারে পরিণত হওয়ায় অনেকেই নার্ভাস এবং উত্তেজিত। তাদের মদ পান এবং হাসি দেখে বোঝা যায়।

নীল রঙের একটি অ্যাম্বুলেন্স এসে দাঁড়াল বাইরে। অতিথিরা সবাই ছুটল বারান্দায়। হত্যার শিকার দুই তরুণ তরুণীর লাশ প্লাস্টিকের চাদরে মুড়ে নিয়ে আসা হয়েছে। তুলে দেয়া হলো অ্যাম্বুলেন্সের পেছনে। আলোর ঝলকানি আর সাইরেনের গগনবিদারী আওয়াজ তুলে গন্তব্যে রওনা হয়ে গেল অ্যাম্বুলেন্স।

লবির এক পাশে কাঠ এবং চামড়ার সোফায় বসে আছে সুহিতা, সাগর ও লিসা। লক্ষ করছে হোটেলের বোর্ডাররা ক্রম অপসৃয়মাণ অ্যাম্বুলেন্সের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে।

'এরা এমন ভান করছে যেন ছুটির আমেজে আছে,' মন্তব্য করল সুহিতা।

'ওরা আসলে এক ধরনের হিস্টিরিয়ার মধ্যে আছে,' বলল সাগর। 'বাইরে যা-ই ভান করুক ভেতরে ভেতরে সবাই স্বস্তি নিয়ে ভাবছে, "খোদার রহমত যে আমি বেঁচে গেছি।" শিউরে উঠল সুহিতা। সাগর হাত বাড়িয়ে ওকে স্পর্শ করল।

'আমার মাথাটা এমন ধরেছে, যাচ্ছে না কিছুতেই,' অনুযোগের সুরে বলল লিসা।

'ঘরে যাবে?' জিজ্ঞেস করল সাগর।

'একা ঘরে যেতে পারব না বাপু।'

'চলো, দেখি অ্যাসপিরিন-টিরিন পাই কিনা।' বলল সাগর। 'ওষুধ খেলে সেরে যাবে ব্যথা।'

উঠতে যাচ্ছিল সাগর, বসে পড়ল সার্জেন্ট অ্যান্টোনিও ভাসকুয়েজকে লবি ধরে ওদের দিকে এগিয়ে আসতে দেখে। ওদের সোফার সামনে এসে ব্রেক কষল পুলিশ অফিসার, বিনয়ী ভঙ্গিতে দোলাল মাথা। তাকাল সুহিতার দিকে।

'মিসেস অ্যাডামস?'

'জ্বী।'

'শুনলাম যে কাবানায় দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ওটিতে আপনি থাকেন।'

'জ্বী।'

'অনুগ্রহ করে একবার অফিসে আসবেন?' সাগরের দিকে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকাল সুহিতা।

সাগর বলল, 'আমি সঙ্গে গেলে আপত্তি নেই তো, সার্জেন্ট? আমি মিসেস অ্যাডামসের বন্ধু।'

ঠাণ্ডা বাদামী চোখে ওদের দু'জনকে পরখ করল ভাসকুয়েজ। 'বন্ধু?'

'জ্বী। অনেক দিনের।'

'আমাকে এর মধ্যে যেন জড়াবেন না,' বলল লিসা। 'ঘটনাচক্রে এদের সঙ্গে আমার পরিচয়।'

লিসার দিকে তাকিয়ে শীতল হাসল সার্জেন্ট। ফিরল সাগরের দিকে। 'আপনি আসতে চাইলে আসতে পারেন।'

সাগর লিসার দিকে ফিরল। 'বেশি সময় লাগবে না।'

'যত সময় লাগুক তাতে আমার কী?' বলল লিসা। 'আমি বার-এ আছি।'

সাগর মৃদু হেসে ওর হাঁটুতে চাপড় দিল। চলে গেল লিসা। কাঁধ ঝাঁকাল সাগর। সার্জেন্ট ভাসকুয়েজ এবং সুহিতার সঙ্গে লবি পার হয়ে রেজিস্ট্রেশন ডেস্কের পেছনের ছোট অফিসে ঢুকল।

পিঠ খাড়া চেয়ারে ওদেরকে বসতে বলে নিজে ছোট একটি ডেস্কের পেছনে বসল সার্জেন্ট। মেক্সিকান সিগারেটের প্যাকেট বের করে সাধল দু'জনকে। ওরা খাবে না বলল। একটা সিগারেট ধরাল ভাসকুয়েজ। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে ঝুঁকে এল ডেস্কে, বাদামী চোখের স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো সুহিতা ও সাগরের ওপর। 'আপনারা দু'জনে আজ একসঙ্গে ছিলেন?'

'জ্বী,' জবাব দিল সাগর। 'মিস ভ্যান্সও আমাদের সঙ্গে ছিল।'

'ও হ্যাঁ, লবির ওই তরুণী।'

মাথা দোলাল সাগর।

ভাবলেশশূন্য চেহারা নিয়ে ওকে কয়েক সেকেণ্ড দেখল সার্জেন্ট তারপর চোখ ফেরাল সুহিতার দিকে।

'মিসেস অ্যাডামস, আপনার কি জানা আছে কে আপনাকে খুন করতে চাইতে পারে?'

'আমাকে?'

'আপনার ঘরে দুই তরুণ-তরুণী খুন হয়েছে। ঘরের বাতি ছিল নেভানো। খুনী হয়তো আপনাকে হত্যার উদ্দেশ্যে এসেছিল। কিন্তু ভুল করে ওদেরকে মেরে ফেলেছে।'

'আমি মাত্র এসেছি মাযাটলানে,' সতর্ক গলায় বলল সুহিতা। 'এখানে আমার বন্ধু সাগর ছাড়া আর কাউকে চিনিও না।'

'ও, আচ্ছা,' সার্জেন্ট মনোযোগ ফেরাল সাগরের দিকে। 'আর আপনি, সার, এ ঘটনা কেন ঘটল সে ব্যাপারে আপনার কি কোনও ধারণা আছে?'

'আমার কোনও ধারণা নেই,' জবাব দিল সাগর।

চেহারা গম্ভীর করে অনেকক্ষণ সাগরের দিকে তাকিয়ে থাকল সার্জেন্ট ভাসকুয়েজ। তারপর ফিরল সুহিতার দিকে। দু'জনের কারও মধ্যে কোনও প্রতিক্রিয়া দেখতে না পেয়ে যেন পেশিতে ঢিল পড়ল তার। হাসল শীতল হাসিটি। 'আমার ভাবনাটা শুধু বলছি। তবে আমরা বুঝতে পেরেছি খুনী কে। যদিও অন্যান্য সম্ভাবনাগুলো এড়িয়ে যেতে চাইছি না।'

'আপনি জানেন খুনী কে?'

'এ ধরনের অপরাধে আমরা প্রথমে স্বামীটিকে সন্দেহ করি। কিন্তু এ কেসে কোনও স্বামী নেই, তবে মেয়েটির সাবেক প্রেমিক আছে। লোকটা এ হোটেলেই কাজ করত। মাসখানেক আগে তাকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে।'

ঠোঁট কামড়াল সুহিতা। 'আপনি ঠিক জানেন এটা কোনও লোকের কাজ?'

'মহিলাদের যে কাজ নয় সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত, সিনোরা,' বলল ভাসকুয়েজ।

'আমি তা বলিনি।'

'তা হলে?' সুহিতার দিকে তাকাল সার্জেন্ট।

সুহিতা টের পেল ওর মুখ গরম হয়ে উঠছে। সাগরের দিকে তাকাল কী বলবে ইঙ্গিত পাবার জন্য। সাগর শুধু মৃদু মাথা নাড়ল। কিছু বলল না। 'আমি ভাবছিলাম,' বলল সুহিতা। 'এটা কোনও....জানোয়ারের কাজ নয়তো?'

'অসম্ভব,' সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল পুলিশ অফিসার। 'ছেলে মেয়ে দু'টির যে দশা হয়েছে তা কোনও জন্তুর পক্ষে করা সম্ভব নয়।'

ইউনিফর্ম পরা এক পুলিশ হাজির হলো দোরগোড়ায়। দ্রুত একবার সাগর এবং সুহিতার ওপর চোখ বুলিয়ে তাকাল সার্জেন্টের দিকে। *'কন পেরডন, সার্জেন্টো।'*

'কুই?'

পুলিশের লোকটা স্প্যানিশে হড়বড় করে কী যেন বলতে লাগল ভাসকুয়েজকে। সার্জেন্ট তার কথা শুনছে আর মাথা দোলাচ্ছে। কথা বলতে বলতে একটা খাম রাখল স্লে ডেস্কে। ভাসকুয়েজ খাম খুলে ভেতরে তাকাল। পকেট থেকে একটা চিমটা বের করল। চিমটা দিয়ে ধরে বের করে আনল খামের ভেতরের জিনিস। আলোর সামনে তুলে ধরে পরীক্ষা করল। তারপর সাবধানে বসল ডেস্কে। ইউনিফর্মধারী পুলিশকে বলল কী যেন। সে স্যালুট ঠুকে চলে গেল।

'খুনী জানালা দিয়ে কেটে পড়ার সময় একটা জিনিস ফেলে রেখে গেছে,' 'বলল ভাসকুয়েজ। চিমটায় তুলে নিল এক গোছা লোম। এমন ভঙ্গিতে দেখাল যেন দুষ্প্রাপ্য জাতের প্রজাপতি দেখাচ্ছে। 'আমার এক লোক এ জিনিসটি ভাঙা জানালার পর্দায় লটকানো অবস্থায় পেয়েছে।'

স্থির দৃষ্টিতে লোম গোছার দিকে তাকিয়ে আছে সাগর এবং সুহিতা। কারও মুখে রা নেই।

ভাসকুয়েজ সুহিতার দিকে তাকিয়ে মুখ সরু করে হাসল। 'আপনি যা ভাবছেন এটা তা নয়, সিনোরা। এটা জ্যাকেটের লোম বলেই আমার ধারণা। লোকটাকে যখন পাকড়াও করব তখন এ লোমগোছা আমাদের যথেষ্ট কাজে লাগবে।'

সুহিতা কিছু বলতে গিয়েও চুপ হয়ে গেল সাগরের চোখ ইশারায়।

'আপনি কিছু বলবেন, সিনোরা?' জিজ্ঞেস করল সার্জেণ্ট। মাথা নাড়ল সুহিতা। 'না। কিছু বলব না। এখন কি আমরা যেতে পারি?'

'অবশ্যই। সময় দেয়ার জন্য আপনাদের দু'জনকেই ধন্যবাদ।'

ম্যানেজারের কামরা থেকে বেরিয়ে এল ওরা। চলে এল লবিতে। অতিথিদের বেশিরভাগ যে যার ঘরে চলে গেছে।

'নিরপরাধ কোনও মানুষকে আমরা গ্রেফতার হতে দিতে পারি না,' বলল সুহিতা।

'তুমি কী করবে শুনি? সার্জেণ্ট ভাসকুয়েজের কাছে গিয়ে বলবে, "এই যে ভাই, এই লোকগুলোকে খুন করেছে একটা ওয়্যারউলফ। আর সে এক সময় আমার স্বামী ছিল।?"'

'প্লীজ, মশকরা কোরো না।'

সাগর কপালে হাত দিল। 'সরি। ক্লান্তিতে মাথার ঠিক নেই। কিছু মনে কোরো না। তবে ওরা নিরপরাধ কোন লোককে হুট করে গ্রেফতার করবে বলে মনে হয় না। মেক্সিকান আইন খুব কড়া। সাক্ষী-প্রমাণ ছাড়া ওরা কাউকে হাজতে ঢোকায় না।'

'ওদের আইন জানি না আমি,' বলল সুহিতা। 'তবে তুমি ঠিকই বলেছ আমাদের কিছুই করার নেই।' হাই তুলল ও।

'একটু ঘুমিয়ে নাও,' বলল সাগর। 'চলো ম্যানেজারকে বলে তোমার জন্য একটা ঘরের ব্যবস্থা করি।'

সিনর ডাভিলা এখন পুরোদস্তুর ম্যানেজারের পোশাকে, জানাল সিনোরা অ্যাডামসের জন্য মূল ভবনে একটি কামরার ব্যবস্থা করা যাবে। কারণ হঠাৎ করেই কয়েকজন বোর্ডার হোটেল ছেড়ে চলে গেছে।

সুহিতা নতুন রেজিস্ট্রেশন কার্ডে আবার নিজের নামটাম ইত্যাদি লিখছে হঠাৎ আঙুল মটকাল সাগর।

'এই রে, আমি তো লিসার কথা ভুলেই গেছিলাম। ও এখনও বার-এ অপেক্ষা করছে।'

'তুমি বরং ওর কাছে যাও,' বলল সুহিতা। 'আমার কোনও সমস্যা হবে না।'

'কাল সকালে উঠেই তোমার চেহারা দেখতে চাই আমি,' বলে দ্রুত বার-এ পা বাড়াল সাগর।

সুহিতা কার্ডে নাম লেখা শেষ করল। ম্যানেজার একটি ছেলেকে বারো নাম্বার কাবানায় পাঠিয়ে দিল সুহিতার জিনিসপত্র নিয়ে আসতে। লবিতে একটি চেয়ারে বসল সুহিতা। আঙুল দিয়ে চোখ ঘষল। ক্লান্তি লাগছে খুব।

'সিনোরা?'

মুখ তুলে তাকাল সুহিতা। মুখে প্রকাণ্ড গোঁফ, গাট্টাগোট্টা শরীরের মানুষটাকে প্রথমে চিনতে পারল না।

'লুই জ্যারেট,' বলল সে। 'গতকাল এয়ারপোর্ট থেকে আমার ট্যাক্সি চড়ে আপনি হোটেলে এসেছিলেন।'

'ও, আচ্ছা,' মনে পড়েছে সুহিতা।

'সিনোরার যদি প্রয়োজন হয় আমি সাহায্য করতে পারি।'

'ধন্যবাদ। আজ রাতে আর ট্যাক্সির দরকার হবে না।'

'না, সিনোরা, ট্যাক্সি নয়। অন্য কোনও সাহায্যের প্রয়োজন হলে বলতে পারেন।'

'মানে?'

'শুনলাম ব্লাঙ্কা আর রবার্টো আপনার কুটিরে খুন হয়েছে।'

'তুমি কী করে জানলে?' উৎসুক দৃষ্টিতে লোকটাকে দেখছে সুহিতা।

'আমি আরও অনেক কিছুই জানি, সিনোরা। বলেছিলাম না আমার শরীরে বইছে জিপসিদের রক্ত। আমি জানি ব্লাঙ্কা এবং রবার্টোকে কোনও মানুষ খুন করেনি।'

'তা হলে কে করেছে?'

'কে নয়, সিনোরা, কীসে। ওদেরকে হত্যা করেছে *লোবোম্বর*। ওয়্যারউলফ।'

বাইশ

মাযাটলানের ঝলমলে সাগর সৈকত আর চকচকে নতুন রাস্তা থেকে অনেক দূরে শহরের আরেকটি অংশের নাম লা রাটোনেরা। ইঁদুরের গর্তের মত এলাকা। এ জায়গায় পর্যটকদের বাস ভুলেও পথ মাড়ায় না, কালেভদ্রে ভবঘুরে টাইপের, অতি উৎসাহী দু'একজন ট্যুরিস্ট আসে। রাস্তাঘাট খানা-খন্দে ভরা, বিল্ডিংগুলোর গায়ে শত বছরের ধুলো-ময়লা জমেছে। এসব ভবনের দরজা সবসময় বন্ধ থাকে, জানালার পর্দা কেউ তোলে না। মানুষের মল-মূত্রের গন্ধে বাতাস ভারী।

লা রাটোনেরা বেশ্যা, চোর, মাতাল আর মাদকসেবীদের স্বর্গরাজ্য। রাতের বেলা তারা ভাঙাচোরা রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় ছায়ার মত, দিনের আলোয় নিজেদেরকে বন্দি করে রাখে চার দেয়ালের মাঝে।

এখানে, নামহীন একটি ক্যান্টিনার স্যাঁতসেঁতে ঘরে জং ধরা

লোহার খাটে, পাতলা মাদুরের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে আছে রায়হান মর্তুজা। বাদামী দাগঅলা প্লাস্টারের সঙ্গে ঘরের ওয়ালপেপার দেয়ালের গা থেকে খসে পড়েছে অনেক আগেই। ঘরের কিনারে আবর্জনায় আস্তানা বানিয়েছে ইঁদুরের দল।

দু'হাত বুকে বেঁধে রায়হানের দিকে তাকিয়ে আছে মার্সিয়া লুরা। নিজের চারপাশের জঘন্য দুর্গন্ধময় পরিবেশ সম্পর্কে যেন মোটেই সচেতন নয়। কুৎসিত জায়গাটাতে তার মত অপূর্ব এক সুন্দরীকে মনে হচ্ছে ভিনগ্রহ থেকে আসা কোনও দেবী। তার সবুজ চোখ জ্বলছে ক্রোধের আগুনে।

'আবার ব্যর্থ হয়েছ তুমি,' বলল মার্সিয়া। তার কণ্ঠস্বর নিচু, হঠাৎ ছেড়ে দেয়া তারের মত কাঁপছে। 'তিনবার তোমাকে হত্যা করতে পাঠালাম। তিনবারই তুমি ভুল করেছ। প্রথমবার সিয়াটলে ছেলেটাকে মারতে পারলে না। বদলে মেরে রেখে এলে বুড়িটাকে। লস এঞ্জেলেসে সুহিতাকে খুন করার একটা সুযোগ পেয়েও হারিয়েছ। আর এবারেও ব্যর্থ হলে। গত রাতের ওই ঘটনার পরে পুরোপুরি সাবধান হয়ে যাবে সুহিতা। ওকে হত্যা করা আরও কঠিন হয়ে উঠবে।'

রায়হান মৃদু গুঙিয়ে উঠল তবে মুখ তুলে মার্সিয়ার দিকে তাকাতে সাহস করল না।

'তোমার ওপর আমার বিশ্বাস ছিল,' বলে চলল মার্সিয়া। 'তুমি জান ওকে আমার পক্ষে হত্যা করা সম্ভব হলে অবশ্যই করতাম। কিন্তু তুমি এও জান কেন কাজটা করতে পারব না। তোমার ওপর আমার সমস্ত আস্থা তুমি নষ্ট করে দিয়েছ, মর্তুজা। একবার নয়, পরপর তিনবার।'

'ব্যস!'

রায়হানের হুঙ্কারে থতমত খেল মার্সিয়া। বিছানায় উঠে বসেছে রায়হান। মুখোমুখি হলো নেকড়ে মানবীর।

'আর ব্যর্থ হবার বয়ান শুনতে চাই না,' বলল রায়হান। 'দুটো

তরুণ প্রাণ গত রাতে খুন হয়েছে। দুটো তাজা প্রাণ যারা তোমার কোনও ক্ষতি করেনি। আমারও না। কিন্তু তবু ওদেরকে হত্যা করেছি আমি। আর সিয়াটলের ওই মহিলাসহ হলো তিনজন। তিনটা নিরপরাধ মানুষের জীবন কেড়ে নিয়েছি আমি তোমার জন্য।' মার্সিয়া রায়হানের চোখে চোখ রাখল, ধীরে ধীরে কঠিন হলো চেহারা। রায়হান অন্য দিকে সরিয়ে নিল চোখ।

'তুমি আমার জন্য ওদেরকে হত্যা করেছ, না?' মার্সিয়ার কণ্ঠ বিপজ্জনক রকম নরম। 'শুধু আমার জন্য? আমার দিকে ফেরো, রায়হান। চোখে চোখ রেখে বলো যে হত্যা করে তুমি আনন্দ পাওনি। বলো যে ওই বুড়ির গলার নলি যখন দাঁত দিয়ে টান মেরে ছিঁড়ে নিয়েছিলে তখন নিজের শক্তির পরিচয় পেয়ে উল্লসিত হওনি। বলো যে বিছানায় নগ্ন তরুণ-তরুণীর ওপর হামলা চালানোর সময় তুমি যৌন আনন্দ উপভোগ করনি। বলতে পারবে এ কথা?'

রায়হান ফিরল মার্সিয়ার দিকে তবে কথা বলার সময় দুর্বল ও ভঙ্গুর শোনাল কণ্ঠ। 'না, আমি এ কথা অস্বীকার করছি না। হ্যাঁ, হত্যাকাণ্ড আমার ভেতরে উত্তেজনার সৃষ্টি করে। আমার এ উত্তেজনাটুকু দরকার। কিন্তু আমি যে জিনিসে পরিণত হয়েছি তা ভাবলে বমি আসে, ঘৃণায় কুঁকড়ে যায় শরীর।'

বিছানায় হেঁটে এল মার্সিয়া। সুতো বেরিয়ে থাকা মাদুরে, রায়হানের পাশে বসল। রায়হানের মাথাটা টেনে নিয়ে ঠেসে ধরল নিজের উদ্ধত, লোভনীয় দুই বক্ষে।

'তোমার যন্ত্রণার স্বরূপ আমি বুঝতে পারি, আমার রায়হান,' বলল সে। 'তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তোমার যন্ত্রণার মাত্রাও কমে আসবে। একসময় মানবিক দুর্বল অনুভূতিগুলো আর থাকবে না তোমার মধ্যে–ছায়া হয়ে মিলিয়ে যাবে। তুমি যা তা নিয়ে গর্ব করবে। নেকড়ের শক্তি হয়ে উঠবে তোমার আনন্দের সেরা উৎস, তখন শুধু আনন্দটাকেই উপভোগ করবে। তারপর তুমি আর

আমি সত্যিকারভাবেই একত্রিত হতে পারব। তুমি তো তাই চাইছ, তাই না, আমার রায়হান?'

'হুঁ,' অস্ফুটে বলল রায়হান। 'আমি তাই চাই।'

মার্সিয়া ওর লম্বা, কালো চুলে হাত বুলাতে বুলাতে নিচু, আদুরে গলায় কথা বলতে লাগল।

'আমাদের মিশন শীঘ্রি শেষ হয়ে যাবে। আমাদের হাতে সময়ও আর বেশি নেই। কারণ মহিলার এখন একজন মিত্র জুটেছে। পরিচয় দেয় বন্ধু বলে আসলে তো ওর লাভার। তোমার সাবেক জিগরী দোস্ত। ওদেরকে বিচ্ছিন্ন করতেই হবে। ওরা একসঙ্গে থাকা মানে আমাদের বিপদ। কারণ ওরা জানে কাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। আমাদের শক্তির কথাও ওদের অজানা নয়। ওদেরকে হুট করে আমরা চমকে দিতে পারব না।'

অল্পক্ষণ চুপ করে রইল মার্সিয়া। রায়হানের মাথাটা বুকের সঙ্গে শক্ত করে চেপে ধরে আছে। তারপর বলল, 'তারচেয়েও খারাপ ব্যাপার হলো ওরা আমাদের দুর্বলতাগুলো জানে।'

রায়হান বুকের ওপর থেকে মুখ তুলল। তারপর মার্সিয়ার হাতির দাঁতের মত মসৃণ গলায় চুমু খেল। হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করল মার্সিয়ার কপালের কাটা দাগে। 'আমার মার্সিয়া,' বিড়বিড় করল রায়হান। 'ওরা তোমাকে কত না ব্যথা দিয়েছে!'

সবুজ চোখে আবার জ্বলল আগুন। 'সিলভার বুলেটের ওই যন্ত্রণার কথা জীবনেও ভুলব না আমি। সেই ব্যথার সঙ্গে কোন কিছুর তুলনা হয় না।'

'কথা দিচ্ছি এ জন্য ওদেরকে মাশুল দিতে হবে,' বলল রায়হান, 'পরের বার আর হতাশ করব না তোমাকে।'

মার্সিয়া রায়হানের প্রশস্ত পিঠে হাত বুলাতে লাগল। ওর লম্বা, পেলব আঙুল ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেল শক্তিশালী পেশীগুলো। 'জানি তুমি আর আমাকে হতাশ করবে না। তবে কাজটা করা কঠিন হবে। ওরা আমাদের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে।'

'ওদেরকে বাধা দেব কী করে?'

'মাযাটলানে বেশ কিছু জিপসি আছে যারা পাহাড় থেকে এসেছে। এরা পুরানো নিয়ম কানুনে বিশ্বাসী। আমরা ওদেরকে বলে দেব সুহিতাদের কথা। ওই মহিলা আর তার লাভার আগেরবারের মত আর অস্ত্র নিয়ে আমাদেরকে হামলা করার সুযোগ পাবে না। বরং আমরাই আগে ওদের ওপর হামলে পড়ব।'

'জিপসিরা কি আমাদেরকে সাহায্য করতে রাজি হবে?'

'ওদের সাহায্যের তো প্রয়োজন নেই। জিপসিদেরকে বলব তারা যেন আমাদের শত্রুদের কোনও সাহায্য-সহযোগিতা না করে। আমাদের নির্দেশ ওরা অমান্য করার সাহস পাবে না। লোবোম্বরের বিরুদ্ধে কিছু করার সাহস ওদের নেই।'

তেইশ

বারো নাম্বার কাবানায় নৃশংস ঘটনাটি ঘটার পর দিন ভোরবেলায়, প্যালেসিও ডেল মারের পেছনের পাহাড়ে সূর্যটা উঠি উঠি করছে, তার আগেই হোটেল প্রাঙ্গণ এবং লবি জ্যান্ত হয়ে উঠল মানুষের সরব উপস্থিতিতে। মাযাটলান পুলিশ ফোর্সের সঙ্গে এবারে যুক্ত হয়েছে সিনোলা রাজ্য এবং মেক্সিকান সরকারের লোকজন। তবে দর্শনার্থীদের ভিড় নেই কারণ ভোরের কাগজ এখনও তাদের হাতে এসে পৌঁছায়নি অথবা কাগজে হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে কিছু লেখার সময় পায়নি পত্রিকাঅলারা।

ডাইনিং-রুমে একটি টেবিলে বসে সাগর চৌধুরী এবং লুই

জ্যারেটের সঙ্গে মিষ্টি রোল ও কফি সহযোগে নাশতা খাচ্ছে সুহিতা। ওরা ষড়যন্ত্রকারীদের মত ইতিউতি তাকাচ্ছে, কথা বলছে গলার স্বর নামিয়ে।

'তুমি গত রাতে বললে আমাদেরকে নাকি সাহায্য করবে,' বলল সাগর।

ঘরের চারপাশে ঘুরে এল লুইয়ের চোখ। 'আমি ঠিক ওভাবে বলিনি কথাটা।'

'তা হলে কীভাবে বলেছ শুনি?'

'আমি বলছিলাম আমি এমন একজনকে চিনি যে আপনাদেরকে সাহায্য করতে পারবে।'

'ভণিতা রাখো তো। যা বলার সরাসরি বলবে। নাকি তোমার পেট থেকে কথা বের করতে হবে?'

সুহিতা সাগরের হাতে হাত রাখল, 'প্লীজ, সাগর। লুই কী বলতে চাইছে আগে শোনোই না।'

'গ্রাসিয়াস, সিনোরা,' বলল ট্যাক্সি ড্রাইভার। 'আমি একজনকে চিনি, সে হয়তো আপনাদেরকে সাহায্য করতে পারবে। সে থাকে মাযাটলান শহরের পেছনের পাহাড়ে। একজন জিপসি। থুথুরে এক বুড়ি। নাম ফিলিনা।'

'জিপসি বুড়ি আমাদের কী কাজে লাগবে?' বিরক্ত সাগর। আমরা ওয়্যারউলফ নিয়ে কথা বলছি, জাদুর তুকতাক নিয়ে নয়। আশা করি ব্যাপারটা তুমি বুঝতে পেরেছ।'

নিজের চেয়ারটা পেছনে ঠেলে সরাল লুই। সিধে হতে হতে বলল, 'সিনরের যদি এ ব্যাপারে কোনও আগ্রহ না থাকে তা হলে আপনাদের সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না।'

'প্লীজ, লুই, বসো,' বলল সুহিতা। 'তোমার কথা শোনার জন্য আমরা মুখিয়ে আছি।' ভ্রূকুটি করল সে সাগরের দিকে তাকিয়ে।

'আমি দুঃখিত, লুই,' বলল সাগর। 'আমি আসলে খুব আপসেট হয়ে আছি। চাই না আর কোনও মানুষ মারা যাক। তুমি

যার কথা বলবে তার কাছেই আমরা সাহায্য চাইতে যেতে রাজি আছি।'

চেয়ারে আবার হেলান দিল লুই। 'ফিলিনার অনেক বয়স। সে পুরোপুরি একজন জিপসি। আমার মত অল্পস্বল্প জিপসি নয়,' মুচকি হাসল সে। 'ফিলিনা হাত দেখে ভূত-ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারে। সামনে কী ঘটবে তা আগাম বলে দেয়ার ক্ষমতা আছে বৃদ্ধার। লোবোম্বরের বিরুদ্ধে লড়াই করার ব্যাপারে কেউ যদি আপনাদের সাহায্য করতে পারে তো একমাত্র ফিলিনাই পারবে।'

'তার কাছে আমাদেরকে নিয়ে যেতে পারবে?' জিজ্ঞেস করল সুহিতা।

'রাস্তা ধরে যতটা পথ যাওয়া যায় আপনাদেরকে নিয়ে যাব আমি। রাস্তার পরে আছে পাহাড়ি একটি ট্রেইল। ওই ট্রেইল ধরে এগোলে ফিলিনার কুটির।'

'কিন্তু আমরা তো রাস্তা চিনি না,' আপত্তির সুরে বলল সাগর। 'পাহাড়-পবর্তের মধ্যে কোথায় খুঁজব জিপসি বুড়ির বাড়ি। আর বুড়িকে খুঁজতে গিয়ে যদি রাত হয়ে যায় তা হলেই গেছি। ওয়্যারউলফের খপ্পরে পড়ব নির্ঘাত।'

'সকাল সকাল বেরিয়ে পড়বেন,' পরামর্শ দিল লুই। 'আমার এক চাচাত ভাই আছে। সে পাহাড়ি পর্যটকদের গাধা ভাড়া দেয়। আপনাদেরকে অল্প পয়সায় গাধা ভাড়া দেবে। গাধাগুলো পাহাড়ি রাস্তা চেনে। আর পাহাড়ে রাস্তা বলতে ওই একটাই।'

'এখন রওনা হলে সন্ধ্যার আগে হোটেলে ফিরতে পারব?' জানতে চাইল সুহিতা।

লুই জানালা দিয়ে তাকাল বাইরে, সূর্যের অবস্থান পরখ করল। মাথা দোলাল।

সুহিতা আর সাগর একে অন্যের দিকে তাকাল। 'কী ভাবছ?' জিজ্ঞেস করল সুহিতা।

'ভাবছি সময়ের অপচয় করছি কিনা। জিপসি গণক বুড়ি

আমাদের খুব একটা কাজে আসবে বলে মনে হচ্ছে না।'

'সাগর, আমাদের তো আর কিছু করারও নেই।'

'তাই বলে হাত দেখে ভবিষ্যৎ বলা? তুমি এসবে বিশ্বাস কর?'

'তুমি ওয়্যারউলফ বিশ্বাস কর?' শান্ত গলায় প্রশ্ন করল সুহিতা।

'এই তো মোক্ষম জায়গায় আঘাত করলে,' হাসল সাগর।

'বৃদ্ধা যদি আমাদের জন্য কিছু করতে না-ও পারে, আমাদের বড়জোর একটা দিন নষ্ট হবে তার বেশি কিছু নয়। এমনও হতে পারে আমরা তার কাছে সত্যি সাহায্য পেতে পারি। কাজেই মহিলার কাছে যেতে কোনও অসুবিধে দেখছি না।'

অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে চোয়াল ঘষল সাগর। 'ঠিক আছে,' বলল ও। 'তুমি খেলতে চাইলে আমিও খেলব।' তাকাল লুইয়ের দিকে। 'যাত্রার জন্য প্রস্তুতি নিতে তোমার কতক্ষণ লাগবে?'

'আমি এখনই প্রস্তুত, কত সিনর। আমার ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে বাইরে।'

'বেশ। সুহিতা, তুমি হোটেলে থাকো। আমি জিপসি বুড়ির সঙ্গে দেখা করে আসি।'

'তা হবে না,' বলল সুহিতা, 'আমিও তোমার সঙ্গে যাচ্ছি।' সাগর আপত্তি করে কিছু বলতে যাচ্ছিল, ওকে হাত তুলে থামিয়ে দিল সুহিতা। 'আমাকে প্রটেকশন দিতে তোমাকে হিরো সাজতে হবে না। এ লড়াইটা আমার। তুমি বাইরে যাবে আর আমি ঘরে বসে টেনশনে হাত মোচড়াব তা হবে না।'

'ঠিক আছে,' নিমরাজি হলো সাগর। 'আমরা দু'জনেই যাব। তুমি রেডি হও আমি এই ফাঁকে লিসার মাথাটা ঠাণ্ডা করে আসি।'

লিসা ভ্যান্স গায়ে চাদর মুড়ি দিয়ে বিছানায় বসে সাগরের কথা শুনল। তার চোখজোড়া গ্রানিট পাথরের মত কঠিন।

'পাহাড়-পর্বত ডিঙোতে তোমার মোটেই ভাল্লাগবে না,' বলল সাগর। 'কিন্তু বিশ্বাস কর অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজনে আমাকে ওখানে যেতে হচ্ছে।'

শীতল চোখে সাগরকে দেখতে দেখতে লিসা বলল, 'তার মানে আজ সারাদিন তোমার সঙ্গে আমার আর দেখা হচ্ছে না?'

'সম্ভবত।'

'আর তুমি সারা দিন থাকবে তোমার এক্স-গার্লফ্রেণ্ডের সঙ্গে।'

'সুহিতা আমার এক্স-গার্লফ্রেণ্ড নয়।'

'ওকে যা খুশি সম্বোধন কর আমার কিছু আসে যায় না।'

ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সাগর। 'হ্যাঁ, সুহিতা আমার সঙ্গে থাকবে।'

'এবং খুব ঘনিষ্ঠভাবে।'

'তুমি যে ইঙ্গিত করছ সেরকম কিছু ঘটবে না।'

মুখ ঘুরিয়ে অন্য দিকে তাকাল লিসা। 'আমি বরং লস এঞ্জেলেসে ফিরে গেলেই ভাল করতাম।'

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে সাগর বলল, 'ওটাই বরং আমাদের দু'জনের জন্য ভাল হত।'

ঝট করে সাগরের দিকে ফিরল লিসা। গা থেকে খসে পড়তে দিল চাদর।

'আমি তোমাকে ছাড়া যেতে চাই না। তোমাকে বলেছিলাম আমি কখনও ঈর্ষাকাতর হব না। কিন্তু তোমার তথাকথিত বান্ধবী আমার মনে ঈর্ষার আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। এ জন্য তুমিই দায়ী, সাগর। কারণ আমার চেয়ে সে এখন তোমার কাছে বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। ঠিক আছে, ওই মহিলার সঙ্গে তুমি যেখানে খুশি যেতে পার মানা করব না। আমি এখানে এমন কাউকে খুঁজে নেব যে আমাকে ব্যস্ত রাখবে।'

মনে মনে স্বস্তি পেল সাগর। শুধু বলল, 'থ্যাংকস, হানি। সময় হলে তোমাকে সব বলব। এখন বললেও তুমি বিশ্বাস

করতে চাইবে না।' ঝুঁকে চুমু খেতে গেল লিসাকে। মুখ ফিরিয়ে নিল লিসা। শ্রাগ করল সাগর। উঠে পড়ল বিছানা থেকে। তারপর পেছনে দরজা বন্ধ করে চলে গেল।

সুহিতা লুইকে নিয়ে সাগরের জন্য অপেক্ষা করছিল বারান্দায়। শাড়ি ছেড়ে জিনস আর সোয়েটারের ওপর লাইট ওয়েট জ্যাকেট চাপিয়েছে।

'ও কী বলল?' জানতে চাইল সুহিতা।

'বাংলা পাঁচের মত করে রেখেছে মুখ।'

'আয়াম সরি।'

'বাদ দাও তো। ও ওরকমই। একটুতেই মুড অফ।'

সিঁড়ি বেয়ে নামছে, সাগরের কাঁধে টোকা দিল সুহিতা। 'গত রাতের পুলিশ অফিসারটা ওই যে দাঁড়িয়ে আছে। ওর সঙ্গে একটু কথা বলে আসি।'

সার্জেন্ট ভাসকুয়েজ ইউনিফর্ম পরা এক তরুণ পুলিশের সঙ্গে কথা বলছিল। কথা বলার সময় বেশ কয়েকবার মাথা ঝাঁকাল সে, তারপর চলে গেল।

'এক্সকিউজ মী, সার্জেন্ট,' বলল সুহিতা।

'সিনোরা অ্যাডামস, গুড মর্নিং।'

'একটা কথা ভাবছিলাম...গতরাতে আপনি বললেন মৃত মেয়েটির নাকি একজন প্রেমিক আছে...আপনার ধারণা সে-ই এ হত্যাকাণ্ডের মূল নায়ক...'

অসহায় একটা ভঙ্গি করে হাত তুলল সার্জেন্ট। 'সেরকম ধারণাই করেছিলাম বটে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই ছেলেটির নিখুঁত অ্যালিবাই আছে। গত সাতদিন ধরে সে কুলিয়াকান জেলে কয়েদ খাটছে।'

স্বস্তির হাসিটা সাবধানে গোপন করল সুহিতা। 'ও আচ্ছা। ঠিক আছে। এমনি কথাটা বললাম আর কী। ধন্যবাদ।'

সুহিতা দ্রুত যোগ দিল সাগর এবং লুই জ্যারেটের সঙ্গে।

ট্যাক্সি চড়ে হোটেল ছেড়ে চলল মাযাটলান অভিমুখে। শহরে পৌঁছানোর আগেই লুই হাইওয়ে থেকে সরু, অসমতল একটি রাস্তায় মোড় নিল। পথটা চলে গেছে অক্সিডেন্টাল পাহাড়ের দিকে।

সমুদ্রের সুশীতল বাতাস এত দূরে পৌঁছায় না। গরম বাতাস, শরীর ঘেমে চটচট করছে। জানালা খুলে রেখেও কাজ হলো না। তবে পাহাড় বেয়ে ওপরে গাড়ি উঠতে শুরু করার সময় আবার শীতল বাতাসের পরশ লাগল গায়ে।

বন্ধুর রাস্তার সমাপ্তি ঘটল কতগুলো পাথুরে বোল্ডারের সামনে এসে। লুই নুড়ি বিছানো রাস্তা দিয়ে গাড়িটি টেনে নিয়ে দাঁড় করাল ভগ্নদশার একটি কুটিরের সামনে। কাঠের তক্তা আর টিনের ক্যান দিয়ে তৈরি কুটির। ঘন ঘন হর্ন বাজাতে লাগল সে। কান ঝালাপালা করা হর্নের শব্দে কুটির থেকে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বেরিয়ে এল কালো চামড়ার এক লোক। তার এক চোখে তাপ্পি। লুই নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। আধা অন্ধ লোকটার সঙ্গে স্প্যানিশে বকবক জুড়ে দিল। সুহিতা আর সাগর দাঁড়িয়ে রইল গাড়ির পাশে। কিছুক্ষণ পরে ফিরল ট্যাক্সি ড্রাইভার।

'ও আমার চাচাত ভাই গুইলেরমো। সে আজকের দিনের জন্য দশ ডলারে দুটো গাধা ভাড়া দিতে রাজি হয়েছে। ভাড়াটা একটু বেশিই। কিন্তু গুইলেরমো এর কমে তার গাধা ভাড়া খাটাবে না।'

'ঠিক আছে,' বলল সাগর। 'তোমার চাচাত ভাইকে বলো আমরা রাজি।'

লুই কী যেন বলল গুইলেরমোকে। লোকটা খোঁড়াতে খোঁড়াতে অদৃশ্য হয়ে গেল কুটিরের পেছনে। একটু পরে ঘুমে ঢুলতে থাকা দুটো গাধা নিয়ে হাজির হলো।

'এ জিনিসের পিঠে চড়ে পাহাড়ে ওঠা যাবে?' সন্দেহ প্রকাশ করল সাগর।

খ্যাঁক খ্যাঁক করে উঠল গুইলেরমো। সাগরের কথা বুঝতে না পারলেও ওর গলার স্বরে ঠিকই বুঝতে পেরেছে কী বলেছে।

সাগর লোকটাকে আর চটাতে চাইল না। বিড়বিড় করে বলল, 'আচ্ছা আচ্ছা। চলবে।'

'কিন্তু স্যাডল?' জিজ্ঞেস করল সুহিতা। 'স্যাডল ছাড়া গাধার পিঠে চড়ব কী করে?'

গুইলেরমো ফাঁকা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সুহিতার দিকে। সুহিতা নিজের প্যান্টে চাপড় দিল, তারপর একটা গাধার হাড্ডিসার পিঠে চাপড় মেরে পুনরাবৃত্তি করল, 'স্যাডল।'

গুইলেরমোর সবেধন নীলমণি চোখটিতে জ্বলে উঠল আলো।

'অঃ সি, লাস মান্তাস!' সে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে কুটিরে ঢুকল, ফিরল পাতলা, ছেঁড়া একজোড়া কম্বল নিয়ে। কম্বল দুটো সাবধানে ভাঁজ করে গাধা দুটোর পিঠে রাখল।

'এটা কোনও স্যাডল হলো?' কটমট করে গুইলেরমোর দিকে তাকাল সুহিতা।

গুইলেরমো ওর কথা বুঝতে পারেনি বোধহয়, তাকিয়ে রইল হাবার মত।

লুই জ্যারেট বলল, 'চিন্তা করবেন না। গাধাগুলো অত জোরে ছুটবে না যে ঝাঁকির চোটে পড়ে যাবেন।'

'আমি সে চিন্তা করছি না,' শুকনো গলায় বলল সুহিতা। 'চলো, রওনা হই,' বলল সাগর। 'তুমি কোন্‌টা নেবে?'

জানোয়ার দুটোকে পরখ করল সুহিতা। দুটোর আকারই একরকম, ঘুম ঘুম চোখ। একটা গাধার দুই কানের মাঝখানের লোম ঘষে দিল সুহিতা। নড়াচড়া করল না গর্দভ।

'আমি এটাকে নেব,' বলল সুহিতা। 'এটাকে মনে হচ্ছে বেশি ভদ্র।'

লুই এবং তার চাচাত ভাই ওদেরকে গাধার পিঠে চড়তে সাহায্য করল। গুইলেরমো দেখিয়ে দিল গাধার চোয়ালের সঙ্গে

বাঁধা রশি কীভাবে চেপে ধরে রাখতে হবে।

'গাধাগুলো আমাদেরকে গন্তব্যে নিয়ে যেতে পারবে তো?' সংশয় প্রকাশ করল সাগর।

'একশোবার,' তাকে আশ্বস্ত করল লুই। 'ওরা ট্রেইল লক্ষ্য করে এগোবে। আর এ রাস্তা সোজা ওই জিপসি বুড়ির বাড়ির কাছে গিয়ে শেষ হয়েছে।'

'আমরা ফিরে এসে তোমাকে কি এখানে পাব?' জিজ্ঞেস করল সুহিতা।

'অবশ্যই পাবেন, সিনোরা। আমি সূর্যাস্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করব। তবে সন্ধ্যার আগে আগে কিন্তু ফিরবেন। পাহাড়ে একটু তাড়াতাড়িই রাত নামে।'

'চিন্তা কোরো না,' বলল সুহিতা, 'আমরা দেরি করব না।'

ওরা গাধার রশি খিমচে ধরে রইল হাতে। যাত্রার সঙ্কেত পেয়ে রওনা দিল গর্দভযুগল। পাহাড়ি রাস্তায় কদম ফেলে এগোতে লাগল।

সুহিতা মনে মনে যে ভয়টা পেয়েছিল তা-ই ঘটল। গাধার পিঠে বসে থাকতে ওর জান বেরিয়ে যাচ্ছে। গাধার পেটের সঙ্গে ওর উরুর ক্রমাগত ঘষায় ছাল চামড়া প্রায় উঠে যাবার জোগাড়। গাধাটা যতবার পা ফেলছে, ঝাঁকির চোটে নিতম্ব মনে হচ্ছে ছিঁড়ে যাবে।

সাগর সরু ট্রেইলের সামনে সামনে এগোচ্ছে, পেছন ফিরল একবার। 'কেমন লাগছে?'

'দারুণ। তবে এ জীবনে বোধহয় আর মাটিতে বসতে পারব না।'

খাড়া ঢাল বেয়ে আরও আধ ঘণ্টা যন্ত্রণাদায়ক যাত্রা শেষে ওরা একটা ঝর্ণার সামনে এসে হাজির হলো। দুটো প্রকাণ্ড পাথরখণ্ডের মাঝ দিয়ে বয়ে চলেছে টলটলে, সুপেয় পানির জলধারা। সুহিতা এবং সাগর ঝটপট নেমে পড়ল গাধার পিঠ

থেকে। আঁজলা ভরে পান করল বরফ-শীতল পানি। গাধাদুটোও নাক চুবিয়ে পানি খেতে লাগল।

'খানিক বিশ্রাম নেয়া যাক,' প্রস্তাব দিল সাগর।

'প্রস্তাবনার জন্য ধন্যবাদ,' বলল সুহিতা।

পাথরের পাশে, রাস্তার ধারে গজানো ঘাসের ওপর বসল সাগর। সুহিতা ওর পাশে বসল।

'এত কষ্ট আর ভোগান্তির আশানুরূপ ফল পেলেই হলো,' বলল ও।

সাগর ওর দিকে তাকিয়ে হাসল, 'এজন্যই আমি একা আসতে চেয়েছিলাম। বঙ্গললনাদের নরম শরীর অল্পতেই কাতর হয়ে পড়ে।

'হয়েছে, কাউবয়, আর মশকরা করতে হবে না। এখন উঠে পড়ো।' মুখ বিকৃত করে খাড়া হলো সুহিতা। হাসতে হাসতে নিজের বাহনের পিঠে চড়ে বসল সাগর। আবার যাত্রা হলো শুরু।

ওরা যখন পথম পাহাড় চুড়োটা টপকাল, সূর্য তখন মধ্য গগনে। ওদের পাশে, খাড়া ঢাল ঝপ করে নেমে গেছে নীচে, মিশেছে সবুজ রেইন ফরেস্টে।

'খোদা, আর কতদূর?' বলল সুহিতা।

'মনে হয় আর যেতে হবে না,' বলল সাগর। 'ওই দ্যাখো।'

সাগরের আঙুল লক্ষ করে তাকাল সুহিতা। পাথরের একটা ঢিবির ওপর একটা কুটির দেখা যাচ্ছে। দেয়ালগুলো কাঠের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি, ছাদ শুকনো ঘাসের চাপড়ার। ছাদের মাঝখানের ফুটো দিয়ে ধূসর ধোঁয়া গলগল করে বেরিয়ে মিশে যাচ্ছে বাতাসে। কুটিরটি লাগছে রুশ রূপকথার ডাইনি বাবা ইয়াগার ঘরের মত।

মনের কথাটা চেপে রাখতে পারল না সুহিতা। 'এটা নির্ঘাত কোনও ডাইনির বাড়ি।'

গাধার পিঠ থেকে নামল দু'জনে। আলগা করে একটা

ঝোপের সঙ্গে বাঁধল রশি যাতে ঘাসটাস খেতে সমস্যা না হয় জানোয়ার দুটোর। অনুগত প্রাণীদুটো মুখ নামিয়ে মোটা মোটা ঘাস খেতে লাগল।

সুহিতা এবং সাগর এগোল কুটিরে। বাড়িটিতে কোনও দরজা চোখে পড়ল না। বদলে কুটিরের খোলা মুখ ঢেকে রাখা হয়েছে কোনও জানোয়ারের শুকনো, ভারী চামড়া দিয়ে। ভেতর থেকে ঝাঁঝালো রান্নার গন্ধ আসছে।

'হ্যালো?' ঝুলন্ত পর্দা লক্ষ্য করে হাঁক ছাড়ল সাগর। 'ভেতরে কেউ আছেন?'

কোনও জবাব নেই।

সুহিতার দিকে তাকিয়ে শ্রাগ করল সাগর। তারপর ভারী চামড়ার পর্দাটা টেনে সরাল একপাশে। ঝাঁঝালো, কটু গন্ধটা ঘুসির মত লাগল নাকে। কুটিরে ঘর একটাই। কামরার মাঝখানে পাথরের চুলোয় আগুন জ্বলছে। পাঁচ গ্যালনের একটা গ্যালন, আগুনে পুড়ে কালো, ঝুলছে একটা খুঁটি থেকে। ক্যানের মধ্যে টগবগ করে ফুটছে কী যেন। ঘরটা প্রচণ্ড উত্তপ্ত।

'*ভায়াসে।* চলে যাও।'

প্রথমে কণ্ঠস্বরের উৎস ঠাহর করতে পারল না সুহিতা। অন্ধকারে একটু চোখ সয়ে এলে দেখতে পেল কাঠির মত সরু এক মহিলা, বেশ লম্বা, মাথা ভর্তি সাদা চুল, অসংখ্য তালি মারা একটা কালো পোশাক গায়ে, দাঁড়িয়ে আছে চুলোর একপাশে। তাকিয়ে রয়েছে ওদের দিকে।

'লুই জ্যারেট আপনার কাছে আমাদেরকে পাঠিয়েছে,' বলল সাগর। আঁধারে চোখ কুঁচকে তাকিয়ে আছে, ভাল করে দেখতে চাইছে মহিলাকে।

জিপসি বুড়ি এক কদম এগোল ওদের দিকে। আগুনের আঁচে আগের চেয়ে পরিষ্কার দেখা গেল চেহারা। গর্তে ঢোকা গাল, প্রকটভাবে উঁচু করে রেখেছে চোয়াল। চামড়ায় আঁকিবুঁকির মত

বলীরেখা প্রমাণ করে মহিলার অনেক বয়স। তবে গভীর কালো চোখ দেখে অনুমান করা যায় একদা বুনো সৌন্দর্যে গর্বিত ছিল বৃদ্ধা।

স্থির নিষ্পলক দৃষ্টিতে সে প্রথমে সাগরকে দেখল তারপর সুহিতাকে।

'ও, তোমরাই তা হলে সেই,' বলল বৃদ্ধা। তার কণ্ঠ দৃঢ়, গলা শুনে বয়স নিরূপণ করা শক্ত।

'লুই আমাদের কথা বলেছে আপনাকে?' জিজ্ঞেস করল সুহিতা।

'ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি।'

'কিন্তু আপনি যে বললেন...আমরাই সেই।'

'জানতাম তোমরা আসবে।'

'আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি?' বলল সাগর। তার কণ্ঠে সম্ভ্রম।

'আঁ, হ্যাঁ, এসো,' বলল বৃদ্ধা।

অন্ধকার কুটিরে ঢুকল সুহিতা এবং সাগর। শক্ত কাঠের কেবিনে কোনও কার্পেট বিছানো নেই। আসবাব যৎসামান্য। ঘরে আলোর উৎস বলতে কেবল চুল্লির আগুন। দোরগোড়ার পর্দা ফেলে দিলে আর বাইরের আলো ভেতরে ঢোকার সুযোগ পায় না।

জিপসি ফিলিনা পিঠবিহীন কাঠের পুরানো একটি চেয়ারে বসতে ইঙ্গিত করল সুহিতাকে। সাগর ওর পাশে দাঁড়িয়ে রইল। স্তূপ করা কম্বলের ওপর ওদের মুখোমুখি বসল বুড়ি।

'তোমাদের গল্প বলো,' বলল ফিলিনা।

সুহিতা শুরু করল। প্রথমে ইতস্তত গলায়, থেমে থেমে, একটু পরেই কেটে গেল আড়ষ্টতা। দ্রুত বলতে লাগল ও নিজের কাহিনি। যা যা ঘটেছে বাদ দিল না কিছুই। ক্যালিফোর্নিয়ার গ্রাম ড্রাগোতে ওয়্যারউলফের সঙ্গে সংঘর্ষ দিয়ে শুরু হলো গল্প,

সিয়াটলের আতঙ্ক, ওয়্যারউলফের লস এঞ্জেলেসে ওর বাবা-মা'র বাড়িতেও ওকে ধাওয়া করার কাহিনি বলে শেষ করল মেক্সিকোর ঘটনা দিয়ে।

নীরবে শুনে গেল ফিলিনা। গল্প শোনার সময় তার চেহারায় কোনও ভাব ফুটল না। নড়াচড়াও করল না। সে যে ঘুমিয়ে পড়েনি বোঝা গেল চোখে চুল্লির আগুনের প্রতিফলন দেখে।

সুহিতার গল্প বলা শেষ হলে দীর্ঘ নীরবতা নেমে এল কুটিরে। অবশেষে কথা বলল জিপসি বুড়ি, 'এজন্যই তোমরা এসেছ আমার কাছে।'

'জ্বী,' বলল সুহিতা, 'আপনি কি আমাদেরকে সাহায্য করতে পারবেন?'

ফিলিনা আগুনের দিকে অনেকক্ষণ আনমনা তাকিয়ে রইল। সুহিতা ভাবল বুড়ি বুঝি ঘুমিয়েই গেছে। হঠাৎ মুখ তুলে চাইল সে। 'তোমার হাতটা দেখি তো।'

সুহিতা তাকাল সাগরের দিকে। চেয়ার ছাড়ল। হেঁটে এল ফিলিনার কাছে। হাঁটু মুড়ে বসল বৃদ্ধার পাশে। বাড়িয়ে দিল হাত। ফিলিনা নিজের হাড্ডিসার হাতে তুলে নিল সুহিতার হাত। ভাঙা নখের ডগা দিয়ে সুহিতার তালুর রেখা স্পর্শ করতে করতে বিড়বিড় করে কী যেন বলতে লাগল, তার একরত্তি বুঝতে পারল না সুহিতা।

কিছুক্ষণ পরে সুহিতার হাত ছেড়ে দিল ফিলিনা। ফিরল সাগরের দিকে। 'এবারে তোমারটা।'

সাগর বুড়ির কাছে এসে মেলে ধরল হাতের তালু। ফিলিনা দ্রুত একবার ওর হাত পরীক্ষা করল। তারপর ঠেলে সরিয়ে দিল হাত।

'আমি তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারব না,' বলল সে।

'হাতে কী দেখলেন?' জানতে চাইল সুহিতা।

মুখ তুলে চাইল ফিলিনা। লালচে আগুনের আভায় বুড়ির

চেহারা ভৌতিক লাগছে। 'সে কথা তোমার না জানাই ভাল।'

'খোদার কসম, আমরা শুনতে চাই,' বলল সাগর। পকেট থেকে ওয়ালেট বের করল, 'আমি আপনাকে টাকা দেব। কত টাকা চাই বলুন।'

বুড়ির গলা দিয়ে শুকনো কাশির মত খকখক শব্দ বেরুল। বোধহয় এটা তার হাসি। 'তোমাদের টাকার আমার দরকার নেই। তবে যদি শুনতেই চাও তা হলে বসো। তোমাদের হাতের কোথায় কী দেখেছি বলব আমি। কিন্তু পরে যেন আমাকে দোষ দিও না।'

সাগর অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে পকেটে ঢোকাল মানিব্যাগ। ফিরে গিয়ে বসল ভাঙা চেয়ারে। সুহিতা বুড়ির পাশেই বসে রইল।

আগুনে চোখ রেখে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল ফিলিনা। তারপর বলল, 'তোমাদের দু'জনের হাতে একই জিনিস লেখা আছে। ওখানে যন্ত্রণা দেখেছি আমি। যন্ত্রণা এবং ব্যথা। আর রক্ত। অনেক অনেক রক্ত। এবং মৃত্যু।'

'না!' অজান্তে আর্তচিৎকার বেরিয়ে এল সুহিতার গলা চিরে।

তীক্ষ্ণ চোখে ওর দিকে তাকাল জিপসি বুড়ি। 'তোমরা কী জন্য এসেছ, ভাল ভাল কথা শোনার আশায়? কিন্তু আমি তোমাদের হাতে যা দেখেছি তাই বললাম। আমার কথা শেষ। এখন তোমরা যেতে পার।' কিছু না বলে চেয়ার ছাড়ল সাগর। সুহিতাকে সিধে হতে সাহায্য করল।

'আমাদের এখন করণীয় কী?' জানতে চাইল সুহিতা।

'আগেরবারের মত আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্রশস্ত্র জোগাড় করবে,' জবাব দিল ফিলিনা। 'তা হলে হয়তো বেঁচেও যেতে পার।'

'এমন কোনও জায়গা কি নেই যেখানে আমরা নিরাপদে থাকতে পারব?'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল জিপসি বুড়ি। 'এরকম কোনও জায়গা নেই। তোমাদের নিয়তি এখানে। এ নিয়তি খণ্ডাতে পারবে না। এখানেই তোমাদের গল্পের সমাপ্তি ঘটবে।'

'সমাপ্তি?' চেঁচিয়ে উঠল সাগর। 'সমাপ্তি মানে কী? আর সমাপ্তি ঘটবেই বা কীভাবে?'

চুল্লির আগুনে দৃষ্টি ফিরে গেল বৃদ্ধার। বলল না কিছু।

'সাগর, ক'টা বাজে?' হঠাৎ জিজ্ঞেস করল সুহিতা।

ঘড়ি দেখল সুহিতা। লম্বা পা ফেলে চলে এল দোরগোড়ায়, ভারী চামড়ার পর্দা সরিয়ে উঁকি দিল। দিগন্ত রেখার দিকে ঢলে পড়ছে সূর্য। জিপসির কুটিরের পুবদিকের উপত্যকায় ইতিমধ্যে ঘনিয়েছে ছায়া।

'ফেরার সময় হলো,' ঘোষণা করল সাগর।

দোরগোড়ায় চলে এল সুহিতা। ফিলিনা কম্বলের ওপর বসে রইল নিজের জায়গায়। ওদের দিকে তাকাল না। সাগর ওয়ালেট থেকে দুটো ডলার বের করে বৃদ্ধার দিকে বাড়িয়ে দিল। নড়ল না বুড়ি। সাগর নোট দুটো রেখে দিল ভাঙা চেয়ারের ওপর, সুহিতাকে নিয়ে বেরিয়ে এল কুটির থেকে।

আসার চেয়ে ফেরার গতি দ্রুততর হলো। গাধা দুটো বাড়ি ফেরার আনন্দে দ্রুত পথ চলল। কিন্তু সূর্যটা যেন ওদের চেয়েও দ্রুত ডুব দিচ্ছে পশ্চিমাকাশে। গুইলেরমোর বাড়ি পৌঁছুতে পৌঁছুতে ঘনিয়ে এল গোধূলি। ওদের পেছনে কালো হয়ে উঠেছে পাহাড়।

লুই ট্যাক্সি নিয়ে ওদের জন্য অপেক্ষা করছে দেখে স্বস্তি পেল সুহিতা। সাগর এবং ও ঝটপট গাধার পিঠ থেকে নামল। গর্দভযুগলকে গুইলেরমোর জিম্মায় বুঝিয়ে দিয়ে চড়ে বসল গাড়িতে। বন্ধ করল দরজা এবং কাচের জানালা। প্লিমাউথে স্টার্ট দিল লুই, কাঁচা রাস্তা ধরে ছুটল রাজপথে। 'একেবারে ঠিক সময়ে এসে পৌঁছেছি,' বলল সাগর। পেছনের জানালায় ঘুরে তাকাল সুহিতা। 'হ্যাঁ, আমি তো ভেবেছিলাম–'

থেমে গেল ও অকস্মাৎ পেছনের অন্ধকার থেকে ভেসে আসা নেকড়ের ক্রুদ্ধ গর্জন শুনে।

চব্বিশ

রাস্তার পাশে, ঝোপে হামাগুড়ি দিয়ে বসে আছে রায়হান মর্তুজা। দেখল তার স্ত্রী এবং বন্ধু ভাঙাচোরা ট্যাক্সিটিতে উঠল। তার কাছ থেকে ত্রিশ গজ দূরেও নেই ওরা। নেকড়ের হামলার শিকার হতে পারে সহজেই। পশ্চিমাকাশে তাকাল রায়হান। সূর্য প্রায় পাটে যেতে বসেছে, তবে এখনও দিগন্তে যেটুকু লাল আলোর আবির ছড়াচ্ছে, রায়হান চাইলেও এ মুহূর্তে নেকড়ে হতে পারবে না। ওরা দু'জন এবারও বেঁচে গেল।

গোধূলির ছায়া দীর্ঘ হলো, বোতল থেকে ছলকে পড়া কালির মত ছড়িয়ে পড়ে আলিঙ্গন করল আঁধার। রায়হান পরনের সুতির শার্টটি টান মেরে ছিঁড়ে ফেলল। ছুঁড়ে ফেলল পায়ের ক্যানভাসের জুতো। তারপর খুলল প্যান্ট। হিমেল রাতে ও এখন নগ্ন, শরীরে দ্রুত পরিবর্তন আশা করছে।

ওর শরীরের পেশীতে শুরু হয়ে গেছে খিঁচুনি। সকেট থেকে বেরিয়ে আসছে হাড়, জয়েন্টগুলোতে তীব্র ব্যথা। সে সামনে ঝুঁকল হাত বাড়িয়ে, হামাগুড়ির ভঙ্গিতে বসে পড়ল মাটিতে। ঘাড়ে ব্যথা শুরু হয়ে গেছে। শরীরে ভাংচুর শুরু হয়েছে সেই সঙ্গে অসহনীয় যন্ত্রণায় চোখে আঁধার দেখছে সে। তারপর উল্লাস অনুভব করতে লাগল সে। স্বাধীনতার বুনো আনন্দে যেন মাতাল হয়ে গেল প্রকাণ্ড নেকড়েটা যে খানিক আগেও ছিল মানুষ।

ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল নেকড়ে। মাথা ঘোরাল। হলুদ চোখ মেলে তাকাল অমসৃণ রাস্তায়। ওটা এঁকেবেঁকে গিয়ে মিশেছে

রাজপথে। অনেক নীচে ট্যাক্সির লাল টেইল-লাইট দুটো এখনও দেখা যাচ্ছে। রাতের আকাশে মুখ তুলে চাইল নেকড়ে। গলা চিরে বেরিয়ে এল ঘৃণা এবং অবজ্ঞা মেশানো সুতীব্র এক চিৎকার।

গুইলেরমোর কুটিরের বেড়ার ভেতরে দাঁড়ানো গাধা দুটো নেকড়ের হুংকারে খাড়া করল কান। ঘাস খাচ্ছিল, চিৎকার শুনে কাঁপাকাঁপি শুরু হয়ে গেল। নরম, নিদ্রালু চোখে ঘনাল ভয়ের ছায়া।

কুটিরের দরজা খুলে উঁকি দিল গুইলেরমো। রাতের অন্ধকারে কিছুই দেখতে পেল না সে। আবার চট করে ঢুকে গেল ভেতরে। বন্ধ করল কপাট। শয়তান তাড়ানোর নানান জিনিস এনে রাখল বন্ধ দরজার সামনে।

গলার গভীর থেকে গর্জন বেরিয়ে আসছে নেকড়ের। সে যদি চায় গর্দভপালকের বন্ধ দরজা তার জন্য কোনও বাধাই নয়। এক থাবায় সে ভেঙে ফেলতে পারে দরজা। কিন্তু গুইলেরমোকে হত্যার কোনও ইচ্ছে তার নেই। লোকটা তার কাছে কোনও গুরুত্ব বহন করছে না। কারণ গুইলেরমো জানে না কিছুই। কিন্তু এ পাহাড়ে আরেকজন মানুষ আছে যার ভাগ্য আজ রাতে অন্যভাবে লেখা হবে। বিশ্বাসঘাতকতার মূল্য তাকে পেতে হবে। ঘুরে দাঁড়াল নেকড়ে। চলল পাহাড়ের উদ্দেশে।

আগুন জ্বলছে অল্প আঁচে। আস্তে আস্তে স্ফুলিঙ্গে পরিণত হলো। টকটকে লাল কয়লা হয়ে জ্বলতে লাগল ফিলিনা বুড়ির ঘরে। ওই নারী এবং পুরুষটি যাবার সময় যেমন পায়ের ওপর পা তুলে আড়াআড়িভাবে বসেছিল, এখনও সেভাবেই বসে রয়েছে ফিলিনা। ভাঙা চেয়ারের ওপর লোকটার রেখে যাওয়া নোট দুটোর দিকে সে তাকায়নি পর্যন্ত, স্পর্শ করা দূরে থাক। দ্রুত শীতল হচ্ছে রাত কিন্তু বৃদ্ধা প্রায় নিভন্ত আগুন উস্কে দিতে উঠল না। সে জানে তার আর উষ্ণতার প্রয়োজন নেই।

অনেক বয়স হয়েছে ফিলিনার। কত বছর? আশি? নব্বুই? মনে নেই তার। শুধু মনে আছে বহু আগে একদা সে এক কিশোরী ছিল। হাসিখুশি, সুন্দরী এক তরুণী। বৃদ্ধার রক্তশূন্য ঠোঁটে আবছা হাসির রেখা ফুটল। কেউ কি তাকে দেখে বিশ্বাস করবে এক সময় সেও দেখতে সুন্দর ছিল? বয়সে তরুণী ছিল?

সে ছিল। তার বাড়ি ছিল স্পেনের টোরেল ভেগার কাছে যেখানে কাণ্টাব্রিয়ান পর্বতমালা এসে মিশেছে বে অভ বিস্কের সঙ্গে। তরুণী ফিলিনা অন্যান্য স্প্যানিশ জিপসি কন্যার মতই হাসত, নাচত, ঠাট্টা-মশকরা করত ছেলেদের সঙ্গে। তারপর অকস্মাৎ সবকিছুর পরিসমাপ্তি ঘটে। জিপসিরা আবিষ্কার করে ফিলিনার রয়েছে বিশেষ এক ক্ষমতা।

বিশেষ ক্ষমতা! খকখক হাসল বৃদ্ধা কাশি দেওয়ার ভঙ্গিতে। ওই ক্ষমতা আসলে ছিল তার জন্য অভিশাপ। ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারার অভিশাপ। সবাই যখন জেনে যায় হাত দেখে ভূত-ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারে ফিলিনা, তার জীবন থেকে উধাও হয়ে যায় তারুণ্য। কেউ কেউ ওর কাছে হাত দেখার মিনতি নিয়ে আসত কেউ বা সভয়ে ওকে পরিত্যাগ করে। ফিলিনার বন্ধু বলে আর কেউ ছিল না। তরুণরা যারা আসত ফিলিনার কাছে, প্রেম নিবেদনের জন্য নয়, তারা আসত ফিলিনার ভয়ঙ্কর ক্ষমতাটাকে কাজে লাগাতে।

শেষে গাঁ ছেড়ে একা একা সাগর পাড়ি দিয়ে চলে আসে মাংটিলানের পাহাড়ে। চিরকালের জন্য পালিয়ে আসে ফিলিনা। কিন্তু এখানে এসেও নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারেনি ফিলিনা। এখানকার জিপসিরাও জেনে যায় ফিলিনার বিশেষ ক্ষমতার কথা। ফিলিনা কোনদিন শহরে যায়নি। যারা তাকে হাত দেখাতে এসেছে, সবাইকে হতাশ করে ফিরিয়ে দিয়েছে ফিলিনা। কিন্তু তারপরও তাদের আসা-যাওয়া অব্যাহত ছিল। ইদানীং আগের মত লোকজন আসে না বটে, তবে কেউ কেউ আসে। যেমন আজ

বাঙালি যুবক-যুবতী দুটো এল। তবে এরাই শেষ।

বিশেষ ক্ষমতা! সে গত দিনগুলোতে কতশত মানুষের হাত দেখে বলে দিয়েছে ভবিষ্যৎ? হাতের রেখায় সে দেখেছে সুখ, শোক, ঐশ্বর্য, ব্যথা-বেদনা, জন্ম, অসুখ এবং মৃত্যু। সে সব দেখেছে। ফিলিনার কাছে মানুষের হাত হলো তার ভবিষ্যতের জানালা। সে নিজের নিয়তিও জানে।

ফিলিনা জানে তার সামনে কী অপেক্ষা করছে। জানে তার হাতে সময় নেই বললেই চলে। ওই দুই বাঙালি যুগল ওর মৃত্যু ডেকে এনেছে। কিন্তু ওরা তো আর তা জানে না। জানে না ওরা ফিলিনার বুকে ছুরি বসিয়ে দিয়ে গেছে।

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল বৃদ্ধা। সে প্রস্তুত। অনেক দিন পৃথিবীর রূপরস ভোগ করেছে সে। আর ভোগ না করলেও আপসোস নেই।

মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে পেল ফিলিনা বাইরে। তার কুটিরের সামনের খোলা ঘাসজমির ওপর মৃদু পা ফেলে এগিয়ে আসছে সাক্ষাৎ যম। ফিলিনার চোখের দৃষ্টি কমে এলেও শ্রবণশক্তি আগের মতই তীক্ষ্ণ। খসখস শব্দ শুনতে পেল সে। দরজার সামনে এসে থেমে গেল। ওটার শক্তিশালী ফুসফুস দিয়ে বাতাস বেরুনো এবং নিঃশ্বাস নেয়ার শব্দও শুনতে পাচ্ছে ফিলিনা। কিন্তু তবু এক চুল নড়ল না বৃদ্ধা।

দোরগোড়ায় ঝোলানো ভারী চামড়ার পর্দাটা ছিঁড়ে টুকরো হয়ে গেল। নেকড়েটা সবেগে ভেতরে ঢুকে পড়েছে। এক সেকেণ্ড ইতস্তত করল সে, দাঁত খিঁচাল। শক্ত মাটির ওপর পা রেখে লাফ দেয়ার প্রস্তুতি নিল। তারপর লাফ মারল।

হিংস্র, খুনে দাঁতের কামড় থেকে নিজেকে রক্ষার কোনও চেষ্টাই করল না ফিলিনা। করলে লাভও হত না। সে অনেকদিন বেঁচেছে। এবং সে এখন মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার জন্য প্রস্তুত।

পঁচিশ

পরদিন সকাল নাগাদ ডাবল মার্ডারের কথা ছড়িয়ে গেল সবখানে। রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেল প্যালেসিও ডেল মার হোটেল। মাযাটলান, কুলিয়াকান, ডুরাঙ্গো এমনকী গালফ অভ ক্যালিফোর্নিয়ার ওপারের লা পাজ শহর থেকেও দলে দলে ট্যুরিস্ট এসে ভিড় করল 'কাবানা ডি মুয়ের্তে' বা ১২ নাম্বার কাবানা এক নজর দেখার জন্য। একের পর এক ট্যাক্সি আসছে এবং দর্শনার্থী উগরে দিয়ে আবার চলে যাচ্ছে বিমান বন্দরে নতুন ট্যুরিস্ট নিয়ে আসতে। একটি ট্যুর বাস সারাক্ষণই ব্যস্ত রইল প্যালেসিও হোটেলে যাত্রী আনা-নেয়ার কাজে।

দৃশ্যপটে এখনও পুলিশ রয়েছে, সঙ্গে সাংবাদিক এবং কৌতূহলী দর্শক। নির্জন হোটেল তাদের ভিড়ে সরগরম, উত্তেজনায় ফুটছে। ম্যানেজার সিনর ডাভিলা তার হোটেলের নিয়মিত অতিথিদের কাছে সাময়িক এ অসুবিধার জন্য বারবার ক্ষমাপ্রার্থনা করে চলেছে, অন্যদিকে বার উপচে পড়া খদ্দেরদের ভিড় সামলাতে অতিরিক্ত লোক নিয়োগ করেছে ওখানে, সেই সঙ্গে লবির স্যুভেনির স্টাণ্ডের আকার করেছে দ্বিগুণ।

গোটা হোটেলে একমাত্র ডাইনিং-রুমেই ভিড় তুলনামূলক কম। ওখানে সাগর এবং সুহিতা ছোট একটি টেবিলে বসে নিচু গলায় কথা বলছে।

কফি ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, সেদিকে খেয়াল নেই সাগরের, সামনে ঝুঁকে এসে বলল, 'তিন বছর আগেও কেউ যদি আমাকে বলত

একজন জিপসি গণকের উদ্ভট ভবিষ্যদ্বাণীর ওপর নির্ভর করে আমাকে আমার কর্মপদ্ধতি ঠিক করতে হবে, হেসেই উড়িয়ে দিতাম তার কথা।

'কিন্তু এখন তো পরিস্থিতি বদলেছে,' মন্তব্য করল সুহিতা।

'অনেক বদলেছে।' সায় দিল সাগর।

'তো আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ কী?'

'জিপসি বুড়ি তো বলল আগেরবারের মত অস্ত্র জোগাড় করে রাখতে পারলে আত্মরক্ষার একটা সুযোগ থাকবে আমাদের।'

'কিন্তু এটা কী করে সম্ভব, সাগর? তোমার তো কোনও বন্দুক নেই। আছে কি?'

'না। আর বিদেশীদের পক্ষে এখানে কোনও অস্ত্র জোগাড় করাও সম্ভব নয়। বিশেষ করে সিলভার বুলেট। অথচ ওদের বিরুদ্ধে লড়াই করার অস্ত্রই আছে দুটো–আগুন এবং সিলভার বুলেট। আগুন দিয়ে লড়াই করা সম্ভব নয়। কাজেই রূপোর তৈরি কোনও অস্ত্র জোগাড় করতে হবে। ছুরি জাতীয় কিছু।'

'রূপোর ছুরি জোগাড় করা যাবে?'

'জোগাড় করতেই হবে। হাতে সময়ও নেই। ক্যালেণ্ডার দেখেছ?'

' দেখেছি। আজ রাতেই পূর্ণিমা।'

'যদি জিপসি মহিলার কথা সত্যি হয়, আমার ধারণা সত্যি হবে, তা হলে আজ রাতেই সবকিছুর পরিসমাপ্তি ঘটবে।'

'সে ভাল হোক আর মন্দই হোক।'

'হ্যাঁ। ভাল হোক আর মন্দই হোক।'

একটা অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে এল ঘরে। ঘড়ি দেখল সাগর। 'আমি বরং শহরে যাই। দেখি রূপোর ছুরির ব্যবস্থা করতে পারি কিনা। আমি যতক্ষণ বাইরে থাকব তুমি কিন্তু ঘর থেকে একপা-ও বেরুবে না।'

'না,' বলল সুহিতা।

কটমট করে ওর দিকে তাকাল সাগর। 'মানে?'

'আমি জুজুর ডরে কাবু হওয়া বাচ্চাদের মত ঘরের মধ্যে বন্দী হয়ে থাকতে পারব না। আমি তোমার সঙ্গে যাব।'

ডানে বামে মাথা নাড়ল সাগর। 'আমি একা গেলে তাড়াতাড়ি যেতে পারব।'

'ঠিক আছে। তবে আমি এখানে বসে তোমার জন্য হাত মোচড়াতে মোচড়াতে অপেক্ষা করতে পারব না।'

সাগর সুহিতার দিকে তাকাল। ওর চোখের ভাষা বুঝতে পেরে বলল, 'অন্তত একা একা কোথাও যেয়ো না।'

'বোটে চড়ে লেকে একটু হাওয়া খেয়ে আসতে পারি। এতে তোমার আপত্তি নেই তো?'

'তুমি বরং ঘরে আছ জানলেই আমি স্বস্তিতে থাকব।'

'আমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে হবে না। কারণ আমি একা বোট-ভ্রমণ করছি না। সঙ্গে কমপক্ষে কুড়ি জন লোক থাকবে। দুপুরের আগে রওনা হবে বোট, ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আবার ফিরেও আসবে। কাজেই সন্ধ্যার আগেই আমি ফিরছি।'

'আশাকরি আমিও সন্ধ্যার আগে ফিরব,' বলল সাগর। 'যত দ্রুত সম্ভব শেষ করব কাজ। আজ রাতে আমরা একসঙ্গে থাকব। জিপসির কথাই যেন ফলে যায়–আজ রাতেই যেন সবকিছুর অবসান ঘটে।'

'লিসার কী হবে?'

'লিসাকে নিয়ে আমি এ মুহূর্তে ভাবছি না। ও যা খুশি করুকগে,' চেয়ার পেছনে ঠেলে সিধে হলো সাগর। 'আমি গেলাম। রেডি হতে হবে। সী ইউ।'

'সী ইউ, সাগর। সাবধানে যেয়ো।'

'তুমিও সাবধানে থেকো,' সুহিতার কাঁধে মৃদু চাপড় মেরে বেরিয়ে গেল সাগর। দ্রুত মিশে গেল লবির মানুষজনের ভিড়ে।

সাগর নিজেদের কাবানায় ফিরে দেখে লিসা এখনও শুয়ে আছে বিছানায়। চিৎ হয়ে শুয়ে আছে সে, মাথাটা এক দিকে কাত করা। চামড়া কেমন বিবর্ণ, কপালে ঘাম। চোখের নীচের ত্বক সামান্য বেগুনি।

'কেমন বোধ করছ এখন?' ক্লজিটে পা বাড়াল সাগর। 'মনে হচ্ছে মারা যাচ্ছি। মেক্সিকান মদটা কী দিয়ে তৈরি, বলো তো?'

'ক্যাকটাস।'

'ও আচ্ছা,' গুঙিয়ে উঠে বিছানায় বসল লিসা। দেখল সাগর ক্লজিট থেকে একটা জ্যাকেট টেনে নিচ্ছে। 'কোথায় যাচ্ছ তুমি?'

'শহরে।'

'শহরে গিয়ে আমরা কী করব?'

'আমরা নয়। আমি।'

'তুমি আমাকে এখানে একা রেখে চলে যাচ্ছ?'

'হুঁ।'

গায়ের ওপর থেকে চাদরটা ছুঁড়ে ফেলল লিসা, নেমে এল বিছানা থেকে। গতরাতের নীল বিকিনি প্যাণ্টি এখনও পরে আছে। সাগরের সামনে এসে দাঁড়াল টলতে টলতে। মুখে রং ফিরে আসছে।

'এসব হচ্ছেটা কী? চেঁচিয়ে উঠল লিসা। 'তুমি সেধে আমাকে মেক্সিকো নিয়ে এসেছ একসঙ্গে সময় কাটাব বলে। তারপর আমাকে এই কুৎসিত ঘরে বসিয়ে বিশ্রী মদ পান করিয়ে ওদিকে গেছ তোমার তথাকথিত বান্ধবীর সঙ্গে প্রেম করতে। তারপর...' রাগে গলা বুজে এল মেয়েটার।

'বিছানায় শুয়ে থাকো,' লিসার দিকে না তাকিয়েই বলল সাগর। 'বিশ্রাম নিলে ভাল লাগবে শরীর।'

'বিশ্রামের নিকুচি করি। আমাকে উপদেশ দিতে আসবে না।'

সাগর ওর দিকে ফিরল, 'লিসা, তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি না।

তোমাকে আমি আর কিছুই বলব না। লস এঞ্জেলেসে ফিরে যাওয়ার রিটার্ন টিকেট আমার সুটকেসে আছে। তুমি যখন খুশি চলে যেতে পার। বাধা দেব না।' সাগরের দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে থাকল লিসা। রাগে নাগিনীর মত ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাস ফেলছে। বিছানায় ধপ করে বসে পড়ল।

'তুমি যাচ্ছ কোন্ চুলোয় শুনি?' হিসিয়ে উঠল লিসা।

'একটা কাজে যাচ্ছি,' শান্ত গলায় জবাব দিল সাগর। 'তোমাকে এখন বলা যাবে না।'

তেতেমেতে আরও কী যেন বলতে যাচ্ছিল লিসা, কিন্তু সুযোগ পেল না। আগেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে সাগর। রাগে গজগজ করতে থাকল লিসা।

হোটেলের সামনে চলে এল সাগর। ড্রাইভওয়েতে মাযাটলান থেকে আসা ট্যুরিস্ট গাড়ির ভিড়। সারির মাঝামাঝি লুই জ্যারেটের লক্করঝক্কড় প্লিমাউথকে দেখতে পেল। দ্রুত কদম বাড়াল ওদিকে। খোলা জানালা দিয়ে তাকাল ড্রাইভারের আসনে।

'লুই, আমাকে শহরের নিয়ে যেতে পারবে?'

ক্যাব ড্রাইভার চমকে উঠে মুখ তুলে তাকাল। 'অঃ সিনর' *বুয়েনাস দিয়াস*। আ ইয়ে মানে আমি একজন প্যাসেঞ্জারের জন্য অপেক্ষা করছি।'

'আমিও একজন প্যাসেঞ্জার,' পেছনের দরজা খুলে গাড়িতে বসল সাগর। 'চলো।'

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বিকট গর্জন ছাড়া ইঞ্জিন চালু করল লুই। ভিড় থেকে কষ্টেসৃষ্টে প্লিমাউথকে বিচ্ছিন্ন করল সে, চলল মাযাটলানের দিকে। সাগর লক্ষ করল আড়ষ্ট হয়ে বসে আছে ড্রাইভার।

'কী হয়েছে, লুই?'

'জ্বী, সিনর?'

'তোমাকে কেমন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত লাগছে।'

'দুশ্চিন্তা তো সবারই থাকে। কেউ তো আর দুশ্চিন্তাবিহীন

জীবন-যাপন করতে পারে না।'

'তা তো বটেই।'

'আপনি কোথায় যাবেন, সিনর?'

'রূপো নিয়ে কাজকারবার করে এমন কারও কাছে যাব।' লুই ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল সাগরের দিকে। 'রূপো?'

'হুঁ। কেন জিনিসটা দরকার নিশ্চয় বুঝতে পারছ।'

'মাযাটলানে রূপোর ব্যবসায়ী পাবেন না। ট্যাক্সকোতে রূপো পেতে পারেন।'

ধৈর্য হারাতে শুরু করল সাগর। 'আমার এখন ট্যাক্সকোতে যাবার সময় নেই। আমার রূপোর ব্যবসায়ীরও দরকার নেই। আমার দরকার রূপোর তৈরি একটি ছুরি। আর সেটা এক্ষুণি দরকার। আমাকে কোনও রৌপ্যকারের কাছে নিয়ে চলো। অথবা নামিয়ে দাও। আমি নিজেই কোনও রৌপ্যকার খুঁজে নিতে পারব।'

মোড় ঘুরল লুই। তার চওড়া কাঁধজোড়া একবার উঁচু হলো, তারপর নিচু হলো দীর্ঘশ্বাসের তালে। 'সি, সিনর।'

ওরা চলে এল মাযাটলানে, ওলাস আলটাস বুলেভার্ড দিয়ে চলছে। এ রাস্তার দু'পাশে বড় বড় হোটেল এবং দামী দামী রেস্তোরাঁ। একটি সাইড স্ট্রীটে গাড়ি ঢোকাল লুই, তারপর আরেকবার মোড় নিল, মন্থর গতিতে চলল সরু একটি এভিন্যু দিয়ে। রাস্তায় গিজগিজ করছে ট্যুরিস্ট শপ আর ফেরিঅলা। আর্ট স্টোরের সামনে বুলফাইটের রঙ ঝলমলে আঁকা ছবি, আছে গিটারের দোকান, আসবারের দোকান, লাল প্লাস্টার করা ষাঁড়ের স্যুভেনির দাঁড় করানো কিছু দোকানের সামনে। ফুটপাতে নারী এবং পুরুষ ফেরিঅলারা ট্রেতে কাছিমের খোলের গহনা, ঘড়ি ইত্যাদি সাজিয়ে বিক্রি করছে।

সাগর দোকানের সাইনবোর্ডগুলোতে চোখ বুলাচ্ছে পছন্দের দোকানটি খুঁজে পেতে। কিন্তু পাচ্ছে না।

'দেখলেন তো, সিনর,' বলল লুই। 'মাযাটলানে রৌপ্যকারের বড্ড অভাব।'

'রৌপ্যকার না থেকেই পারে না,' বলল লুই। 'তুমি চালাতে থাকো।'

পরের ব্লকে সরু একটা দোকান নজর কাড়ল সাগরের। জানালায় পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লেখা : **অর্ডার দিয়ে গহনা বানানো হয়।**

'থামো,' হুকুম দিল ও।

দোকানের সামনে গাড়ি দাঁড় করাল লুই। নেমে এল সাগর।

'আমার জন্য অপেক্ষা করো,' বলল ও।

দোকানের সামনের ফুটপাতে দুটো বাচ্চা সাগরকে দেখে ছুটে এল চুয়িংগাম এবং প্লাস্টিকের ফুল বিক্রি করতে। এক বুড়ি পেভমেণ্ট ধরে দ্রুত এগোল হাতে শুকনো ফলের ঝুড়ি নিয়ে। কালো হয়ে যাওয়া একটা কলা বাড়িয়ে দিল সাগরের দিকে। মহিলা এবং ছেলে দুটোকে পাশ কাটিয়ে গহনার দোকানে ঢুকে পড়ল সাগর।

পরিষ্কার, কালো সুট পরা এক সেলসম্যান দ্রুত কদম ফেলে চলে এল সাগরের কাছে। 'গুড মর্নিং, সার। আপনাকে কি সাহায্য করতে পারি?'

'সম্ভবত,' ডিসপ্লে কেসে চোখ বুলাল সাগর। গহনাগুলো দেখে মনে হচ্ছে মান খারাপ নয়। 'আপনি রূপোর কাজ করেন?'

'করি, সার। আমাদের দক্ষ কারিগর আছে যারা অর্ডার দিলেই আপনার জিনিস বানিয়ে দেবে। জিনিসটা কি কোনও পুরুষ ব্যবহার করবেন নাকি নারী?'

'আমি গহনার খোঁজে আসিনি,' বলল সাগর।

'তা হলে?'

'আমার একটা ছুরি দরকার। রূপোর তৈরি ছুরি।'

লোকটার চোখে আঁধার ঘনাল। মুখ থেকে ধীরে ধীরে মুছে

গেল হাসি। 'ছুরি,' নিরাসক্ত গলায় কথাটা পুনরাবৃত্তি করল সে।

'জ্বী। ছুরির হাতল যা দিয়ে খুশি বানান কিছু আসে যায় না। কিন্তু ফলাটা হতে হবে রূপোর। আর ফলা হবে ছয় ইঞ্চি লম্বা।'

'সম্ভব নয়।'

'কেন? আপনার কারিগর যদি গহনা বানাতে দক্ষই হয়, সে নিশ্চয় রূপো দিয়ে ছুরির ফলা বানিয়ে যে কোনও হাতলে ওটা লাগিয়ে দিতে পারবে।'

'আমি দুঃখিত। কিন্তু সে এ ধরনের কাজ করে না।'

'আমি কি আপনার কারিগরের সঙ্গে একবার কথা বলতে পারি?'

'সে এখানে নেই। অসুস্থ। আজ আর আসবে না। বোধহয় এ হপ্তায় আর আসছে না।'

গহনা বিক্রেতার চোখে চোখ রাখল সাগর। লোকটা ওর তীব্র চাউনি সহ্য করতে না পেরে অন্য দিকে তাকাল।

'আপনি এ রাস্তার যে কোনও স্যুভেনিরের দোকান থেকে ছুরি কিনতে পারবেন।'

'কিন্তু আমার যে ধরনের ছুরির প্রয়োজন তা কিনতে পারব না।'

সেলসম্যান ডিসপ্লে কেসের পেছনে চলে এল। 'আমি দুঃখিত। আপনার জন্য কিছু করতে পারলাম না।'

একটু ইতস্তত করে গোড়ালির ওপর ভর করে ঘুরল সাগর, বেরিয়ে এল দোকান থেকে। ফুটপাত ধরে হেঁটে এগোল লুইয়ের ট্যাক্সির দিকে। খেয়াল করল না বুড়ি ফল বিক্রেতা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। সাগর গাড়িতে উঠতে যাচ্ছে, লুই হাত বাড়িয়ে ওকে বাধা দিল, 'দুঃখিত, সিনর। আপনাকে আর গাড়িতে নিতে পারছি না।'

'মানে?'

'আমার অন্য কাজ আছে।'

সাগর আপত্তির সুরে কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়েছে লুই, চলতে শুরু করেছে গাড়ি। মোটকু ড্রাইভার ঘাড় ফিরিয়ে একবার তাকাল সাগরের দিকে, চোখে অদ্ভুত করুণ চাউনি। 'আমি দুঃখিত, সিনর। *আদিওস (বিদায়)।*'

অ্যাকসিলেরেটরে পা দাবিয়ে ধরল লুই, বুড়ো প্লিমাউথ গর্জন ছেড়ে ছুটল রাস্তায়। বোকার মত ওদিকে তাকিয়ে থাকল সাগর। ওর পেছনে, কম্বলে গা ঢেকে রাখা ফলবিক্রেতা বুড়ির পায়ে যেন পাখনা গজাল, এক ছুটে সে ঢুকে পড়ল গহনার দোকানে।

জনাকীর্ণ রাস্তায় হাঁটা দিল সাগর। ওর মনে হচ্ছে চারপাশের লোকজন ওর দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু মানুষজনের দিকে ঝট করে মুখ তুলে চাইতে দেখল কেউ ওর দিকে তাকিয়ে নেই। লুই জ্যারেটের আচরণ ওকে সাংঘাতিক অবাক করেছে। গহনার দোকানে লোকটাই বা ওরকম করল কেন ওর সঙ্গে? অশুভ একটা আশঙ্কায় ঘাড়ের পেছনের চুলগুলো দাঁড়িয়ে গেল সরসর করে।

বেশি দূর যায়নি সাগর, পেছন থেকে কে যেন হাত রাখল কাঁধে। পাঁই করে ঘুরল ও। গহনার দোকানের সেলসম্যান! সাগরের হাতে ভাঁজ করা এক টুকরো কাগজ গুঁজে দিল সে।

'আপনি যা খুঁজছেন তা এ ঠিকানায় গেলে পাবেন,' বলল সে। 'এর বেশি কিছু আমি বলতে পারব না।' ফুটপাতে হেঁটে যাওয়া পথচারীদের দিকে ভয়ে ভয়ে একবার তাকাল সেলসম্যান, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে হনহন করে চলল নিজের দোকানে।

কাগজটা খুলল সাগর। পড়ল: *তুলিও সান্তোস, ৪৮ কাল্লে ভার্দে।* ও মুখ তুলে চাইতে দেখল সেলসম্যান দৃষ্টির আড়ালে চলে গেছে।

সাগরের মনে শংকা জাগল—এটা কোনও ফাঁদ নয়তো? আজ মানুষজন বড্ড নাটকীয় আচরণ করছে। কিন্তু সাগরের কী করার আছে? সময় বয়ে যাচ্ছে দ্রুত। আর আজ পূর্ণিমার রাত।

ফুটপাত ঘেঁষে যাওয়া একটি ট্যাক্সি হাত তুলে থামাল সাগর।

লাল বেডফোর্ড। লুই জ্যারেটের গাড়ির চেয়ে ভাল চেহারাসুরত। হাতে লেখা কাগজখানা দেখাল ড্রাইভারকে।

'কাল্লে ভার্দে? আপনি সত্যি ওখানে যাবেন?'

'কেন, অসুবিধা কী?'

'ট্যুরিস্টদের জন্য ওটা খারাপ জায়গা। সবার জন্যই খারাপ রাস্তা।

'তবু আমি যাব,' ট্যাক্সিতে উঠে বসল সাগর। 'চলো।'

ছাব্বিশ

কাল্লে ভার্দে রাস্তাটি দেখে মনে হয় না এটি মাযাটলান শহরের একটা অংশ। মাযাটলানের চাকচিক্যময় বুলেভার্ডের সঙ্গে এর কোনও মিলই নেই। দু'পাশে কালের আঘাতে ক্ষয়ে যাওয়া, জীবনের চিহ্নহীন কংকালসার ভবনগুলোর মাঝখানে সরু একটি প্যাসেজের মত রাস্তাটি। রাস্তায় অল্প যে ক'জন পথচারী চোখে পড়ে তারা চোরের মত লঘু পদক্ষেপে হাঁটাচলা করছে যেন এখনই কেউ হাঁক ছেড়ে তাদেরকে থামতে বলবে সার্চ করার জন্য। সিকি মাইল দূরে হতচ্ছাড়া চেহারার রাটোনেরা সেকশন। মানুষের মল-মূত্র ছড়িয়ে আছে রাস্তায়। ক্যাব ড্রাইভার ট্যাক্সি থামাল। 'আমরা গন্তব্যে পৌঁছে গেছি।'

'কিন্তু আমি তো ৪৮ নাম্বার বাড়িটি দেখতে পাচ্ছি না,' বলল সাগর।

'ওই যে আপনার বাড়ি,' কদর্য চেহারার কাঠের একটি ভবনে হাত তুলে দেখাল ড্রাইভার। দোরগোড়ায় বসে রশি নিয়ে খেলা

করছে একটি শিশু।

ক্যাব থেকে নামল সাগর। ড্রাইভারের ভাড়া চুকিয়ে দিল। বাচ্চাটা ওকে ভুরু কুঁচকে লক্ষ করছে। চোখে সন্দেহের ছায়া। সাগর ছেলেটার পাশ কাটাল, ধাক্কা দিতেই খুলে গেল দরজা। অন্ধকার, বাসি গন্ধঅলা একটি ঘরে ঢুকল। ঘর না বলে আঁস্তাকুড় বলা উচিত। একদিকের দেয়ালে লম্বা কাঠের বেঞ্চি। বেঞ্চি এবং মেঝে বোঝাই হয়ে আছে কালো রঙের পট, প্যান, কেতলি, নানান যন্ত্রপাতি, তার, রশি, ধাতব টুকরো ইত্যাদি দিয়ে।

'কেউ আছেন?' হাঁক ছাড়ল সাগর।

মিনিটখানেক বাদে, টাক মাথা, বানর-সদৃশ চেহারার এক লোক পেছন থেকে হঠাৎ উদয় হলো।

'তুলিও সান্তোস?'

'সি?'

'ইংরেজি জানো?'

'অল্প অল্প।'

সাগর বলল, 'আমার একটা রূপোর ছুরি দরকার। বানিয়ে দেয়া যাবে?' টাক-মাথা কাছিয়ে এসে পিটপিট করে তাকাল সাগরের দিকে। 'রূপোর ছুরি,' ধীরে ধীরে পুনরাবৃত্তি করল সে।

'হুঁ।'

'কেন?'

'তা দিয়ে তোমার কী দরকার? আমি টাকা দিয়ে জিনিস কিনে নেব।'

ঠোঁট কামড়াল সান্তোস। ফলে ওকে আরও বেশি বানরের মত লাগল। 'ও, আচ্ছা। রূপোর ছুরি। এক মিনিট।' প্রকাণ্ড কামরার পেছনের আঁধারে আবার অদৃশ্য হয়ে গেল সে। একটু পরে মাখন কাটার ছোট একটি ছুরি নিয়ে উদয় হলো। গর্বভরে সাগরকে দেখাল। 'এই যে রূপোর ছুরি।'

'না, না,' অধৈর্য ভঙ্গিতে বলল সাগর। 'আমি এরকম ছুরি চাই

না। আমার দরকার–' কথা শেষ না করে ঘরের চারপাশে তাকাল ছবি আঁকার মত কিছু পাওয়া যায় কি না দেখতে। কোঁচকানো এক টুকরো ব্রাউন পেপার পেল মেঝেতে। ওটা তুলে নিয়ে বেঞ্চিতে রেখে হাতের চাপে সমান করল। বল পয়েন্ট পেন দিয়ে লম্বা, ভীতিকর চেহারার একটি ছুরির ছবি আঁকল। বোয়ি টাইপের ফলা, কলমের শেষ প্রান্ত ড্যাগারের মুষ্টির মত ধরে বাতাসে কোপ মারার ভঙ্গি করল। 'আমি এরকম একটা ছুরি চাই,' বলল ও। 'বুঝেছ?'

সান্তোস কলম দিয়ে শূন্যে তরবারি চালানোর ভঙ্গি লক্ষ করল তারপর ঝাড়া এক মিনিট কাগজে আঁকা ছুরির ছবি দেখল। অবশেষে মুখ তুলে তাকাল সে। মাথা নাড়ল। 'আমার কাছে এরকম জিনিস নেই। অন্তত রূপোর জিনিস নেই।'

'একটা ছুরি বানিয়ে দেয়া যাবে না?'

আবার অনেকক্ষণ ড্রইং পরখ করল তুলিও সান্তোস, কুঁচকে আছে ভুরু, বারকয়েক নাড়ল টাক মাথা। 'হয়তো যাবে। তবে খরচ পড়বে বেশি।'

'টাকার জন্য ভেবো না,' ওয়ালেট খুলে নোটের তাড়া দেখাল সাগর। 'ছুরিটা বানিয়ে দাও।'

ওয়ালেট থেকে সান্তোসের দৃষ্টি উঠে এল সাগরের মুখে। আস্তে মাথা দোলাল, ঘুরল, ঘরের কিনারে আবর্জনার স্তূপে পা বাড়াল। ঘাঁটতে লাগল আবর্জনা। মিনিট পাঁচেক পরে উল্লসিত চিৎকার দিল টেকো। আবর্জনার ডাঁই থেকে বের করে আনল হাত। রূপোর তৈরি বাঁকাতেরা একটা ট্রে খুঁজে পেয়েছে সে।

'লা প্লাটা,' গর্বিত কণ্ঠে ঘোষণা করল সান্তোষ।

'না, না,' বলল সাগর, ভেবেছে লোকটাকে এখনও বোঝাতে বোধহয় সমর্থ হয়নি। 'আমার একটি ছুরি দরকার।' আবার মূকাভিনয় করে দেখাল। 'একটা ছুরি।' ওপরে-নীচে মাথা দোলাল সান্তোষ, 'জ্বী, বুঝতে পেরেছি। একটা ছুরি।' নোংরা,

কালো তর্জনী দিয়ে ট্রের ওপর ছুরির ফলা এঁকে দেখাল।

'তুমি এই ট্রে দিয়ে ছুরি বানিয়ে দেবে?'

'জ্বী, জ্বী,' দাঁত কেলিয়ে হাসল সান্তোষ। তারপর ম্লান হয়ে গেল মুখের হাসি। 'তবে ছুরিটা তেমন ভাল হবে না। কারণ ট্রের রূপোর মান ভাল না। ছুরির ফলা ধারাল হবে না। ও দিয়ে কিছু কাটাছেঁড়া করা যাবে না।'

'তাতে কিছু আসে যায় না,' বলল সাগর। 'আমাকে ছুরিটি বানিয়ে দাও।'

সান্তোস কাঠের বেঞ্চিওর একটি অংশ পরিষ্কার করে সেখানে রাখল রূপোর ট্রে। তারপর যন্ত্রপাতি নিয়ে এল। অবশেষে শুরু করে দিল কাজ, সাগরের চোখে, অসহ্য ধীর গতিতে।

সাত নাম্বার কাবানায় মৃদু নক্ করল কেউ। চোখ কুঁচকে দরজায় তাকাল লিসা। এখনও রোব পরে শুয়ে আছে বিছানায়। অসময়ে কে এল? সাগর নয় নিশ্চয়, বিছানা ছেড়ে নামল লিসা। হ্যাং ওভার কেটে গেছে। রোবের ফিতে বাঁধল। তারপর এগোল দরজায়। খুলে দিল কপাট।

এক লম্বা, দুর্দান্ত ফিগারের মহিলা দাঁড়িয়ে আছে দোরগোড়ায়। তার চোখজোড়া উজ্জ্বল সবুজ, কাঁধে লুটাচ্ছে কুচকুচে কালো চুলের গোছা। কপালে একটা কাটা দাগ। দাগটা কপাল থেকে চুলের অরণ্যে প্রবেশ করেছে। যেন রূপোর ফালি।

'হ্যালো, লিসা,' বলল মার্সিয়া লুরা।

স্থির দৃষ্টিতে তাকাল লিসা। 'আমি কি আপনাকে চিনি?'

'না। তবে দু'জন মানুষকে আমরা চিনি।'

'কারা তারা?'

'একজন সাগর চৌধুরী। অপরজন সুহিতা সুলতানা অ্যাডামস।'

দাঁতে দাঁত ঘষল লিসা। 'অঃ ওই মহিলা।'

'তুমি যেমন ওকে পছন্দ কর না আমিও তেমনি ওকে সহ্য করতে পারি না,' বলল মার্সিয়া।

'আঃ, ভেতরে আসুন,' দ্বিধাগ্রস্ত গলায় বলল লিসা। 'আমি গোসলে যাব ভাবছিলাম।'

ঘরে ঢুকল মার্সিয়া, পেছনে বন্ধ করে দিল দরজা। অনাগ্রহ নিয়ে কামরার চারপাশে একবার চোখ বুলাল। তারপর ঝকঝকে উজ্জ্বল চোখ জোড়া ফেরাল লিসার দিকে।

'তুমি কি সুহিতা সুলতানাকে সারা জীবনের জন্য তোমার জীবন থেকে বিদায় করে দিতে চাও? এবং সাগর চৌধুরীর জীবন থেকে?'

'আঃ...হ্যাঁ, চাই।'

'সেক্ষেত্রে আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি।'

'কেন? আপনি আমাকে সাহায্য করতে চাইছেন কেন?'

'আমার নিজের স্বার্থেই তোমাকে আমি সাহায্য করতে চাইছি। ওই মহিলার সঙ্গে আমার পুরানো একটা বোঝাপড়া আছে।'

লিসা টের পেল সে হাঁটুতে কোনও সাড়া পাচ্ছে না। সামনে দাঁড়ানো মহিলা যেন তাকে সম্মোহন করছে, সবুজ নয়না ওকে যে আদেশ করবে তা-ই যেন ও পালন করতে বাধ্য হবে।

'আমাকে আপনি কী করতে বলেন?'

লিসার হাত নিজের হাতে তুলে নিল মার্সিয়া, ওকে নিয়ে সোফায় বসল। কথা বলতে বলতে মার্সিয়া তার হাত আলগোছে রাখল লিসার উরুতে। পাতলা রোব ভেদ করে মহিলার হাতের উত্তাপ যেন ঢুকে গেল লিসার শরীরে।

'শুনলাম সুহিতা বোট-ভ্রমণে গেছে,' বলল মার্সিয়া। 'সে ফিরে এলে তুমি তাকে একটি খবর দেবে।'

'খবর দেব।' ভোঁতা গলায় বলল লিসা। এই অদ্ভুত নারীর স্পর্শে ওর শরীরে নতুন এক ধরনের উত্তেজনার সৃষ্টি হচ্ছে।

'ওকে বলবে সে যখন বাইরে ছিল ওই সময় ফিরে এসেছিল সাগর চৌধুরী। সুহিতার জন্য সে অপেক্ষা করতে পারেনি। বলবে সাগর তাকে জিপসি বুড়ির কুটিরে যেতে বলেছে। সে ওখানে সুহিতার জন্য অপেক্ষা করবে।'

'জিপসি বুড়ির কেবিন? কোথায় সেটা?'

'সুহিতা চেনে,' বলল মার্সিয়া। 'বলবে এটা জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন। সুহিতা যেন এক্ষুণি সাগরের সঙ্গে দেখা করতে যায়।'

'আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না,' বলল লিসা। মার্সিয়ার হাত খেলা করছে লিসার উরুতে। 'এই সুহিতা মেয়েটা যখন কুটিরে গিয়ে হাজির হবে, তার জন্য অপেক্ষা করবে দারুণ এক চমক। তার অতীত থেকে কেউ চলে আসবে ওখানে। এমন একজন যে সুহিতা-সাগরের সম্পর্কটাকে ভেঙে তছনছ করে দেবে।'

মহিলা কী বলছে মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছে না লিসা। সে তেমন মনোযোগ দিয়ে শুনছেও না। তার মনোযোগ মহিলার হাতের দিকে। আহ্, কী দারুণ স্পর্শ! সে যখন কথা বলল, ফিসফিসে শোনাল কণ্ঠ। 'কিন্তু সুহিতাকে খবরটা দেয়ার আগেই যদি চলে আসে সাগর?'

মার্সিয়া সোফায় লিসার মুখোমুখি বসল।

'সাগর আজ তাড়াতাড়ি ফিরছে না,' বলল মার্সিয়া।

'ওর যাতে ফিরতে দেরি হয় সে ব্যবস্থা আমি করে রেখেছি।

'আচ্ছা,' বলল লিসা।

'বোট ঘণ্টখানেকের মধ্যে ফিরে আসবে,' বলল মার্সিয়া।

'সুহিতা হোটেলে পৌঁছামাত্র খবরটা ওকে দেবে।'

'দেব,' ফিসফিস করল লিসা। ওর মাথায় এ মুহূর্তে কিছু খেলা করছে না। শরীর সাড়া দিচ্ছে। এবং পুরোটাই যেন এ মহিলার ইচ্ছেয়। মহিলার ইচ্ছের দাস বনে গেছে লিসা। মার্সিয়ার হাত ঢেকে দিল সে নিজের হাত দিয়ে। ঘন ঘন শ্বাস ফেলছে

লিসা, জিজ্ঞেস করল, 'সুহিতা কি আমার কথা বিশ্বাস করবে?'

'তাকে বিশ্বাস করানোর দায়িত্ব তোমার,' বলল মার্সিয়া। 'সাগর চৌধুরীর কোনও কিছু তোমার কাছে নেই। একান্ত ব্যক্তিগত কিছু? এমন কিছু যা সুহিতাকে দেখালে সে বিশ্বাস করবে তুমি যা বলো তা সত্যি?'

চিন্তা করার চেষ্টা করল লিসা। কিন্তু মহিলা ওর শরীর নিয়ে এমন কাণ্ড শুরু করেছে, তীব্র সুখ এবং উত্তেজনায় চিন্তাভাবনাগুলো গোছাতে পারছে না ও। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল।

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমার কাছে একরকম একটা জিনিস আছে। দেখাচ্ছি আপনাকে।'

উঠে দাঁড়াল লিসা, সাবধানে পা ফেলে এগোল ঘরের কিনারে রাখা আলমারিতে। ওপরের ড্রয়ার খুলে সরাল তার গহনার বাক্স। আংটি, ব্রেসলেট ইত্যাদি ঘাঁটাঘাঁটি করতে লাগল অনুভূতিহীন আঙুলে। অবশেষে পেয়ে গেল যা খুঁজছিল–সাগরের পকেট থেকে পড়ে যাওয়া সিলভার বুলেট।

সোফা ছাড়ল মার্সিয়া, হেঁটে এল লিসার পাশে।'

'তুমি এটা পেয়েছ?'

'জ্বী। জানি না কেন তবে এ জিনিসটা নাকি সাগরের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ,' খোলা তালুতে বুলেট রেখে মার্সিয়ার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল লিসা। ঝাঁকি খেয়ে পিছু হঠল মার্সিয়া যেন ফণা তোলা বিষাক্ত গোক্ষুর দেখছে। লিসা বিস্মিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল। দ্রুত নিজেকে সামলে নিল মার্সিয়া।

'এতেই কাজ হবে,' বলল সে।

মার্সিয়ার মুখে ভয়াল এক টুকরো হাসি ফুটল। দেখে ভয় লাগল লিসার। পরক্ষণে হাসিটি অদৃশ্য হয়ে গেল, মার্সিয়া আবার আগের হাসিখুশি চেহারায় ফিরে এল।

লিসা ড্রয়ারে রেখে দিল সিলভার বুলেট।

সাতাশ

সাগর চৌধুরীর মনে হচ্ছে অসহ্য ধীর গতিতে বয়ে চলেছে সময়। নার্ভাস লাগছে। ঘামে ভিজে গেছে বগল এবং কাঁধ। বাসিগন্ধযুক্ত মস্ত কামরায় অনবরত অস্থির পায়চারি করে চলেছে সে। তুলিও সান্তোস করাত, হাতুড়ি আর উকো দিয়ে রূপোর ছুরি তৈরিতে ব্যস্ত।

সাগর লোকটার পেছনে এসে দাঁড়াল। দেখল ধীরে সুস্থে ছুরির ফলার আকৃতি দিচ্ছে টেকো। 'একটু তাড়াতাড়ি করা যায় না?' জিজ্ঞেস করল ও।

ঘুরে ওর দিকে তাকাল সান্তোস। দৃষ্টিতে অসন্তোষ। 'সিনর,' ভাবলেশ শূন্য গলায় বলল, 'তাড়াহুড়ো করলে জিনিস খারাপ হবে। আপনি কি চান আপনাকে খারাপ জিনিস দিই?'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' বলল সাগর। 'তুমি চালিয়ে যাও।' গম্ভীর মুখে মাথা ঝাঁকিয়ে কাজে ফিরে গেল সান্তোষ।

প্যালেসিও ডেল মার হোটেলের নীচে, ছোট ডক-এ নোঙর করল বোট। সুহিতা ডেক-এ খাড়া হলো, তীরে দাঁড়ানো মানুষের ভিড়ে খুঁজছে পরিচিত মুখ। কিন্তু সাগর চৌধুরী নেই। অবাক হয়ে গেল লিসা ভ্যান্সকে দেখতে পেয়ে। যেসব ট্যুরিস্ট নৌকা ভ্রমণে যাবে তাদের সারি থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে লিসা, সরাসরি তাকিয়ে আছে সুহিতার দিকে।

নামিয়ে দেয়া হলো বোটের সিঁড়ি। ডক-এ উঠে এল সুহিতা।

সঙ্গে সঙ্গে ওর কাছে চলে এল লিসা। মেয়েটার চোখ অস্বাভাবিক উজ্জ্বল। তবে দেখে মনে হচ্ছে না মদ পানের ফল।

'হাই,' জোর করে হাসল লিসা।

হাসি ফিরিয়ে দিল না সুহিতা। জবাবে শুধু মৃদু মাথা দোলাল। অপেক্ষা করছে মেয়েটা তাকে কী বলে শোনার জন্য।

'সুহিতা, আমি জানি তুমি আমাকে পছন্দ কর না,' বলল লিসা। 'অবশ্য এ জন্য আমিই দায়ী। কারণ তোমার সঙ্গে আমি খুব একটা ভাল ব্যবহার করিনি। বরং বাচ্চাদের মত তোমাকে হিংসা করেছি। এজন্য আমি অত্যন্ত লজ্জিত। আমি ভেবেছি তুমি সাগরের প্রেমিকা। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি ধারণাটা ভুল ছিল আমার।'

'ঠিক আছে,' বলল সুহিতা। 'আমি কিছু মনে করিনি।' 'আমার সমস্যাটা বুঝতে পেরেছ বলে ধন্যবাদ। আশা করি আজ থেকে আমাদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির আর অবকাশ থাকবে না। আমরা দু'জন দু'জনের খুব ভাল বন্ধু হতে পারব। সাগরকে এ কথাই বলছিলাম।'

'সাগর এখানে আছে?'

'না। তুমি নৌকা-ভ্রমণে যখন ব্যস্ত ওই সময় শহর থেকে ফিরেছিল সাগর। কিন্তু তক্ষুনি আবার বেরিয়ে গেছে। তোমাকে একটা কথা বলতে বলেছে।'

'কী কথা?'

'বলল তুমি যেন জিপসি বুড়ির কুটিরে চলে যাও। ওর কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝিনি আমি। কিন্তু বলল তুমি নাকি বুঝতে পারবে।'

সুহিতা তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রইল মেয়েটার দিকে। সাগর কেন জিপসি বুড়ির কুটিরের কথা একে বলতে যাবে? হয়তো আর কাউকে বলার মত সুযোগ পায়নি...

'সাগর বলল ব্যাপারটা খুব জরুরী,' বলে চলল লিসা। 'এটা

নাকি জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন। আমাকে আর কিছু বলেনি। তবে চেহারা দেখে মনে হয়েছে ও খুব সিরিয়াস।'

'তুমি বলছ সাগর আমাকে জিপসি বুড়ির কেবিনে যেতে বলেছে?' বলল সুহিতা। 'এক্ষুনি?'

'তাই তো বলল ও। বেশ কয়েকবারই বলেছে।'

দ্রুত হিসেব নিকেশ শুরু করে দিল সুহিতা। এখন দুপুর। এক্ষুনি যাত্রা শুরু করলে সাঁঝের আঁধার ঘনাবার আগেই ও ফিলিনা বুড়ির কুটিরে পৌঁছে যেতে পারবে। কিন্তু শহরে আর ফিরে আসার সুযোগ থাকছে না। রাতের বেলা পাহাড়ের বিপদ সম্পর্কে ভালই জানা আছে সাগরের। তবু যখন যেতে বলেছে নিশ্চয় বিশেষ কোনও কারণ আছে।

'আর কিছু বলেনি ও তোমাকে?' জিজ্ঞেস করল সুহিতা। 'কেন যেতে হবে তার কোনও ব্যাখ্যা দেয়নি?'

মাথা নাড়ল লিসা। 'ওহ্, আমি তো ভুলেই গেছিলাম...'

সাদা জিন্সের পকেটে হাত ঢোকাল। 'সাগর এ জিনিসটা তোমাকে দিতে বলল। তুমি নাকি এর অর্থ বুঝতে পারবে।'

মেয়েটার হাত থেকে রূপোর ধাতব খণ্ড তুলে নিল সুহিতা। একটি বুলেট। গায়ে ক্ষতচিহ্ন, ভোঁতা, তবে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে এটি সেই সিলভার বুলেটগুলোর একটি যা দিয়ে সাগর ড্রাগোতে ওয়্যারউলফের সঙ্গে লড়াই করেছিল। কিন্তু এটি সুহিতাকে দেখতে দিতে বলার মানে কী? সাগর কি নতুন কোনও অস্ত্র পেয়ে গেছে? কিন্তু এর সঙ্গে জিপসি বুড়ির কুটিরের কী সম্পর্ক? অর্থ বা মানে যা-ই থাকুক, সিলভার বুলেটটি প্রমাণ করছে এটি সত্যি লিসাকে দিয়েছে সাগর।

'এসবের মানে কী, সুহিতা?' চোখ বড় বড় করে জানতে চাইল লিসা।

'আমি নিজেও জানি না,' অন্যমনস্ক সুরে জবাব দিল সুহিতা। পা বাড়াল হোটেলে, হঠাৎ ঘুরল। 'ধন্যবাদ, লিসা। খবরটা দেয়ার

জন্য অনেক ধন্যবাদ।'

'আরে ধুর বাদ দাও তো। শোনো, তোমার আর কোনও সাহায্যে আসতে পারি?'

'না, না। আর কোনও সাহায্য লাগবে না। আমি গেলাম।' ঢাল ধরে হোটেল অভিমুখে দ্রুত কদম বাড়াল সুহিতা। পেছন ফিরলে দেখতে পেত ওর দিকে তাকিয়ে হাসছে লিসা। শীতল, ক্রূর হাসি।

সুহিতা ঘরে ঢুকে দ্রুত পরে নিল বাইরে যাবার পোশাক। প্রার্থনা করল সাগরের সঙ্গে জিপসির কেবিনে দেখা হবার পরে যেন সুসংবাদ শুনতে পায়। যেন দীর্ঘ দুঃস্বপ্নের ঘটে অবসান।

হোটেলের সামনে এসে লুই জ্যারেটের ট্যাক্সির খোঁজ করল সুহিতা। কিন্তু পুরানো প্লিমাউথটিকে দেখতে পেল না। লুইয়ের ট্যাক্সিতে যেতে স্বচ্ছন্দ বোধ করত ও। তবে লোকটাকে এখন খোঁজার সময় নেই। একটি ট্যাক্সি এসে থামল হোটেলের সামনে। মাঝবয়েসী এক দম্পতি নামল ক্যাব থেকে। ট্যাক্সির গায়ে বড় বড় অক্ষরে লেখা MAZATLAN। সুহিতা দ্রুত কদমে ড্রাইভারের কাছে চলে এল।

'গুইলেরমো নামে কাউকে চেনেন আপনি? গাধা ভাড়া দেয়।'

'চিনি।'

'আমাকে ওখানে নিয়ে যেতে পারবেন?'

'গুইলেরমোর বাড়ির রাস্তা খুব খারাপ। ভাড়া বাড়িয়ে দিতে হবে।'

'দেব। চলুন।'

ড্রাইভারের দরজা খুলে দেয়ার জন্য অপেক্ষা করল না সুহিতা। নিজেই দরজা খুলে ঢুকে পড়ল ট্যাক্সিতে। গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে হাইওয়ে অভিমুখে ছুটল ড্রাইভার।

ছুরি বানানো শেষ। সাত ইঞ্চি লম্বা ফলা, হাতলের জন্য চার ইঞ্চি

জায়গা রাখা হয়েছে। সাগর তখুনি ছুরিটা নিতে চাইল। কিন্তু সান্তোস হাতল না বানিয়ে ছুরি দেবে না। অবশ্য হাতল ছাড়া ছুরি ব্যবহার করা খুব কঠিন। কাজেই আরও আধ ঘণ্টা বসে থাকতে হলো সাগরকে। সান্তোস আবর্জনার স্তূপ থেকে একটা হান্টিং নাইফ বের করল। পুরানো ছুরিটি থেকে খুলে নিল হাত। ওটাই বসিয়ে দিল রূপোর ফলার গায়ে।

তবে সান্তোস অস্ত্রটার ভারসাম্য রক্ষার শক্তি সম্পর্কে এখনও সন্দিহান। কিন্তু সাগর একরকম জোর করেই তার কাছ থেকে কেড়ে নিল ছুরি, হাতে গুঁজে দিল একতাড়া ডলার। সান্তোস হান্টিং নাইফের চামড়ার খাপ এবং বেল্ট লুপ দিয়ে দিল সাগরকে। সাগর চামড়ার খাপে পুরল রূপোর ছুরি তারপর ঊর্ধ্বশ্বাসে বেরিয়ে এল রাস্তায়।

রাস্তায় কোন ট্যাক্সি নেই। কোনও যান্ত্রিক বাহনই চোখে পড়ছে না। বাড়ি ঘরের সামনে জনমনিষ্যির চিহ্ন নেই। ভবনের দরজা-জানালা বন্ধ। রাস্তায় বাড়ির ছায়া দীর্ঘতর হয়ে জানান দিচ্ছে বেলা গড়িয়ে যাচ্ছে।

তুলিও সান্তোসের ঘরে আবার ঢুকল সাগর। সে জানাল এখন কোনও ট্যাক্সি মিলবে না। না, এখানে ফোন করারও ব্যবস্থা নেই। নিষ্ফল ক্রোধে নিজের হাতের তালুতে ঘুসি মারল সাগর। আবার বেরিয়ে এল জনমানবশূন্য রাস্তায়। সুহিতা হয়তো এতক্ষণে দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছে ওকে নিয়ে। ভেবে পাচ্ছে না ফিরতে কেন দেরি হচ্ছে সাগরের।

রাস্তায় ভ্যাবলার মত দাঁড়িয়ে থাকার কোনও মানে নেই। খালি, অন্ধকার রাস্তা ওকে কোনও সাহায্য করতে পারবে না।

ছুটতে শুরু করল সাগর। পশ্চিমে চলেছে ও। ওদিকটাতে শহর। ওদিকে নিশ্চয় ট্যাক্সি কিংবা পুলিশের লোক কিছু একটা পাওয়া যাবে। দৌড়ানোর তালে ছুরির খাপ বাড়ি খাচ্ছে নিতম্বে। হাত দিয়ে ছুরি চেপে ধরে রাখল সাগর যেন ছিটকে পড়ে না

যায়। ওর বারবার মনে হচ্ছে আজ রাতে এ ছুরিটি ওকে কোথাও না কোথাও ব্যবহার করতে হবে।

আটাশ

এবড়োখেবড়ো রাস্তা ধরে ট্যাক্সি সুহিতা সুলতানাকে নিয়ে চলেছে পাহাড়ের কোলে। ড্রাইভার ঘ্যানঘ্যান করেই চলেছে এমন বাজে রাস্তা দিয়ে চলার কারণে তার বাহনের বারোটা বাজতে আর দেরি নেই। অনেকক্ষণ পরে, সুহিতার মনে হলো ঘণ্টাখানেক, গুইলেরমোর বাড়ির সামনে এসে গাড়ি থামাল ড্রাইভার।

'ওটাই গুইলেরমোর বাড়ি, লেডি,' বাড়ির দিকে হাত তুলে দেখাল ড্রাইভার।

'ধন্যবাদ,' গাড়ি থেকে নেমে পড়ল সুহিতা।

'দশ ডলার দিন।'

অনেক বেশি ভাড়া চাইছে ব্যাটা। সুহিতা শুধু একবার কটমট করে তাকাল ড্রাইভারের দিকে। কিন্তু কিছু বলল না। এখন ভাড়া নিয়ে বচসা করার সময় নেই। পকেট থেকে দশ ডলারের একটা নোট বের করে লোকটাকে দিল সুহিতা। কাঁকর বিছানো পথ মাড়িয়ে পা বাড়াল গুইলেরমোর কুটিরে। কাঠের দরজায় সজোরে করাঘাত করল। কিন্তু ভেতরে কারও সাড়া মিলল না।

'হ্যালো?' ডাকল সুহিতা। 'গুইলেরমো আছেন?'

তবু কোনও জবাব নেই। দরজায় ধাক্কা দিল সুহিতা। খুলল না। ঘুরে বাড়ির পেছন দিকে চলে এল ও। কাঠের একটা খোঁয়াড়ে আধডজন গাধা গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে আছে। তারা

নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে তাকাল সুহিতার দিকে। গুইলেরমোকে আশপাশে কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

কুটিরের সামনে থেকে হঠাৎ ভেসে এল ইঞ্জিন চালু হবার আওয়াজ, তারপর নুড়িতে টায়ার ঘোরার শব্দ। সুহিতা ছুটে এল বাড়ির সামনে। দেখল ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে রওনা হয়ে গেছে শহরে।

'ধন্যবাদ,' ক্রমে অপসৃয়মাণ ক্যাবের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করল সুহিতা।

বুক ভরে দম নিল ও, নিজেকে শান্ত থাকার সাজেশন দিল। এখন শহরে ফিরে যাবার প্রশ্নই নেই। বেলা পরে আসছে। হাইওয়ে পর্যন্ত যেতেই ঘনাবে আঁধার, শহরে ফিরতে ফিরতে তো রীতিমত রাত। আর রাতের বেলা একা থাকার কোনও খায়েশ নেই সুহিতার।

গাধার পিঠে চড়ে অবশ্য সন্ধ্যার আগেই জিপসির কুটিরে পৌঁছাতে পারবে সুহিতা। বুড়ির কেবিনে সাগর থাকবে। কাজেই ওখানে যাওয়াই সবচেয়ে নিরাপদ।

কুটিরের পেছনে, গাধাগুলো যেখানে রাখা হয়েছে সেখানে চলে এল সুহিতা। একগাদা পুরানো কম্বল পেয়ে গেল। একটা কম্বল ভাঁজ করে একটা গাধার পিঠে চাপাল।

খুলল খোঁয়াড়ের দরজা। বের করে নিয়ে এল জানোয়ারটাকে। তারপর বন্ধ করে দিল গেট। গাধার পিঠে চড়ল সুহিতা, অনুনয় করল সামনে বাড়তে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও ট্রেইল ধরে এগোতে লাগল গর্দভ।

পথ চলেছে সুহিতা, ওর গায়ে পাহাড়ের ছায়া ক্রমে লম্বা হচ্ছে। প্রতি মুহূর্তে মনে করিয়ে দিচ্ছে ছুটে আসছে আঁধার, নিয়ে আসছে রাতের যত আতংক।

জোর করে মন থেকে এসব চিন্তা ঠেলে সরানোর চেষ্টা করল সুহিতা। গাধাটাকে আরও জোরে চলার জন্য ধমক দিল, কাকুতি

মিনতি করল। ভারবাহী জানোয়ারের মন্থর গতির কোন পরিবর্তন হলো না। ঝর্ণাটা পার হলো সুহিতা। গতবার এ ঝর্ণার পাশে বসে খানিক বিশ্রাম নিয়েছিল সুহিতা এবং সাগর, পান করেছিল ঝর্ণার পানি। কিন্তু এখন বিশ্রামের সময় নেই। ও গাধার কান মুচড়ে দিয়ে হুকুম করল আরও জোরে কদম বাড়াতে।

ছায়া ঘনিয়ে আসছে হাঁ হাঁ করে। সুহিতা যখন বুড়ি ফিলিনার কুটিরে পৌঁছল ততক্ষণে লাল টকটকে সূর্যটা হেলে পড়তে শুরু করেছে পশ্চিম দিগন্তে। কাঠের কেবিনটা পরম আশ্রয়স্থল বলে মনে হলো সুহিতার কাছে। জীবনের কোনও চিহ্ন নেই। তবে আগের মতই ছাদের গর্ত দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে গলগল করে।

সাগর ওকে অভ্যর্থনা জানাতে এগিয়ে এল না কেন? অবাক লাগল সুহিতার। হয়তো ভেতরে বসে কথা বলছে ফিলিনার সঙ্গে। টের পায়নি সুহিতা এসেছে।

গাধার পিঠ থেকে নেমে পড়ল সুহিতা। এগোল কুটিরের দরজায়। নিজের অজান্তেই গতি ধীর হয়ে এল। দরজায় ভারী চামড়ার সেই পর্দাটা কোথায়? সাবধানে পা বাড়াল সুহিতা। উঁকি দিল কেবিনে। চুল্লির লাল-কমলা রঙের আগুনের আলো কুটিরের দেয়ালে নাচানাচি করছে। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে পড়ল সুহিতা।

'সাগর...? ভেতরে কেউ আছেন?'

মুহূর্তে সুহিতা বুঝতে পারল ভজকট আছে একটা। মস্ত একটা ভকজট। কুটিরের চেহারাসুরত আগের মত নেই, গুইলেরমোর অনুপস্থিতি, সাগরের মেসেজ–সবকিছুর মধ্যেই একটা ভজকট আছে। তবে ব্যাপারটা বুঝতে দেরি করে ফেলেছে সুহিতা। পিছিয়ে আসতে শুরু করল ও। প্রথমে এক কদম। তারপর দ্বিতীয় কদম।

কিন্তু তৃতীয় কদম ফেলার আগেই পেলব ও শক্তিশালী একটি হাত পেছন থেকে ওর গলা জড়িয়ে ধরল, চাপ দিল শ্বাসনালীতে। চিৎকার দিতে চাইল সুহিতা। কিন্তু গলা দিয়ে কোনও শব্দ বেরুল

না। ওর নিঃশ্বাস বন্ধ করে দেয়া হাতে খামচি বসাল। কিন্তু ওর গলা ছাড়ল না হাত। ক্রমে আরও চাপ বাড়ল গলায়।

সুহিতার দুনিয়া আঁধার হয়ে আসছে। কাটা ধমনী দিয়ে রক্তক্ষরণের মত ওর সমস্ত শক্তি কমে আসছে। ওর চোখের পেছনে জ্বলে উঠল লাল আগুনের অসংখ্য স্ফুলিঙ্গ। কানে আছড়ে পড়ল বাতাসের হুঙ্কার।

তারপর কেবলই অন্ধকার।

ঊনত্রিশ

রাস্তায় দৌড়াচ্ছে সাগর চৌধুরী। পেভমণ্টে ওর জুতোর আওয়াজ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই। অনেকগুলো ব্লক পার হবার পরে ফুটপাত ঘেঁষে একটি ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল ও। ক্যাবটা খালি তবে কাছের একটি দরজা থেকে রেকর্ড করা মিউজিকের শব্দ আসছে। দোরগোড়ায় ঝোলানো পর্দা ঠেলে সরিয়ে ভেতরে ঢুকল সাগর।

এটা একটা ক্যাণ্টিনা। কামরার ভেতরটা আবছা অন্ধকার। সিগারেট আর মরিচের গন্ধ ঘরে। ত্রিশ বছরের পুরানো জুক বক্সে মেক্সিকান গান বাজছে করুণ সুরে। বার-এ বসে আছে অনেকগুলো লোক। পরনের কাপড়চোপড় রংচটা, ঢোলা। সাগরের দিকে তারা নিরাসক্ত দৃষ্টিতে তাকাল। পেছনে, একটা টেবিল দখল করে রেখেছে দুই মহিলা। মুখে ভারী মেকআপ। টেকুইলা পান করছে। সাগরের দিকে তাকিয়ে পেশাদারী হাসি উপহার দিল তবে চোখ জোড়া ভাষাহীন।

খদ্দেরদের দিকে নজর দিল না সাগর। খসখসে কাঠের বার-এ ঝুঁকল ও, কাউন্টারের পেছনে দাঁড়ানো, আস্তিন গোটানো লোকটার সঙ্গে কথা বলল।

'বাইরে একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে দেখলাম। মালিক কই?'

বারটেণ্ডার কিছু না বলে বার-এর দিকে তাকাল। খদ্দেরদের মধ্যে একজন, গালে আঁচিল, হালকা-পাতলা গড়নের একটা লোক বলে উঠল, 'আমি। আমি ওই ট্যাক্সির মালিক।'

'আমাকে তুমি প্যালেসিও ডেল মার-এ নিয়ে যেতে পারবে?'

অলস ভঙ্গিতে বার-এর দিকে ঘুরল লোকটা। 'নিশ্চয়। তবে ড্রিংকটা শেষ করার পরে।'

সাগর এক পা এগোল লোকটার দিকে। চোখ জ্বলছে বিপজ্জনকভাবে। 'এখুনি শেষ করো।'

সাগরের প্রচ্ছন্ন হুমকি চিনতে ভুল করল না ড্রাইভার। 'সি, সিনর,' যন্ত্রচালিত কণ্ঠে বলল সে। এক ঢোকে গিলে ফেলল গ্লাসের বাকি তরলটুকু, সাগরকে নিয়ে দ্রুত বেরিয়ে এল ক্যাণ্টিনা থেকে। উঠে পড়ল ট্যাক্সিতে। দ্রুত এবং দক্ষতার সঙ্গে গাড়ি চালাল সে। পনেরো মিনিটের মধ্যে পৌঁছে গেল হোটেলে।

প্যালেসিও ডেল মারেতে সকালের চেয়েও ভিড় বেড়েছে। ট্যুরিস্টরা ছবি তুলছে আর উত্তেজিত ভঙ্গিতে কথা বলছে *'লা কাবানা ডি মুয়ের্তে'* নিয়ে।

সাগর ড্রাইভারের ভাড়া মিটিয়ে দিল। কয়েক লাফে পার হলো সিঁড়ি, চলল বারান্দা দিয়ে, ঢুকল লবিতে। ম্যানেজার ডাভিলাকে দেখল ডেস্কের পেছনে। সে একদল ট্যুরিস্টকে রক্তাক্ত রাতটার ঘটনা রসিয়ে বর্ণনা করছে। ছোট দলটা হাঁ করে শুনছে তার কথা।

ভিড় ঠেলে সামনে এগিয়ে এল সাগর, ডাভিলার মনোযোগ আকর্ষণ করল। 'মিসেস অ্যাডামসের রুমে একটা ফোন করেন তো।'

মনোযোগী শ্রোতাদের কাছ থেকে বিরস বদনে বিরতি নিতে হলো ম্যানেজারকে। ফোন করল সুহিতার রুমে। বেশ কয়েকবার রিং করল সে। শেষে সাগরের দিকে ফিরে ক্ষমাপ্রার্থনার ভঙ্গিতে শ্রাগ করল।

'সিনোরা অ্যাডামস ফোন ধরছেন না।'

'ওর তো ঘরে থাকার কথা,' বলল সাগর। 'ওর নৌকা-ভ্রমণ শেষ হয়েছে কখন?'

'দুপুরের দিকে।'

'মিসেস অ্যাডামসের সঙ্গে তারপর আর দেখা হয়েছে আপনার?'

'আ-আমার ঠিক মনে নেই।'

'মনে করার চেষ্টা করুন।' ডেস্কে ঝুঁকল সাগর, অগ্নিদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ম্যানেজারের দিকে।

নার্ভাস ভঙ্গিতে ঠোঁট কামড়াল ডাভিলা। 'ও, হ্যাঁ, এখন মনে পড়েছে। উনি ডেস্কে এসে জানতে চেয়েছিলেন তাঁর জন্য কোনও মেসেজ আছে কিনা। আমি তাঁকে বলি কোনও মেসেজ নেই। তারপর তিনি নিজের ঘরে চলে যান।'

'তারপর কি সে ঘর থেকে বেরিয়েছে?'

'আমি তা বলতে পারব না। আজ সারাটা দিন এমন ব্যস্ততার মধ্যে ছিলাম, সিনর। লোকজন আসছে, যাচ্ছে...বুঝতেই পারছেন।'

'হুঁ, বুঝতে পারছি,' বলল সাগর। ডেস্ক ছেড়ে বেরিয়ে এল ও, হাঁটা দিল লবিতে।

সুহিতা গেল কোথায়? ভাবছে সাগর। ব্যস্ত বার এবং ডাইনিং-রুমে চোখ বুলাল, সবগুলো মুখ পরখ করল। সুহিতা কোথাও নেই।

সাগর সৈকতে যাবার কথা নয় সুহিতার। শেষ বিকেল সূর্যস্নানের জন্য উপযুক্ত সময় নয়। তবু যদি গিয়ে থাকে...ভবন

থেকে ছুটে বেরিয়ে এল সাগর, অর্ধচন্দ্রাকৃতির সৈকত ধরে ছুটল। সৈকতে, পানির ধারে যারা বসে আছে তাদের মধ্যে সুহিতা নেই।

ব্যাপারটা ভাল ঠেকছে না সাগরের। সুহিতা জানে সাগর তাকে খুঁজবে। ও যেখানে খুশি যাক, সাগরকে একটা চিরকুট অন্তত লিখে রেখে যেতে পারত। কোনও একটা সমস্যা হয়েছে নিশ্চয়।

সৈকতে দাঁড়িয়ে চিন্তা করল সাগর কী ঘটতে পারে। হয়তো লিসা কিছু জানে। নিজের কাবানায় চলল ও। কাবানার জানালা-দরজা বন্ধ। সাগর দরজায় আঙুলের গাঁট দিয়ে শব্দ করল। অনেকক্ষণ পরে দরজা খুলল লিসা। চাউনি স্থির নয়, মাতালের মত টলছে। মদের গন্ধ আসছে লিসার মুখ থেকে।

'তোমাকে দেখে প্রীত হলাম,' মশকরা লিসার কণ্ঠে।

সাগর ওকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে ঘরে ঢুকল। অন্ধকার ঘর। বাতাসে বাসি একটা গন্ধ। সাগর জানালার পর্দা টেনে দিল, ঘরে ঢুকল বিকেলের রোদ।

'সুহিতাকে দেখেছ?' জিজ্ঞেস করল ও।

'তোমার প্রেমিকা? না। ওকে কেন দেখব আমি?'

'এখন ঠাট্টার সময় নয়, লিসা। যা জানতে চেয়েছি সরাসরি জবাব দাও।'

'আজকাল তো কোন কিছুর জন্যই তোমার সময় হয় না, হয় কি, লাভার বয়?'

লিসা নিশ্চয় কিছু জানে। ওর চোখই বলে দিচ্ছে সে কথা। 'আবার জিজ্ঞেস করছি, সুহিতাকে দেখেছ? জানো ও কোথায় আছে?'

'ওকে নিজেই খুঁজে নাও না, লাভার বয়। ওই রকম গনগনে একটা মাগীকে তোমার তো খুঁজে পেতে–'

ওকে মারল সাগর। গালে প্রচণ্ড থাপ্পরটা পিস্তলের গুলির মত শব্দ তুলল টাশ্‌শ্‌। চড় খেয়ে ছিটকে গেল লিসা। লাল হয়ে গেছে

গাল। হাত দিয়ে ঢাকল গাল। চোখ ফেটে বেরিয়ে এল অশ্রু।

'এখন বলো,' হুকুম করল সাগর।

ফুঁপিয়ে উঠে ডানে বামে মাথা নাড়ল লিসা। সাগরকে ভীতিকর ভঙ্গিতে এগোতে দেখেই মুখ খুলল।

'আমি দেখেছি ওকে। ও...ও চলে গেছে।'

'চলে গেছে? কোথায় গেছে?'

'জানি না। ওকে শুধু একটা মেসেজ দিয়েছি। তারপর ও চলে গেল।'

'কীসের মেসেজ?' প্রশ্ন করল সাগর। বহু কষ্টে চিৎকার করা থেকে দমন করেছে নিজেকে।

'এক মহিলা এসেছিল। আমাকে বলল আমি যেন সুহিতাকে বলি তুমি ওকে তোমার সঙ্গে দেখা করতে বলেছ।'

'কোন্ মহিলা?'

লিসা সাগরের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে নিল। গলার স্বর নরম শোনাল। 'আমি মহিলার নাম জানি না। খুব সুন্দরী। লম্বা, সবুজ চোখ, কালো চুল। কপালে কাটা একটা দাগ আছে।'

দাঁতে দাঁত ঘষল সাগর। মার্সিয়া লুরা ওদের আত্মরক্ষার দুর্বল দিকটা খুঁজে পেয়েছে—লিসা। খুব নরম গলায় সাগর জানতে চাইল, 'সুহিতার সঙ্গে আমার কোথায় দেখা হবার কথা?'

'আমার মনে পড়ছে না।'

'লিসা, মনে করার চেষ্টা করো নয়তো লাথি মেরে তোমার মুখের জিওগ্রাফি পাল্টে দেব।'

'কী এক জিপসির কথা বলছিল। জিপসির কেবিন।'

আঁতকে উঠল সাগর। সুহিতা যদি সত্যি ওই পাহাড়ে গিয়ে থাকে সন্ধ্যার আগে কিছুতেই ফিরতে পারবে না। ওয়্যারউলফের সহজ শিকারে পরিণত হবে ও, ওকে সাহায্য করার কেউ নেই ওখানে।

'তুমি ওকে এ কথা বললে আর ও সব বিশ্বাস করে ফেলল?'

অবিশ্বাস সাগরের কণ্ঠে।

'আ-আমি ওকে তোমার একটা জিনিস দিয়েছি। তাই ও বিশ্বাস করেছে আমার কথা।'

'কী জিনিস?'

'তুমি রূপোর যে জিনিসটা সবসময় সঙ্গে রাখ। বুলেটের মত দেখতে।'

পকেটে হাত ঢোকাল সাগর। গত ক'দিন ধরে নানান ঘটনা এত দ্রুত ঘটে চলেছে, সে ভুলেই গেছিল সিলভার বুলেটের কথা। চরকির মত দরজার দিকে ঘুরল সাগর। পা বাড়াল। ধাক্কা মেরে খুলে ফেলল। তারপর পেছন ফিরল।

'আমি বাইরে যাচ্ছি, লুসি। জানি না কতক্ষণ বা কদিনের জন্য যাচ্ছি। তবে এখানে এসে তোমার চেহারা আর দেখতে চাই না আমি।' বাইরে পা বাড়াল সাগর। জবাবের অপেক্ষা না করে পেছনে ঠাস করে বন্ধ করে দিল দরজা।

ও যে ট্যাক্সি চড়ে এসেছে চলে গেছে সেটা। তবে হোটেলের সামনে থেকে আরেকটা ট্যাক্সি ঘুরে শহর অভিমুখে চলেছে। সাগর দৌড় দিল ট্যাক্সিটি লক্ষ্য করে।

'ট্যাক্সি! অ্যাই, ট্যাক্সি!'

যাত্রী বোঝাই ট্যাক্সির ড্রাইভার ফিরেও তাকাল না সাগরের দিকে। সাগর রাস্তায় দাঁড়িয়ে গালাগাল দিতে লাগল অপসৃয়মাণ ট্যাক্সি ড্রাইভারকে উদ্দেশ্য করে।

'সিনর?'

পেছনের কণ্ঠস্বরে চমকে গেল সাগর। ঘুরে দেখল দাঁড়িয়ে আছে লুই জ্যারেট। চোরের মত মুখ করে জ্যাকেটের জিপার ধরে টানাটানি করছে।

'লুই!'

'আমি আপনার খোঁজ করছিলাম, সিনর। আপনাকে আজ ওভাবে শহরে ফেলে রেখে আসা আমার মোটেই উচিত হয়নি।

আমি খুবই লজ্জিত।'

'লজ্জা পেতে হবে না,' বলল সাগর। 'তোমাকে এ মুহূর্তে আমার খুব প্রয়োজন ছিল। ওরা কৌশল খাটিয়ে সুহিতাকে জিপসির কেবিনে নিয়ে গেছে। আমার এখন ওখানে যাওয়া দরকার।'

'শোকাতুর দেখাল লুইয়ের চেহারা।'

'কী হলো?'

'জিপসি, সিনর। ফিলিনা। *তল্লা এস্তা মুয়ের্তে।'*

'মানে?'

'মানে ফিলিনা মারা গেছে, সিনর।' মাথা নাড়িয়ে বলা শুরু করল লুই। 'আজ সকালে জিপসি এবং রাস্তার লোকদের মধ্যে একটা কথা ছড়িয়ে দেয়া হয়। ফিলিনা মারা গেছে এবং কেউ যদি আপনাদেরকে কোন রকম সাহায্য করার চেষ্টা করে তা হলে তারও পরিণতি হবে ফিলিনার মত। আর সবাই জানে লোবোম্বরের প্রতিহিংসা কত ভয়ানক!'

'এ জন্যই গহনার দোকানের সেলসম্যানটা আজ সকালে আমার সঙ্গে অমন ব্যবহার করেছে।'

মাথা ঝাঁকাল লুই।

'আর একই কারণে তুমি মাঝ রাস্তায় আমাকে ফেলে রেখে এসেছ।'

'জ্বী, কিন্তু এজন্য আমি এখন শরমে মরে যাচ্ছি। আমার ট্যাক্সি এখন আপনার সেবায় নিয়োজিত।'

'তা হলে চলো। তোমার গাধা ভাড়া দেয়া কাজিনের কাছে আগে যাব।'

'মাচো গুস্তো, সিনর, মুচো গুস্তো?'

সগর্জনে হোটেল কম্পাউণ্ড ছেড়ে রাজপথে উঠে এল প্লিমাউথ। লুই দক্ষ হাতে ড্রাইভ করছে। পাহাড়ের পাদদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত উঁচু-নিচু রাস্তায় আসতেই নাচ শুরু করে দিল গাড়ি।

ঝাঁকির চোটে জান কোরবান। সাগরের মনে হচ্ছিল গাড়ির সঙ্গে ওর শরীরও কয়েকখণ্ড হয়ে ছিটকে যাবে রাস্তায়। তবে লুই অ্যাকসিলেরেটর থেকে একবারও পা সরাল না। গুইলেরমোর বাড়ির সামনে আসতেই লাফ মেরে গাড়ি থেকে নামল সাগর, ছুটল কুটিরে। ইঞ্জিন বন্ধ করে লুইও চলল পেছন পেছন।

সাগর দরজায় টোকা দিল। কিন্তু কোনও সাড়া মিলল না।

'গেল কোথায় লোকটা?' অবাক সাগর।

সামনে বাড়ল লুই। 'আমি দেখছি, সিনর,' সে দরজায় মুখ রেখে ষাঁড়ের মত গর্জন ছাড়ল। 'গুইলেরমো? *নোম্বর ডি ডিয়াস, আব্‌র লা পোর্টা!'*

একটু পরে ভারী কিছু সরানোর শব্দ এল ভেতর থেকে। ক্যাঁআআচ আওয়াজে অল্প খুলল কপাট। ভাল চোখটা মেলে উঁকি দিল গুইলেরমো।

'কী চাই?'

'ওই মহিলা কি এখানে এসেছিল?' জিজ্ঞেস করল সাগর। 'গতবার যে মহিলা আমার সঙ্গে এসেছিল।'

'এসেছিল।'

'কখন?' চাবুকের মত আছড়ে পড়ল সাগরের প্রশ্ন।

'দুই-তিন ঘণ্টা আগে।'

'সে তোমাকে কী বলল?'

'কিছু বলেনি। আমি দরজা খুলিনি।'

'কেন? দরজা খোলোনি কেন?'

'পাহাড়ে শয়তান আর মৃত্যু বাস করে। আমি ঘর থেকে বেরিয়ে বেঘোরে প্রাণটা হারাতে চাইনি।'

'সে কোথায় গেছে?'

'আমার একটা গাধা নিয়ে তাকে ট্রেইল ধরে যেতে দেখেছি।'

'আমাকে একটা গাধা ধার দাও,' বলল সাগর। 'জলদি। ওর কাছে যাব।'

'গেলেও লাভ হবে না। ওকে কোনও সাহায্য করতে পারবেন না।'

'পারব কি পারব না সেটা আমার ব্যাপার। তুমি গাধা দেবে কি না বলো।'

'বাড়ির পেছনে যান, সিনর। কয়েকটা গাধা আছে। পছন্দমত একটা বেছে নিন। তবে আপনার এবং আপনার বান্ধবীর গাধা ভাড়া হিসেবে দশ ডলার দিতে হবে।'

তেতেমেতে কিছু বলতে গিয়েও নিজেকে সংবরণ করল সাগর। ওয়ালেট খুলে দশ ডলারের একটা নোট বের করে দরজার ফাঁকে ঢুকিয়ে দিল। পা বাড়াল কুটিরের পেছনে।

খোঁয়াড়ে গাটাগোট্টা একটা গাধা বেছে নিয়ে ওটাকে সঙ্গে করে চলে এল কুটিরের সামনে। লুই জ্যারেট দাঁড়িয়ে আছে প্লিমাউথের পাশে।

'আপনার সঙ্গে যেতে পারলে ভাল হত, সিনর,' বলল সে। 'কিন্তু আমার একটা বউ এবং মা আছে। আমি ছাড়া ওদের কেউ নেই। তা ছাড়া আমি খুব একটা সাহসী মানুষও নই।'

'ঠিক আছে, লুই। এখন থেকে এটা একান্তই আমার নিজের লড়াই। তোমার ভাড়া কত হয়েছে বলো?'

'কোনও ভাড়া দিতে হবে না, সিনর।'

'ধন্যবাদ,' সাগর উঠে পড়ল গাধার পিঠে। চলল ট্রেইল ধরে।

'বুয়েনা সুয়ের্তে, সিনর,' পেছন থেকে হাঁক ছাড়ল ড্রাইভার।

'ভায়া কন ডিয়াস'। তারপর ইংরেজিতে বলল, 'গুড লাক।'

এবারে ভাগ্যের চেয়েও বেশি কিছু দরকার হবে আমার, ভাবল সাগর। গাধাটাকে নিয়ে এগোল পাহাড়ের দিকে। লক্ষ করল দ্রুত ঘনিয়ে আসছে আঁধার।

ত্রিশ

প্রথমে ব্যথাটা ফিরে এল। গলায় ব্যথা। জ্ঞান ফিরে আসার পূর্ব মুহূর্তে সুহিতার মনে হচ্ছিল সে ফিরে গেছে ছেলেবেলায়। হাসপাতালের সাদা বিছানায় শুয়ে আছে। ডাক্তার মাত্র ওর টনসিল অপারেশন করেছেন। এখুনি চোখ মেলে চাইবে সুহিতা, দেখতে পাবে মা এবং বাবাকে। ওরা আবার ওকে ইচ্ছেমত আইসক্রিম খেতে দেবেন। ব্যথাটাও চলে যাবে।

হাত বাড়িয়ে ব্যথার জায়গাটা স্পর্শ করতে চাইল সুহিতা। কিন্তু নাড়াতে পারল না হাত। ফুসফুস বাতাস টানছে। তবে হাসপাতালের ওষুধের গন্ধ মাখা বাতাস নাকে ঢুকছে না। পিঠের নীচে নরম বিছানা কই? কেমন শক্ত শক্ত লাগছে।

জোর করে চোখ মেলল সুহিতা। তার দিকে তার প্রিয় কোনও মুখ তাকিয়ে নেই। এক মুহূর্ত সময় লাগল কোথায় আছে বুঝে উঠতে। জিপসি বুড়ির কুটির। চুল্লির আগুন ভৌতিক ছায়া ফেলছে ঘর জুড়ে। পিঠ ছাড়া চেয়ারটিতে বসে আছে সুহিতা। গোড়ালি চেয়ারের পায়ার সঙ্গে বাঁধা, হাতজোড়া শরীরের পেছনে শক্ত করে বেঁধে রেখেছে কেউ। পিঠে যে শক্ত জিনিসটা অনুভূত হচ্ছিল তা কুটিরের ককর্শ দেয়াল।

মাথা ঘোরাল সুহিতা। নড়াচড়ার সময় ব্যথা লাগল গলায়। ওর পাশে পুরানো কম্বলের স্তূপ। এখানে বসে ফিলিনা সাগর এবং ওর সঙ্গে কথা বলছিল। কম্বলের পাশে ছিন্নভিন্ন একটা জিনিস দেখতে পেল সুহিতা। একটা থাবা। হাতের তালু

ওল্টানো। দেখে বোঝা যায় খণ্ডিত হাতটা মানুষের।

শিউরে উঠে অন্যদিকে তাকাল সুহিতা। খোলা দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছে বাইরে ঘনাচ্ছে সাঁঝের আঁধার, কেউ এসে দাঁড়াল দোরগোড়ায়। লম্বা, হালকা-পাতলা একটা কাঠামো, কালো চুলের এক নারী।

'মার্সিয়া!' আঁতকে উঠল সুহিতা।

'আমাকে তোমার মনে আছে দেখছি। জেনে খুশি হলাম। সকাল হবার আগ পর্যন্ত আরও অনেক কিছু তোমাকে মনে পড়িয়ে দেব।'

'মানে?'

'তোমাকে আমি ব্যথা দেব, সুহিতা। তোমাকে আমি ভয়াবহ শারীরিক কষ্ট দেব।'

অন্ধকারে চোখ কুঁচকে তাকাল সুহিতা, মহিলাকে ভাল মত ঠাহর করার চেষ্টা করছে। 'কেন? কেন তুমি এসব করছ? কেন তুমি আমার পিছু নিয়েছ? ড্রাগোতে আমার স্বামীকে তুমি আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছ। আর কী চাও তুমি?' থেমে গেল ও, গলা ব্যথা করছে।

ওর দিকে এক কদম বাড়ল সুহিতা। ওদের মাঝখানে জ্বলছে চুল্লির আগুন। লম্বা মহিলা হাঁটু গেড়ে বসল যাতে আলোয় পরিষ্কার দেখা যায় চেহারা। 'জানতে চাও কেন? তা হলে দ্যাখো!'

একটা হাত তুলল সে কপালে। কপাল থেকে মাথার মাঝ পর্যন্ত চলে যাওয়া শুকনো, সাদা কাটা দাগটাতে হাত বুলাল। 'এ জন্যে। এই কাটা দাগটা আমাকে মনে করিয়ে দেয় সে রাতের কথা যে রাতে তুমি আমাকে গুলি করেছিলে। কয়েকটা মাস যে ভয়ঙ্কর কষ্ট আমি সয়েছি তার কথা জীবনেও ভুলব না। ওই ক'টা মাস, সুহিতা, আমি তোমার কথা ছাড়া আর কারও কথা ভাবিনি। একটি কারণে শুধু বেঁচে আছি এখনও—আমি যে যন্ত্রণা সয়েছি

সেরকম ব্যথা আমি তোমাকে ফিরিয়ে দেব বলে। তোমার মরণ দেখব বলে।'

'আমি তো তোমাকে গুলি করিনি,' ফিসফিস করল সুহিতা। 'আমি শুধু একটা নেকড়েকে গুলি করেছি। জানতাম না ওটা তুমি।'

'মিথ্যাবাদী!' গর্জে উঠল মার্সিয়া। 'ট্রিগার টেপার আগে তোমাকে আমি আমার নাম উচ্চারণ করতে শুনেছি। হ্যাঁ, অবশ্যই তুমি জানতে।'

কথা সত্য। বহুদিন আগের ওই রাতে কালো চকচকে যে মাদী নেকড়েটার মাথায় সিলভার বুলেট ছুঁড়েছিল সুহিতা, জানত ওটা আসলে মার্সিয়া লুরা।

'চিন্তাভাবনা করার প্রচুর সময় আমি পেয়েছি,' বলে চলল মার্সিয়া। 'প্ল্যান করতাম কীভাবে তোমাকে হত্যা করা যায়। কিন্তু আমার সবগুলো হত্যা প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। তবে তোমাকে এভাবে বাগে পাব কল্পনাও করিনি। এখন তোমাকে আমি রসিয়ে রসিয়ে খুন করব।'

মার্সিয়া চুল্লির দিকে হাত বাড়াল। চুল্লি থেকে বের করে আনল লম্বা হাতলের একটি প্লায়ার্স। জ্বলন্ত কয়লার মধ্যে এতক্ষণ ওটাকে উত্তপ্ত করা হচ্ছিল। লাল হয়ে আছে প্লায়ার্সের মাথা।

'মধ্য যুগে,' বলল মার্সিয়া, 'ডাইনি এবং ওয়্যারউলফ সন্দেহে মানুষকে নানাভাবে অত্যাচার করে হত্যা করা হত।' প্লায়ার্সের টেপ দিয়ে আটকানো হাতলে আদর করে হাত বুলাল ও। 'এর মধ্যে একটি হলো আগুনে পোড়া সাঁড়াশি দিয়ে খামচে ভিক্টিমের গা থেকে মাংস তুলে নেয়া। একেকবারে একটুকরো করে মাংস। তাতে দীর্ঘ যন্ত্রণা সয়ে মরত হতভাগ্যরা। অনেকক্ষণ সময় লাগত জীবন প্রদীপ নিভে যেতে। দীর্ঘক্ষণ তারা অমানুষিক নির্যাতন সহ্য করত।' প্লায়ার্সের টকটকে লাল মাথায় সবুজ চোখ রাখল মার্সিয়া। 'আজ রাতে আমিও তোমাকে সেভাবে তিলে তিলে

যন্ত্রণা দিয়ে মারব।'

সুহিতা উত্তপ্ত প্লায়ার্স এবং মহিলার ওপর থেকে সরিয়ে নিল চোখ। তাকাল খোলা দরজায়। বাইরে সাঁঝের আলো প্রায় নিভে এসেছে, কালো হয়ে আসছে দিগন্ত।

মার্সিয়া ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে চাইল। 'তুমি তোমার বন্ধু সাগর কিংবা অন্য কারও কাছ থেকে যদি সাহায্য পাবার আশা করে থাক তো ভুল করছ। সে যদি জেনেও যায় তুমি কোথায় আছ এবং বোকার মত এখানে চলে আসে, আমাদেরকে পাবে না। এ কুটিরে আসার রাস্তা একটাই। আর তোমার বন্ধুর জন্য রাস্তায় একজন অপেক্ষা করছে। যাকে তুমি এবং আমি দুজনেই খুব ভালভাবে চিনি।'

'রায়হান!' গলা চিরে আর্তনাদ বেরিয়ে এল সুহিতার। হেসে উঠল মার্সিয়া। জয়ের উল্লাসের হাসি। 'হ্যাঁ, রায়হান। তোমার সাবেক স্বামী। তবে সে এখন আর তোমার স্বামী নেই। সে এখন শুধুই আমার। আমার নিজস্ব সম্পত্তি। রাস্তা দিয়ে কেউ আসার চেষ্টা করলে তাকে বাধা দেবে রায়হান।'

ধবধবে ফর্সা শরীরের, ভরাট যৌবনের মহিলার দিকে তাকিয়ে রইল সুহিতা। গলা দিয়ে যেন বমির মত উগরে আসছে ভয়। মার্সিয়া প্লায়ার্স জোড়া আবার আগুনের মধ্যে রেখেছিল। এবার হাতল ধরে বের করে নিয়ে এল। চিমটার মাথাটা লাল-কমলা রঙের। ভীতিকরভাবে জ্বলজ্বল করছে।

মার্সিয়া একবার পেছন ফিরে দেখল। তারপর চুল্লি ঘুরে এগিয়ে এল সুহিতার কাছে। চিমটার হাতল শক্ত করে ধরে আছে, জ্বলন্ত এবং উত্তপ্ত মাথাটা আড়াআড়িভাবে এগিয়ে নিয়ে আসতে লাগল সুহিতার মুখ লক্ষ্য করে।

একত্রিশ

সূর্যের লাল শেষ টুকরোটা পিছলে ডুব দিল দিগন্তরেখায়, পাহাড়ি রাস্তায় ঝুপ করে নামল রাত। সঙ্গে ফ্ল্যাশলাইট আনেনি বলে নিজের ওপর রাগ হচ্ছে সাগর চৌধুরীর। রাস্তা ধরে এখনও চলা যাবে বটে কিন্তু দু'ধারের অন্ধকারে কী ঘাপটি মেরে আছে কে জানে। অবশ্য গাধাটার কাছে রাত-দিনের কোনও তফাত নেই। সে ধীরে সুস্থে ঢাল বেয়ে ওপরে উঠছে, সাগর পেটে লাথি কষালে বেড়ে যাচ্ছে গতি।

জিপসির কেবিনে পৌঁছার পরে কী দেখবে তা নিয়ে ভাবতে চায় না সাগর। বুড়ি মারা গেছে, লুই বলেছে ওকে। তবে ওয়্যারউলফরা বৃদ্ধাকে হত্যা করেছে কিনা বলেনি।

কিন্তু উদ্দেশ্যটা পরিষ্কার। সুহিতা কুটিরে গিয়ে কী দেখবে? ও কি আতঙ্কিত হয়ে উঠবে? আশা করল সুহিতা রাতের বেলা কুটিরের মধ্যেই থাকবে, সাগর না পৌঁছা পর্যন্ত বেরুনোর চেষ্টা করবে না।

অন্ধকারে কিছু ভাল করে ঠাহর হয় না। সাগর বুঝতে পারছে না কতদূর এসেছে। বিকেলের পর থেকে সময় এবং দূরত্ব নিয়ে মাথা ঘামায়নি ও। শুধু সূর্যটা কখন ডুবে যায় সে আশঙ্কায় ছিল। আঁধার নামার ঘণ্টা দুই আগে থেকে রাস্তায় চলছে সাগর। এতক্ষণে বুড়ির কুটিরের কাছাকাছি চলে আসার কথা। প্রার্থনা করল কেবিনে গিয়ে যেন দেখে সুহিতা বহাল তবিয়তে আছে। ওর কোনও ক্ষতি হয়নি। এক সঙ্গে থাকলে আজ রাতটা টিকে

থাকার একটা সম্ভাবনা আছে। কিন্তু একা একা...

হঠাৎ একটা ঝাঁকি খেল সাগর। পাহাড়ি রাস্তায় এবং ঝোপঝাড়ে সূক্ষ্ম একটি পরিবর্তন চোখে পড়েছে ওর। অন্ধকার ক্রমে ফিকে হতে শুরু করেছে শীতল, ফ্যাকাসে একটা আলোর ছোঁয়ায়। গাছের ফাঁক দিয়ে ওপরে তাকাল সাগর। পাহাড় চুড়োয় চাঁদ উঠছে। পূর্ণিমা চাঁদ।

জোছনায় পথ চলা সহজতর হলো। কিন্তু পূর্ণিমার চাঁদ সাগরকে রাতের আসন্ন আতঙ্কের কথা মনে করিয়ে দিল।

একটা ঝাঁকি খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল গাধা যেন কেউ ওর পিঠে বাঁধা রশি ধরে টান মেরেছে। লম্বা কান জোড়া খাড়া হলো কিছু শোনার প্রত্যাশায়, বিস্ফারিত নাকের পাটা, বাতাসের গন্ধ শুঁকছে। সাগর ওকে আগে বাড়তে বলল কিন্তু ভীত গর্দভ আড়ষ্ট ভঙ্গিতে পেছাল কদম।

'চলরে, গাধা, সামনে চল,' অনুনয় করল সাগর। 'পেছনে যাচ্ছিস কেন ভাইটি আমার?'

'ভাই' ডাক শুনেও মন গলল না গাধার, এমনকী পশ্চাৎদেশে সাগরের শক্ত হাতের থাপ্পর খেয়েও সামনে বাড়ল না। শিউরে উঠল জানোয়ার, ভয়ে বড় বড় হয়ে গেছে চোখ।

'কী হলো রে, ব্যাটা? নড়ছিস না কেন?'

রাস্তার মাথায় কী যেন নড়ে উঠল। একটা ছায়া এগিয়ে আসছে ওদের দিকে, আলোয় চেহারা দেখা গেল ওটার। থেমে গেল ছায়া। প্রকাণ্ড একটা নেকড়ে।

থরথর করে কেঁপে উঠল গাধা। পিছিয়ে আসতে গিয়ে নুড়িতে পিছলে গেল পা, দড়াম করে পড়ে গেল মাটিতে। গাধা মাটিতে পড়ার আগেই লাফ মেরে গাধার পিঠ থেকে নেমে এসেছে সাগর। গাধাটা তাল সামলাতে না পেরে ডিগবাজি খেয়ে গড়িয়ে পড়ে গেল ঢাল থেকে নীচে, খাদের মধ্যে। সাগর এখন রাস্তায় একা। সামনে ওই নেকড়ে।

অনেকক্ষণ মানুষ এবং জানোয়ার পরস্পরের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। নড়ে উঠল নেকড়ে, চকচকে চামড়ার নীচে কিলবিল করল পেশী। মৃদু গর্জন বেরিয়ে এল ওটার গলা দিয়ে, চাঁদের আলো পড়ে ঝিলিক দিল সাদা দাঁত।

ছুরির জন্য হাত বাড়াল সাগর। কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। খাপে হাত পৌঁছানোর আগেই লাফ মারল নেকড়ে। শূন্যে উড়াল দিয়েছে জানোয়ার, সাগর দিশেহারার মত ডাইভ দিয়ে পড়ল শক্ত জমিনে। ওর গায়ের ওপর দিয়ে হুশ করে উড়ে গেল শক্তিশালী দেহটা। হাঁচড়েপাঁচড়ে উঠে বসেছে সাগর, ততক্ষণে মাটিতে আঘাত করেছে নেকড়ের থাবা। বিদ্যুৎগতিতে ঘুরল ওটা সাগরের দিকে।

চামড়ার খাপ খুলে ছুরিটা হাতে নিল সাগর। চাঁদের আলোয় চকচক করছে রূপোর ফলা। নেকড়ের ঘোলাটে চোখ দেখছে ছুরি, লক্ষ্য করছে সাগর ছুরি ধরা হাত দোলাচ্ছে বামে-ডানে। আবার গর্জন ছাড়ল নেকড়ে। এবারে গভীর এবং অশুভ।

'তুমি এ জিনিসটা চেন, তাই না?' বলল সাগর। 'জানো এটা তোমার কী দশা করতে পারে। এসো, পারলে এখন আমাকে ধরো।'

লাফ মারল নেকেড়ে। ছুরি বাগিয়ে ধরল সাগর। জানোয়ারটা ছুরি থেকে কয়েক ইঞ্চি সামনে এসে ব্রেক কষল। কোপ মারল সাগর। ঝট করে নেকড়ে সরে যেতে মিস্ হলো টার্গেট।

সাগরকে বিন্দুমাত্র সতর্ক হবার সুযোগ না দিয়ে আবার লাফাল নেকড়ে। ডান দিকে হেলে গেল সাগর, অল্পের জন্য ধারাল দাঁতের কামড় লাগল না গায়ে। তবে ছুরি দিয়ে জানোয়ারটাকে আঘাত করার সুযোগও পেল না। মাটিতে ল্যাণ্ড করল নেকড়ে, চোখের পলকে ঘুরল, সামান্য বিরতি না দিয়েই আবার দিল লাফ।

রাস্তা থেকে সরে যেতে উন্মাদের মত ডাইভ দিল সাগর।

কাঁটাঝোপের আঘাতে জ্যাকেটের আস্তিন গেল ছিঁড়ে। তবে চামড়া ছিলে যায়নি বলে রক্ত বেরুল না।

এবারও ব্যর্থ হয়ে দ্বিধায় পড়ে গেল নেকড়ে। আবার হামলার সুযোগ খুঁজছে। সাগরের পাশে বৃত্তাকারে ঘুরতে লাগল। রূপোর ফলার ওপর থেকে একবারও সরায়নি চোখ। সাগর নেকড়ের গলা লক্ষ্য করে বাগিয়ে ধরে রইল ছুরি।

কতক্ষণ ধরে লড়াই চলছে হিসেব নেই সাগরের। তবে যতবার হামলা চালাল নেকড়ে, প্রতিবারই ওটার থাবা এবং দাঁত থেকে কৌশলে নিজেকে রক্ষা করল ও। এখন আর সরাসরি হামলা চালাচ্ছে না নেকড়ে। সাগর এখন পর্যন্ত জানোয়ারটার গায়ে ছুরি বসানোর সুযোগ পায়নি।

লড়াই চলছে, নেকড়ের শক্তি এবং তেজ ক্রমে হ্রাস পাচ্ছে। সাগরের নিঃশ্বাস হাঁপানিতে পরিণত হয়েছে, পাথুরে মাটির গায়ে বারবার আছড়ে পড়ার কারণে ক্ষত-বিক্ষত শরীর। যতবার হামলা চালাল নেকড়ে, অল্পের জন্য রক্ষা পেল সাগর। মুখের ওপর ওটার গরম নিঃশ্বাসও টের পেয়েছে সে।

ও জানে দ্রুত এ লড়াই খতম করা দরকার। কারণ ওর শক্তিও ফুরিয়ে আসছে।

নেকড়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে সাগর, হঠাৎ একটা বুদ্ধি এল মাথায়। ও একদিকে লাফ দেয়ার ভান করে লাফ মেরে উঠে পড়বে জানোয়ারটার কাঁধে, তারপর ঘাড়ে আমূল বসিয়ে দেবে ছুরি। কিন্তু যদি ব্যর্থ হয়...ব্যর্থ হোক বা সফল এ লড়াইয়ের অবসান ঘটা দরকার।

সাগর বামে লাফ দেয়ার ভান করল। কিন্তু ওর পা গিয়ে পড়ল টেনিস বল সাইজের একটি আলগা পাথরে, গোড়ালি সাংঘাতিক মচকে গেল। ব্যথায় আগুন ধরে গেল শরীরে। ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা করেও পারল না সাগর। দড়াম করে পড়ে গেল মাটিতে। ডান হাতটা আছড়ে পড়ল ধারাল একখণ্ড পাথরে,

আঙুল ঝাঁকি খেয়ে ফাঁক হলো, ছুরিটা ছিটকে গেল মুঠো থেকে।

সাগর অস্ত্রটা তুলতে যাবার আগেই নেকড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল গায়ের ওপর। ভারী থাবা ওকে যেন মাটির সঙ্গে গেঁথে ফেলল। রোমশ নাক আর খুনে দাঁতগুলো ঠিক ওর মুখের ওপর। নেকড়ের চোখে জয়ের উৎকট উল্লাস... সেই সঙ্গে আরও কিছু।

নড়াচড়া করতে অক্ষম সাগর অপেক্ষা করছে শেষ যন্ত্রণাদায়ক অভিজ্ঞতাটির জন্য। জানোয়ারটার চোখে চোখ রাখল ও। হলুদ চোখের তারায় কী যেন একটা আবেগ খেলা করছে নেকড়ের। কষ্ট?

কে জানে কেন ইতস্তত করছে নেকড়ে। গলাটা এক কামড়ে ছিঁড়ে ফেলার বদলে বসে আছে সাগরের বুকের ওপর। তারপর সাগর টের পেল ওর কাঁধের ভার যেন কিছুটা লাঘব হয়েছে। ডান হাতটা নাড়াতে পারছে। কাঁচা রাস্তায় ওর আঙুল ছুরি খুঁজল। নাগালে পেয়ে গেল ছুরির বাঁকানো হাতল।

নেকড়ে আবার কাঁধে থাবা গেড়ে বসতে আগের ওজনটা ফের টের পেল সাগর। হাঁ হয়ে গেল চোয়াল, দাঁতগুলো এগিয়ে এল ওর গলা লক্ষ্য করে।

ডান হাত এবং কাঁধের সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে ছুরিটা ওপরে তুলল সাগর। রূপোর ফলা বসিয়ে দিল নেকড়ের প্রশস্ত বুকে। জানোয়ারটার প্রকাণ্ড মাথা ঝাঁকি খেয়ে হেলে গেল পেছনে, গলা চিরে বেরিয়ে এল যন্ত্রণাকাতর ধ্বনি। চিৎকারটা মানুষেরও না, পশুরও না। সম্মিলিত আর্তনাদ। গরম রক্ত গলগল করে বেরিয়ে এসে পড়ল সাগরের হাত এবং কব্জিতে, ভিজিয়ে দিল জ্যাকেট। সাগর নেকড়ের বুক থেকে ছুরিটা টান মেরে বের করে নিল। তবে আবার আঘাতের প্রয়োজন নেই। নেকড়ে ওর গায়ের ওপর থেকে গড়িয়ে গেল। টলতে টলতে কয়েক পা এগোল, তারপর পড়ে গেল মাটিতে।

উঠে বসল সাগর। ছুরি খাওয়া নেকড়ে মাথাটা তুলে ওর

দিকে তাকাল। তারপর ইঞ্চি ইঞ্চি করে শরীরটা টেনে নিয়ে আসতে লাগল ওর দিকে। রক্তাক্ত ছুরিটি মুঠোয় চেপে ধরল সাগর। কিন্তু নেকড়ের চাউনিতে লড়াইয়ের বাসনার চিহ্ন দেখতে না পেয়ে ঢিল পড়ল পেশীতে।

মাটিতে রক্তের লম্বা, টানা দাগ রেখে নেকড়েটা হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে সাগরের পাশে চলে এল। মস্ত মাথাটা তুলে ওর দিকে তাকাল। তারপর হলুদ চোখ থেকে স্তিমিত হয়ে এল জীবনের আলো, নেকড়ের মাথা ঢলে পড়ল সাগরের হাঁটুর কাছে। আর নড়ল না।

সাগর মৃত নেকড়ের রোমশ মাথায় হাত রাখল। 'বিদায়, বন্ধু।' নরম গলায় বলল, 'তুমিই জিততে পারতে।' ওর কথা রাতের বাতাস ছাড়া শুনল না কেউ।

মুখ বিকৃত করে খাড়া হলো সাগর। পরখ করল গোড়ালি। ফুলে গেছে। তবে হাঁটতে পারবে ও। ছেঁড়া জ্যাকেটের আস্তিনে ছুরির রক্ত মুছল সাগর। জ্যাকেট খুলে ঢেকে দিল নেকড়েকে তারপর খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলল জিপসির কুটিরে।

বত্রিশ

নরকের কোনও কীটের বিকট থাবার মত প্লায়ার্সের গনগনে চোয়াল এগিয়ে আসছে সুহিতা সুলতানার দিকে। মার্সিয়া এগোচ্ছে ধীর গতিতে, সুহিতার মুখের ওপর নজর। তার পেছনে দোরগোড়ার কালো আয়তক্ষেত্রটি ধীরে ধীরে আলোকিত হয়ে উঠছে। পাহাড়ের মাথায় ইঞ্চি ইঞ্চি করে উঠে আসছে পূর্ণিমার

চাঁদ। পেছন ফিরে তাকাল মার্সিয়া। তার চেহারায় একই সঙ্গে ফুটল ভয় এবং ঘৃণা।

গালে উত্তপ্ত ধাতবের গরম আভা এসে লাগছে, সুহিতা ঝট করে মাথাটা যতদূর সম্ভব সরিয়ে নিল। তার শরীর আড়ষ্ট, ভয়াবহ একটা ছ্যাঁকা খাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে। কিন্তু ছ্যাঁকাটা লাগল না। বদলে চিৎকার দিল মার্সিয়া। বিস্মিত দৃষ্টিতে মহিলার দিকে তাকাল সুহিতা। দেখল মার্সিয়ার শরীর ঝাঁকি খাচ্ছে, মোচড় খাচ্ছে। যেন অদৃশ্য একটা সুতো দিয়ে বেঁধে ওকে ইচ্ছেমত নাচানো হচ্ছে। মার্সিয়ার হাত থেকে ছিটকে গেল প্লায়ার্স, প্রচণ্ড যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল সে।

ভয়ার্ত চোখে সুহিতা দেখল মার্সিয়া পা মুচড়ে পড়ে গেছে কুটিরের মেঝেতে। ময়লার মধ্যে গড়াগড়ি খেতে খেতে ছিঁড়ে ফেলছে পরনের কাপড়। দরজা থেকে ভেসে আসা ফকফকা জোছনায় সাদা, নগ্ন শরীরটা দেখছে সুহিতা। অকস্মাৎ শরীরে পরিবর্তন ঘটতে শুরু করল। কুঁচকে গেল ধবধবে সাদা ত্বক, কর্কশ কালো লোম ফুটে বেরুতে লাগল। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো বিকৃত হয়ে যাচ্ছে। আকারগুলো মানুষের মত নয় আবার জানোয়ারের সঙ্গেও মিল নেই। মার্সিয়া মেঝেতে অসহায়ের মত গড়িয়েই চলেছে। গলা দিয়ে বেরিয়ে আসছে তীব্র গোঙানি।

চুল্লির আগুনের আলোয় মুখটা দেখতে পেল সুহিতা। মার্সিয়া লুরার অনিন্দ্য সৌন্দর্যের অতি অল্পই অবশিষ্ট রয়েছে মুখে। মার্সিয়ার চেহারা বলে চেনা দায়। নাকটা কুঁচকে গিয়ে আকার হারিয়েছে। নাকের জায়গায় লোমে ঢাকা কালো দুটো ফুটো। লম্বা কালো চুল অদৃশ্য হয়ে মুখে কালো ঝোপের মত লোম গজিয়েছে। তবে কপালের সাদা, কুৎসিত দাগটা এখনও চেনা যায়। মুখটা ভেঙেচুরে ভীষণ একটা আকৃতি ধারণ করেছে। অর্ধেক চেহারা ঠোঁটবিহীন নেকড়ের, বাকি অর্ধেকটা বিকট দেখতে মানুষের। শুধু চোখ জোড়া, সবুজ আগুনের মত 'দু'টি সবুজ চোখের কোনও

পরিবর্তন ঘটেনি। আগের মতই আছে সবুজ চোখ।

ধোঁয়ার গন্ধ মেঝেতে আছাড়-পিছাড় খাওয়া ভয়ানক প্রাণীটার ওপর থেকে মনোযোগ সরিয়ে নিল সুহিতার। ওর পাশে, যেখানে আগুন-গরম প্লায়ার্সজোড়া মার্সিয়ার হাত থেকে ছিটকে পড়েছে, ওখানে কম্বলের স্তূপে ধরে গেছে আগুন। লকলকে জিভ মেলে অগ্নিশিখা চুমু খাচ্ছে স্তূপে, স্তূপ বেয়ে উঠে আসছে শুকনো কাঠের দেয়ালে।

দরজা লক্ষ্য করে লাফ দিল সুহিতা, কিন্তু দড়াম করে পড়ে গেল মেঝেতে। ভাঙা চেয়ারটার সঙ্গে এখনও হাত-পা বাঁধা। ওর কাছ থেকে হাত কয়েক দূরে, একটু আগেও যেটা ছিল মার্সিয়া, এখন বীভৎস একটা প্রাণীতে রূপ নিয়ে চিৎকার করছে তারস্বরে, আগুন দেখে ভয়ে গোঁ গোঁ আওয়াজ বেরুচ্ছে গলা দিয়ে।

সুহিতা শরীরের সবগুলো পেশী টান টান করল, চেষ্টা করল দরজার দিকে এগোতে। পারল না। আগুন দ্রুত গ্রাস করছে কুটির। একটা সিদ্ধান্ত নিল সুহিতা। রশি বাঁধা হাত জোড়া যতদূর পারল প্রসারিত করল কম্বলের স্তূপে দাউ দাউ জ্বলতে থাকা আগুনের দিকে। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল তীব্র উত্তাপে ওর ফর্সা হাতের চামড়া লাল হয়ে যাচ্ছে, ফোস্কা পড়ে যাচ্ছে। দাঁতে দাঁত চেপে শিখার ওপর হাত জোড়া বাড়িয়ে দিল ও। একটা শিখা ছোবল মারল রশিতে। মুহূর্তে ধরে গেল আগুন। দ্রুত পুড়তে শুরু করল রশি। সুহিতা গায়ের শক্তি দিয়ে বাঁধন ছেঁড়ার চেষ্টা করল। কয়েক সেকেণ্ড পরে ফট্ শব্দে ছিঁড়ে গেল জ্বলন্ত রশি।

আগুনের ওপর থেকে হাত সরিয়ে আনল সুহিতা। চামড়া পুড়ে গেছে। লাল ঘা দগ দগ করছে। পোড়া আঙুল দিয়েই পায়ের গোড়ালির বাঁধন খুলতে লাগল ও। আগুন ইতিমধ্যে তিন দিকের দেয়ালে উদ্বাহু নৃত্য শুরু করে দিয়েছে। ছাদ ছোঁয়ার পাঁয়তারা কষছে।

অবশেষে পায়ের বন্ধন থেকে মুক্ত হলো সুহিতা। ধোঁয়ায় কিছু

ঠাহর হয় না, আন্দাজের ওপর দরজার দিকে এগোল ও। দোরগোড়ায় এসে তাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেল বাইরের ঘাসজমিতে। ফুঁপিয়ে উঠল মুক্তির আনন্দে।

রাতের পরিষ্কার বাতাস বুক ভরে টেনে নিতে নিতে সুহিতা কুটির থেকে সরে যেতে লাগল দূরে। জিপসির কেবিন এখন মশালের মত দাউ দাউ জ্বলছে। ভেতরে মৃত্যুকাতর কানফাটা আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে। হঠাৎ জ্বলন্ত একটা দেয়াল হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চিৎকারও থেমে গেল।

পাহাড়ের কোথা থেকে যেন যন্ত্রণাকাতর নেকড়ের ডাক ভেসে এল, মার্সিয়া লুরার মৃত্যু চিৎকারে হয়তো শোক জানিয়েছে। তারপর শুধু কুটিরের কাঠ পোড়ার চড়চড় শব্দ ছাড়া বাকি প্রকৃতি নিশ্চুপ।

কেউ সুহিতার নাম ধরে ডাকল।

আকস্মিক ভয়ে ঝট করে পাহাড়ি রাস্তাটার দিকে ঘুরে তাকাল সুহিতা।

'সুহিতা! তুমি আছ?'

খোঁড়াতে খোঁড়াতে একটা লোক এগিয়ে এল ওর কাছে। চাঁদ এবং কুটিরের আগুনের আলোয় সাগর চৌধুরীকে চেনা গেল।

'হ্যাঁ, আমি আছি,' কর্কশ, ঘ্যাসঘেসে গলায় সাড়া দিল সুহিতা।

'তুমি ঠিক আছ তো?'

'আমি ঠিক আছি।' কুটিরের দিকে ফিরল সুহিতা। কুটিরের ছাদ ধসে পড়েছে। আগুনের তেজ কমে আসছে। 'মার্সিয়া ওখানে আছে। আগুনে পুড়ে মরেছে।'

'শুকর আলহামদুলিল্লাহ,' বলল সাগর। বসল সুহিতার পাশে। ওর হাতের দশা দেখে আঁতকে উঠল। 'তোমার হাত তো অনেকখানি পুড়েছে।'

'ও ঠিক হয়ে যাবে,' বলল সুহিতা। 'রাস্তায়...তুমি কী...?'

মাথা ঝাঁকাল সাগর। 'রায়হান ছিল ওখানে। ওকে আমি খতম করেছি।'

'দু'জনেই তা হলে শেষ। ইট'স ওভার।'

সাগর ঘুরে পাহাড়ি রাস্তাটা দেখল একবার। তারপর পুনরাবৃত্তি করল সুহিতার কথা। 'ইট'স ওভার।'

ওরা দু'জনে বসে বসে দেখল কুটিরটা পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। নিভে আসছে আগুন। জ্বলন্ত কাঠ-কয়লার নীচে কিছু নড়াচড়া করছে না। রাতটা পরিষ্কার এবং শীতল। এবং নীরব।

ধীরে ধীরে স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলল সুহিতা। ওর হাতে এখনও অনেক কাজ বাকি রয়ে গেছে। তবে সেসব কথা পরে ভাবা যাবে। এখন ও শুধু ঘুমাতে চায়। শান্তির ঘুম। যে ঘুমের মধ্যে আর কোনদিন ওয়্যারউলফের ভয়ঙ্কর ডাক শুনবে না।

***

আগামী বই

অনীশ দাস অপু সম্পাদিত

রুদ্ধশ্বাস হরর কাহিনি

ছায়াবৃত্ত

দেড় ডজন গল্প নিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে অনীশ দাস অপু'র দশম হরর সংকলন 'ছায়াবৃত্ত'। নামে হরর হলেও এ বইতে পিশাচ কাহিনির আধিক্যই বেশি। যাঁরা পৈশাচিক গল্প পছন্দ করেন তাঁদের দারুণ লাগবে এ বই। আর যাঁরা ভালবাসেন হরর-এর আদলে গায়ে কাঁটা দেয়া রোমাঞ্চ কাহিনি, তাঁরাও হতাশ হবেন না বইটি পড়ে। 'ছায়াবৃত্ত' আক্ষরিক অর্থেই একটা ভৌতিক ছায়া দিয়ে ঢেকে রাখবে আপনাদের। বই পড়া শেষ না করা পর্যন্ত এ ছায়ার আড়াল থেকে বেরিয়ে আসতেই পারবেন না!



সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০